রাজপথ জনপথ

চাণক্য সেন

নবভারতী : কলিকাতা-১২

প্রথম প্রকাশ
আগস্ট, ১৯৬০

প্রকাশক
সুনীল দাশগুপ্ত
নবভারতী
৮, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট,
কলিকাতা-১২

মুদ্রাকর
জীবনকুমার বোস
রূপশ্রী প্রেস (প্রাঃ) লিঃ
৯, এ্যাণ্টনী বাগান লেন,
কলিকাতা-৯

প্রচ্ছদ
শ্রীচিত্ত পাকড়াশী

সব উপন্যাসের মতো, 'রাজপথ জনপথ' কাল্পনিক কাহিনী। সাম্প্রতিক ব্যক্তি, ঘটনা বা ইতিহাস, যেটুকু এসেছে, সাহিত্যের ছাড়পত্র নিয়ে। বলা বাহুল্য, এ উপন্যাসের কোনও চরিত্র সত্যিকার নয়; কোন ঘটনা, বাস্তবানুগ হলেও, বাস্তব নয়।

ত্রৈমাসিক সাহিত্য পত্রিকা 'অনুক্তে' বহুলাংশ প্রকাশিত উপন্যাসটিকে স্বাগত ক'রে যাঁরা পত্র দিয়েছিলেন, তাঁদের আজ সকৃতজ্ঞ ধন্যবাদ জানাই। 'রাজপথ জনপথ' রচনায় লেখকের কয়েকজন আফ্রিকান বন্ধুর সোৎসাহ সহায়তা অপরিহার্য ছিল। তাঁরা, 'অনুক্তের' অন্যতম পরিচালক সুকবি শ্রীনিখিল নন্দী, এবং সতর্ক-দৃষ্টি সাহিত্যরসিক বন্ধু শ্রীফণীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় আমার বিশেষ কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদের পাত্র। শিল্পীবন্ধু শ্রীচিত্ত পাকড়াশী প্রীতিবশে প্রচ্ছদপট-চিত্র করেছেন; প্রকাশক সুনীল দাশগুপ্ত মুদ্রণে ও অঙ্গ-সজ্জায় যত্নের কার্পণ্য করেন নি। এঁরাও আমার ধন্যবাদার্হ।

'রাজপথ জনপথ' আমার প্রথম উপন্যাস। উত্তীর্ণ সাহিত্যের দাবী, তাই, তার সংকুচিত। তবু, বাংলা উপন্যাসের বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণে সে আফ্রিকাকে প্রথম আনল। পিটার কাবাকুকে পৌঁছে দিল বাঙালীর মানস-দ্বারে। এইটুকু সে যদি সাহিত্যিক নিষ্ঠার সঙ্গে করে উঠতে পেরে থাকে, তাহলে তার পুরস্কার পর্যাপ্ত।

নয়াদিল্লী
১লা আগস্ট, ১৯৬০

চাণক্য সেন

এক

বাঃ, তোমার পোষাকটা তো বেশ! তারিফ-চোখে তাকাল জন মিলার।

বিবেক সোম লাজুক হাসি হাসল। বলল, এটা একেবারে বাঙালী পোষাক।

কী বল তোমরা একে?

শুনে তুমি একটু অবাক্ হবে। যত্ন করে কোঁচানো মিহি ধবধবে ধুতি দেখিয়ে বলল, এর নাম ধুতি। এত বড় ধুতি, এত আরাম আর এত কায়দা করে এদেশের আর কেউ পরতে জানে না। আর এই যে জিনিসটা দেখছ, এটাও একান্ত বাঙালী, যদিও এর নাম পাঞ্জাবী।

ওর আস্তিন দুটো বুঝি লেসের? জন মিলার শুধাল।

মোটেই নয়। আমরা একে বলি গিলে-করা আস্তিন। কায়দা করে কোঁচানো। সবাই পারে না। এ একটা আর্ট।

জন মিলার সরে এসে সোমের গিলে-করা আস্তিনে মৃদু ভাঁজগুলো দেখতে লাগল। বলল, বাটার-কাপের পাপড়ির মতো!

সোম তার শান্তিপুরী জরি-পার ধুতির কোঁচা ঘাসের ওপর বিছিয়ে বসল।

তোমাকে দেখে আমার হিংসে হয়, সোম। মৃদু স্বরে বলল জন মিলার। আজও, এই ১৯৫৬ সালের ৫ই মে, দুনিয়া যখন ঠাণ্ডা যুদ্ধের জ্বালায় জ্বলছে, তুমি একান্তই এলানো, শান্ত। তোমার মধ্যে কোন টেনশন নেই। তোমার দেশকেও আমি হিংসে করি, সোম। আমার মনে হয়, পৃথিবীর মধ্যে ভারত আজ সব চেয়ে অনুত্তেজিত দেশ।

বিবেক সোম জন মিলারের চোখে চোখ রাখল।

ছ' ফুট দু' ইঞ্চি লম্বা ঋজু দেহ, রংটা রোদে-পোড়া তামাটে; চওড়া চোয়ালে কেমন চাপা উত্তেজনা। দাঁতে কালো-কালো দাগ পড়েছে, মাঝখানের একটি সোনা দিয়ে বাঁধান। স্বল্পমেদের শরীরে হাড়ের মজবুত কাঠামো। ছোট ছোট চোখে হলদে-নীল ঝিলিক। নাকটা মাঝখানে চাপা। ওষ্ঠে যে দৃঢ় ব্যক্তিত্ব দানা বেঁধে উঠছিল, অধরে তার অনেকখানি

অপচয়। দুটো মিলে এখন যে পরিচয়ের সূচনা করে সেটা আদর্শে স্বার্থের ভেজাল। চেহারা দেখে মনে হয় অনেক জাতের সংমিশ্রণে তৈরি।

যেকালে য়ুরোপের চোর, ডাকাত, অপরাধী, আদর্শবাদী, ব্যর্থজীবন হতাশ মানুষ এবং নিছক নতুনের সন্ধানী লোকেরা দলে দলে অজানা আমেরিকায় নতুন করে জীবন তৈরির আশা নিয়ে পাড়ি দিত, ইংলণ্ড থেকে জন মিলারের পূর্বপুরুষও সেকালে অতলান্তিক পেরিয়ে নিউ ওয়ার্ল্ডে হাজির হয়েছিলেন। পিটার মিলার ছিলেন নাবিক, সারা দুনিয়া চষে বেড়িয়ে পরিণত বয়সে ঠিক করলেন আমেরিকায় গিয়ে ভাগ্য তৈরি করতে হবে। করেছিলেনও। যা-কিছু পুঁজি ছিল তার চতুর বিনিয়োগে শিকাগো শহরে শস্য বেচা-কেনা ব্যবসা ফেঁদে বসেছিলেন পিটার মিলার।

তাঁর চার ছেলে ছড়িয়ে পড়ল চার স্টেটে, শুধু বড় ছেলে স্যাম মিলার রইল শিকাগোয়। গ্রেন মার্চেণ্ট স্যাম মিলার ক্রমে ক্রমে শিকাগো শহরের একজন গণ্যমান্য লোক হয়ে উঠল। স্যাম মিলারের নাতি জন মিলার। তৃতীয় ছেলে জর্জ মিলারের চতুর্থ পুত্র জন মিলার। জর্জ মিলার ছিল আদর্শবাদী কোয়াকার, খ্রীশ্চান ধর্মের চিরকালীন আদর্শবাদে গভীর আস্থাবান, আর তার সঙ্গে ভারতীয় দর্শনে অল্পবিস্তর অনুরাগী। শিকাগো শহরে হিন্দু স্বামিজী বিবেকানন্দের বক্তৃতা শুনে মুগ্ধ হয়েছিল জর্জ মিলার; তখন সে পাদরী-জীবনে জনপ্রিয়। পরিণত বয়সে জর্জ মিলার মার্কিন দেশে রামকৃষ্ণ মিশনে দু'-চারবার যাতায়াত করেছে। গান্ধীর সঙ্গে পত্রালাপ করেছে, মাঝে মাঝে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সমর্থন করে দু'-চারটে প্রবন্ধ লিখেছে. বক্তৃতা করেছে, ভারত-বন্ধু কমিটিতে উৎসাহ নিয়ে নাম লিখিয়েছে। কিন্তু আজীবন আকাঙ্ক্ষা সত্ত্বেও ভারত-দর্শন মিলারের ভাগ্যে ছিল না, তাই বোধ করি ভারতবর্ষ সম্বন্ধে একটা উদার প্রীতি ও স্নেহ আগাগোড়া পোষণ করে গেছে জর্জ মিলার। জর্জ মিলার ছিল সে-জাতীয় আমেরিকান, যারা হুইটম্যানের মতো বড় গলায় চিরদিন বলে এসেছে, "উই টেক আপ দ টাস্ক ইটারনাল"। দেশেও সে আজীবন নানা প্রগতিমূলক ভাবধারার সঙ্গে পা ফেলে চলতে চেয়েছে; জীবনের ওপর রাষ্ট্র বা কোন প্রতিষ্ঠানেরই আগ্রাসী অভিভাবকত্ব মানে নি। জর্জ মিলারের অখণ্ড বিশ্বাস ছিল আমেরিকার নৈতিক শ্রেষ্ঠত্বে, আমেরিকার বিরাট ও মহান্ আদর্শবাদী ভবিষ্যতে। সে প্রায়ই তার বক্তৃতায় ও প্রবন্ধে মার্কিন কবির কয়েকটি লাইন উদ্ধৃত করত:

Humanity with all its fears,
With all the hopes of future years,
Is hanging breathless on thy fate.

জর্জ মিলারের পাঁচ ছেলে। পিতার উদার আদর্শবাদ সবাইকে অল্পবিস্তর প্রভাবিত করেছিল। ওয়াশিংটন মিলার বাপের মতো পাদরী হয়েছিল, পঞ্চাশের আগেই তার মৃত্যু হয়েছে। শারমান মিলার শিকাগো বিশ্ববিত্থালয়ে পদার্থবিত্থার অধ্যাপক। এলেন মিলার বিমানবাহিনীতে মাঝারি রকমের অফিসার। কনিষ্ঠ হিউ মিলার বিজ্ঞাপনের ব্যবসা করে নিউ অরলিয়নসে। আর আমাদের কাহিনীর জন মিলার অনেক কিছু করে দেখেছে তার পঁয়তাল্লিশ বছর জীবনে, অনেক কিছু করার আশা রাখে, অথচ বড কোন কিছু করে উঠতে পারে নি এখনো।

লেখাপড়া শিখতে শিখতে ভেবেছিল পাদরী হবে। কিন্তু আঠার বছর বয়সে শিকাগোর আণ্ডারওয়ার্ল্ডের সন্ধান পেয়ে হঠাৎ ভয়ানক বিগড়ে গেল। দু'-চারটে ছোট-বড অপকর্ম ধরা পডতে বাপ চালান করে দেন বড ভাইয়ের কাছে নিউ ইয়র্কে। সেখানে ভর্তি হল কলেজে। এবার ভাবল, হবে সাংবাদিক, এবং তাই মন দিয়ে ইতিহাস ও রাজনীতি পডতে শুরু করল। বাইশ বছরে ছোট ভাইয়ের বিজ্ঞাপন-ব্যবসায় যোগ দিল অংশীদার হিসেবে। বিজ্ঞাপনের কপি লিখতে লিখতে কিছু খুচরো প্রবন্ধ, এমনকি কবিতাও লিখে ফেলল, এবং তার কয়েকটা ছাপা হল কাগজে, ম্যাগাজিনে। হঠাৎ ব্যবসা ছেড়ে হল খবরের কাগজের রিপোর্টার ; একটা নারকোটিকস্-চালান ইণ্টার-স্টেট দলের জাল ফাঁস করে দিয়ে কিছু নাম করল। ছোটবেলার আণ্ডার-ওয়ার্ল্ডের আস্বাদ জিভে লেগেই ছিল, এবার লাগল তার পেছনে। খেটেখুটে বই লিখল ; 'শিকাগো নেকেড এ্যাট্ নাইট্' ; তাতে এমন সব তথ্যের সমাবেশ যা পড়লে তুমি বুঝতে পারবে না লেখক তোমাকে সতর্ক করছে, না ইসারা। কোন রাস্তায় কোন স্ত্রীলোক তোমাকে টিন-এজের মেয়েদের সঙ্গে ভাব করিয়ে দেবে, কোথায় গোপন জুয়ার আড্ডা, নেশাবাজের গোপন ব্যবসা কীভাবে চলে, নিগ্রো-পীড়ক সংস্থাগুলোই বা কেমন কাজ চালায়, কোন্ সেনেটরের হাতে কতগুলো গুণ্ডা, কোন্ ডিস্ট্রিক্ট এ্যাটর্নি কী অসদুপায়ে নির্বাচন জিতেছে—এমন অনেক সুস্বাদু অকাট্য তথ্য সাজিয়ে ধরল জন মিলার তার বই-এ। টাকা পেল বেশ, নামও হল অনেক।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় জন মিলার যুদ্ধে যাবার জন্যে অধীর হয়ে উঠল। কিন্তু ডাক পড়ল ওয়াশিংটনে, স্টেট ডিপার্টমেণ্টে। জন মিলার শুনতে পেল, লড়াই না করে অন্যভাবে তাকে যুদ্ধে যোগ দিতে অনুরোধ করেছেন মার্কিন সরকার। যে-কর্তব্যের ব্যাখ্যা একজন মাঝবয়সী একেবারে টাক-মাথা, অথচ কানে গুচ্ছ-গুচ্ছ চুল ভদ্রলোক তাকে সাবধানে দিলেন, তা শুনে বিস্ময় কণ্ঠস্বরে প্রকাশ করে সে শুধাল : ইনটেলিজেন্স ?

ঠিক তা নয়। আপনি স্বাধীনভাবে নিজের কাজ করবেন। আপনার সংবাদপত্র আপনাকে পাঠাবে পৃথিবীর নানা দেশে—বিশেষ করে মধ্য ও দূর প্রাচ্যে। আপনি স্বাধীনভাবে স্থানীয় লোকদের সঙ্গে মিশবেন, নিজের কাজ করে যাবেন। শুধু আমাদের কাছে কিছু কিছু রিপোর্ট আপনাকে পাঠাতে হবে নিরপেক্ষ পর্যবেক্ষক হিসেবে।

জন মিলার ভেবে দেখবার সময় চাইল।

চব্বিশ ঘণ্টা সময় দিতে পারি আপনাকে। কাল রাত দশটায় আমাকে ফোন করবেন। আমাদের নিজেদের লোক তো আছেই সর্বত্র। কিন্তু আমরা কিছু সুদক্ষ, নিরপেক্ষ লোকের কাছ থেকে কয়েকটি দেশের আভ্যন্তরীণ অবস্থা সম্পর্কে রিপোর্ট পেতে চাই। তাতে আমাদের নীতি-প্রণয়নে সুবিধে হবে। তা ছাড়া মধ্যপ্রাচ্যে ও এশিয়ার বিরাটতর অংশে বিশেষ পরিবর্তন ঘনিয়ে আসছে। আমাদের সঙ্গে ওসব দেশের সরকারি পরিচয় সামান্য। অথচ এ-পরিচয়কে এখন অল্প সময়ে গভীর ও ব্যাপক করে তুলতে হবে। তাই আমরা একটা বড় রকমের প্ল্যান তৈরি করেছি। তাকে বলতে পারেন 'প্রাচ্য-পরিচয় প্ল্যান'। বড় বড় সংবাদপত্র ও সংবাদ-সরবরাহ প্রতিষ্ঠান-গুলোকেও প্রাচ্য দেশগুলি সম্বন্ধে সচেতন হতে আমরা অনুরোধ করেছি।

যুদ্ধের সময় জন মিলার প্রায় সমস্ত প্রাচ্য ঘুরে বেড়াল। প্রথম গেল তুরস্কে, সেখান থেকে ইরান, ইরাক, আফগানিস্থান। তারপর মিশর। মিশর থেকে ইন্দোনেশিয়া, সেখান থেকে ইন্দোচীন, তারপর চীন। চীনে যুদ্ধের পরেও কাটাল পুরো দু'বছর। সেখানেই তার 'পতন' হল। চীনের কুয়োমিনটাং রাজত্বের অবসান কেন ঘনিয়ে এসেছে তার ব্যাখ্যা করে সে যেসব সারগর্ভ রিপোর্ট পাঠিয়েছিল এবং একদিন যাতে তার নাম খুব বেড়ে গিয়েছিল, যুদ্ধের পরে কর্তারা তার মধ্যে সাম্যবাদী দুর্গন্ধ পেলেন। 'আদর্শবাদী' জন মিলাম এবার হল 'হতাশাবাদী' জন মিলার। ডাক পড়ল তার আন-

আমেরিকান কমিটির বৈঠকে। স্বয়ং জোসেফ ম্যাকার্থি তাকে অনেক প্রশ্নে নাস্তানাবুদ করতে চেষ্টা করলেন। তার ব্যক্তিগত জীবনের প্রতি রোমকূপে ঢুকে দেখা হল কোন বামপন্থী ব্যাধির সামান্যতম সন্ধান পাওয়া যায় কিনা। বিশেষ কিছু জুটল না। স্টেট ডিপার্টমেণ্ট তার কাজের প্রশংসাই করেছেন। তবু ম্যাকার্থি তাকে সহজে রেহাই দিলেন না। চীনের 'লাল দস্যু'দের সঙ্গে তার সম্পর্ক নিয়ে অনেক কঠিন কঠিন প্রশ্নবাণ ছুঁড়লেন।

জন মিলার এক তিল নড়ল না। সে পরিষ্কার বলল, আমি কম্যুনিস্ট নই, কোনদিন ছিলাম না। কম্যুনিজমে আমার কোন বিশ্বাস বা শ্রদ্ধা নেই। কিন্তু কম্যুনিজম পৃথিবীতে আছে, থাকবে। সাংবাদিক হিসেবে তাকে জানা আমার ধর্ম। তাকে জানলে আমি তার ভালোও জানবো, মন্দও জানবো। দুটোই আমাকে রিপোর্ট করতে হবে। যা সত্য, তাকে বিকৃত করা সাংবাদিকের সবচেয়ে বড় পাপ। নিউজ ইজ সেক্রেড।

আপনি স্টেট ডিপার্টমেণ্টকে চীনের কম্যুনিস্ট নেতাদের সম্বন্ধে ভুল তথ্য পরিবেশন করেছিলেন।

জন মিলার বলল, এ অভিযোগ মিথ্যে। আমি যা দেখেছি, যা বুঝেছি তাই বলেছি। আমি এখনো মনে করি যুদ্ধের পর চিয়াং কাইশেককে গদিতে রাখা কোন মতেই সম্ভব হত না। আমি মনে করি না যে রুজভেল্ট আমলের চীন-নীতিতে কোন ভুল হয়েছে।

বর্তমান নীতি?

আমরা চীনকেই শুধু দোষ দিচ্ছি। পিকিং থেকে পৃথিবীর চেহারাটা যা, ওয়াশিংটন থেকে তা নয়। চীনের দোষ আছে, কিন্তু আমরাও নির্দোষ নই। দোষাদোষি ছাড়লেও, 'চীন বলতে বোঝায় শুধু ফরমোসা' এ কি কোন একটা নীতি হল? কেউ যদি কখনো বলে 'আমেরিকা বলতে বোঝায় পর্টুরিকো'—তাকে কি পলিসি বলব? কূটনীতির একটা মূল দাবী হচ্ছে বাস্তবকে মানতে হবে। পৃথিবীর যেটুকু আমার পছন্দ, শুধু তাই আছে, বাকিটা নেই—এমন ভিত্তিতে কূটনীতি দাঁড়ায় কি?

তার মানে, বর্তমান চীন-নীতি আপনি সমর্থন করেন না?

মানে আপনি এখানে অন্তত ঠিকই বুঝেছেন।

বলা বাহুল্য স্টেট ডিপার্টমেন্টের সঙ্গে জন মিলারের আর সম্পর্ক রইল না। যে-পত্রিকায় সে দীর্ঘকাল সাফল্যের সঙ্গে কাজ করেছে, তার কর্তারা

'গভীর দুঃখের সঙ্গে' তার চাকরি বন্ধ করে দিল। কিন্তু অচিরে অন্য সংবাদপত্র থেকে তার ডাক এল। একটা বিশ্ববিদ্যালয় তাকে প্রাচ্য-বিভাগে অধ্যাপনায় আহ্বান জানাল। কিছু কিছু ম্যাগাজিন থেকে এল নিয়মিত লিখবার অনুরোধ। দু-চারটে লেকচার ট্যুরের ডাকও এল। অর্থাৎ জন মিলার দেখতে পেল ম্যাকার্থির বাইরেও উদার আমেরিকার অনেকখানি বেঁচে আছে। সে আশ্বস্ত হল।

কিন্তু যে জন মিলার যুদ্ধের প্রথমে প্রাচ্য-পরিচয়ে পা বাড়িয়েছিল, যুদ্ধোত্তর যুগের প্রথম অগ্নিপরীক্ষায় জলে তার ভেতরকার চেহারাটা বদলে গেল। পরিচয় গাঢ় হতে হতে প্রাচ্যকে সে ভালোবাসতে শুরু করেছিল। এই ভালোবাসা দানা বাঁধল ইন্দোনেশিয়ায় ও ইন্দোচীনে, পাকা হল চীনে। চীনের বহু-প্রাচীন সভ্যতা তাকে মুগ্ধ করল; বুদ্ধ ও কনফুসিয়াসের মিশ্র দর্শন তাকে নতুন প্রশান্তির ইংগিত জানাল। রাজনৈতিক ঘূর্ণিপাকে পড়ে সে অকাঙ্ক্ষামতো চীনের জ্ঞানসমুদ্রের সুধা পান করতে পারে নি, কিন্তু যেটুকু আস্বাদ পেয়েছে তাতে তার তৃষ্ণা বেড়েছে, অতৃপ্তিও।

ম্যাকার্থি কমিটির জাল থেকে ছাড়া পেয়ে জীবনটাকে নতুন গতিতে প্রবাহিত করবার আগে জন মিলার অনেকদিন শুধু ভাবল। বাপের পুরোনো কাগজপত্র, ডায়েরি, চিঠি সব সে অনুসন্ধানীর চোখে ঘেঁটে দেখল; সবচেয়ে আশ্চর্য হল ভদ্রলোকের ভারতপ্রীতিতে। ওল্ড মিলারের ডায়েরিতে বার বার চোখে পড়ল ভারতীয় নেতাদের নাম—বিবেকানন্দ, টাগোর, গান্ধী, আনি বেসান্ত। এক জায়গায় সে লিখেছে: হিন্দু স্বামিজী আমেরিকা সম্বন্ধে অনেক বড় ভরসা নিয়ে কাজ শুরু করেছিলেন। ১৮৯৩ সালের ১৯শে সেপ্টেম্বর, পার্লামেণ্ট অব রিলিজনে তিনি কত আশা নিয়েই না ঘোষণা করলেন, 'কলম্বিয়া, তোমাকে অভিবাদন করি। তুমি স্বাধীনতার জন্মভূমি। তোমার হাতে কখনো লাগে নি প্রতিবেশীর রক্ত। তুমিই পারবে—'! কিন্তু এ-বিশ্বাস হিন্দু স্বামিজীর ভেঙে গিয়েছিল। তিনি ডলারের সাম্রাজ্যবাদী প্রভাব দেখতে পেয়েছিলেন; বুঝতে পেরে, রেগে বলেছিলেন, আমেরিকা তাঁকে প্রতারিত করেছে। পরে মিস্ ম্যাকলিয়ডকে জানিয়েছিলেন, 'তাহলে আমেরিকাও তাই! তাকে দিয়ে তো কর্মসাধনা হবে না! হবে হয়তো চীনকে দিয়ে বা রাশিয়াকে দিয়ে।'

জর্জ মিলারের ডায়েরির এক পত্রে লেখা আছে: আজ টাগোরকে চিঠি

দিলাম। য়ুরোপ তাঁর মধ্যে যীশুর ঔজ্জ্বল্য দেখতে পেয়েছে। আমি তাঁকে আমেরিকায় নিমন্ত্রণ করলাম।

জর্জ মিলারের চিঠিপত্র ঘেঁটে পাওয়া গেল গান্ধীর কয়েকখানা পত্র। তার একখানায় এমারসন ও থুরোর কাছে ঋণের স্বীকৃতি। একখানিতে গান্ধী ভারত সম্বন্ধে মার্কিন অজ্ঞতায় দুঃখ প্রকাশ করেছেন। লিখেছেন: আমি অতি সাধারণ মানুষ; পড়াশোনা বিশেষ করি নি। তবু আমি আমেরিকা সম্বন্ধে যেটুকু জানি বড বড় মার্কিন পণ্ডিতরাও ভারত সম্পর্কে ততটুকু জানেন না। বড দুঃখের কথা। আমেরিকা যদি প্রাচীনকে শ্রদ্ধা করতে না পারে তাহলে তার নবীনত্ব শুধু তামসিক অহংকারে পরিণত হবে।...গান্ধীর তৃতীয় পত্র জর্জ মিলারের বড় মূল্যবান জিনিস ছিল। ডায়েরির পাতায় আঠা দিয়ে জুড়ে রেখেছিলেন সেই চিঠি। '...ভারতে একবার আসুন। এ দেশটাকে দেখুন, জানুন। মিস্ মেয়োর চোখে নয়। এমারসনের চোখে। দেখুন এর প্রাণ আছে কিনা, তেজ আছে কিনা, বুঝুন বেঁচে থাকবার, বড় হবার অধিকার এর আছে কি নেই। যদি মনে করেন, নেই, তাহলে ভারতের কিছু বলার থাকবে না। আর যদি মনে করেন, আছে, তাহলে ভারতের পতাকা আপনাকেও বহন করতে হবে।'

হঠাৎ জন মিলার মনঃস্থির করে ফেলল। সে ভারতে যাবে। ক্রিস্টোফার কলম্বাস যেখানে যেতে যেতে আমেরিকায় থেমে গিয়েছিল। মার্ক টোয়েন গিয়েছিল যে-ভারতে। সেও যাবে, সে, জন মিলার, আমেরিকান সিটিজেন। অর্থ তার যা আছে হিসেব করে চললে রোজগার না করেও কয়েক বছর অসুবিধে হবে না। হয়তো-বা কোন কাগজের প্রতিনিধিত্ব পাওয়া যাবে। ফ্রি-লান্সিং তো আছেই। আমার চিন্তা কী? একা মানুষ। আমার চলে যাবে। ভাবল জন মিলার।

কোন কাগজের প্রতিনিধিত্ব চট করে জুটলো না। তবে জন মিলারের সাংবাদিক হিসেবে খ্যাতি আছে। অনেকেই বলল, প্রবন্ধ পাঠাবেন, ছাপবো। দু-একখানা সংবাদপত্র ছাড়া সবাই ভারত-বিদ্বেষী, ভারত-অজ্ঞ। নেহেরু লালচীনের বন্ধু, সুতরাং সে কম্যুনিস্ট! নেহেরু রাশিয়ার মিত্র! নেহেরু আমাদের দলে নয়, তাই সে অন্য দলে! ভারত! মাদার ইণ্ডিয়া! মাই গড্! মাদার ইণ্ডিয়ার শুধু একটা গুণ আছে। বছর-বছর সে লক্ষ লক্ষ তামাটে মানুষের জন্ম দেয়! তারা অনাহারে রাস্তায় মরে। শহরগুলো নোংরা।

মেয়ে-পুরুষ গায়ে কাপড় দেয় না। মেয়েরা তোমার সঙ্গে কথাই কইবে না, ভেট করা তো দূরের কথা! কোন ভারতীয় তোমাকে বাড়িতে ডাকবে না। নিঃসঙ্গ জীবনের চাপে তুমি হাঁপিয়ে উঠবে।

জন মিলারের বন্ধু এডমাণ্ড স্নো যুদ্ধকালে ভারতে নিযুক্ত হয়েছিল। সে বলল, সস্তায় মেয়েমানুষ অনেক পাবে। কিন্তু একেবারে লাউজি। আমি যত মেয়েমানুষ নিয়ে শুয়েছি, দি ওয়ার্স্ট আর ইণ্ডিয়ান্‌স্‌। ইউ ডোণ্ট গেট ইয়োর মানিজ্‌ ওয়ার্থ।

আমি ঠিক সেজন্যে যাচ্ছি না। প্রতিবাদ করল জন মিলার।

তা তো বটেই, তা তো বটেই, উত্তর দিল স্নো। ওজন্যে কে আর ভারতে যায়! তবে মেয়েমানুষ ছাড়া তো আর বেশি দিন থাকা যায় না! ইউ হ্যাভ টু হ্যাভ উইমেন···

আত্মীয়স্বজনদের দু'-একজন উৎসাহ দিল, অনেকেই ভ্রূ কপালে তুলে বলল: রিয়্যালি? বাইরে থেকে-থেকে স্বদেশে বান্ধবীর সংখ্যা বিশেষ ছিল না জন মিলারের, এমন তো কেউ নয়ই যার জন্যে সে সত্যিকারের কেয়ার করে। অর্থাৎ ভালোবাসে। যাদের সঙ্গে নানা পর্যায়ের পরিচয় ছিল তাদের কেউ কেউ ফিরে আসবার সময় স্যুভেনির আনবার অনুরোধ করল।

আমার জন্য কিছু ডায়মণ্ড এনো। শুনেছি ওদেশে ডায়মণ্ডের ছড়াছড়ি।

আমার জন্যে এনো ছোট্ট একটা হাতি।

কিছু ব্ল্যাক ম্যাজিক শিখে এসো। সবাইকে তাক লাগিয়ে দিতে পারবে।

দেখো আবার, ওদেশের মেয়েদের খপ্পরে পড়ো না। তাহলে তোমাকে ভেড়া বানিয়ে রেখে দেবে। সতর্ক করল কেউ কেউ।

বিদায় নেবার আগে জন মিলার মার্কিন-ভারত সম্পর্ক সম্বন্ধে পরিচিত হতে চেষ্টা করল। কিছু কিছু চমকপ্রদ আদান-প্রদানের সন্ধান পেল—তার সবটাই প্রায় গত শতাব্দীতে। ১৮৩৮ সালে হারভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে আত্মা-ব্রহ্মা বিষয়ে এমারসনের যে বক্তৃতা সেকালে যথেষ্ট বাদানুবাদের সৃষ্টি করেছিল তা সে পড়ল। থুরো পড়ল আরও মনোযোগ দিয়ে। তিনি ফরাসী অনুবাদ থেকে গীতা পাঠ করছিলেন, এবং এশিয়ার ধর্মগ্রন্থ থেকে আহৃত একটি 'জয়েণ্ট বাইবেল' রচনা হোক, এমন ইচ্ছেও তাঁর হয়েছিল। থুরোর সময়ে প্রতিষ্ঠিত Transcendental Club-এর কাহিনীর সন্ধান করল জন মিলার, এ ক্লাবের মুখপাত্র The Dial-এর কয়েকখানা শতাব্দী-পুরাতন সংখ্যাও পড়ে ফেলল।

এমারসন যে ব্রহ্মাকে নিয়ে কবিতা লিখেছিলেন তা কি জন মিলার স্বপ্নেও ভাবতে পেরেছে?

If the red slayer think he slays,
Or if the slain think he is slain,
They know not well the subtle ways
I keep, and pass, and turn again.

জন মিলার মনে করল, বিবেকানন্দ যে মার্কিন দেশে পদার্পণ করবেন, হুইটম্যান তা জানতেন, তাই প্রাচ্যের প্রাজ্ঞদের আগে থেকেই আহ্বান, আমন্ত্রণ করে রেখেছিলেন। সে জানল, রবার্ট ইংগারসল বিবেকানন্দের সঙ্গে অনেক তর্কবিতর্ক করতেন; হিন্দু স্বামিজীকে তিনি সতর্ক করে দিয়েছিলেন একটু সামলে কথাবার্তা বলতে, কেননা আমেরিকায় অন্ধ, উগ্র মনোভাব মরে যায় নি—স্বামিজী যদি চল্লিশ বছর আগে আমেরিকায় আসতেন, তাঁকে হয়তো পুড়িয়ে মারা হত, যদি তারও কিছু পরে আসতেন, তবু পাথর ছুঁড়ে মারার সম্ভাবনা খুবই ছিল! সে আরও জানল, এডগার আলেন পো 'ইউরেকা' বইতে উপনিষদের চিন্তাধারার রূপ দিয়েছিলেন।

জন মিলার দেখতে পেল বিশ শতকের প্রথম থেকে ভারত-অনুসন্ধিৎসা আমেরিকায় একেবারে কমে গেছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আবার আমেরিকাকে করেছে ভারত-সচেতন। কিন্তু এখনো মধ্যপ্রাচ্য সম্বন্ধে আমেরিকা যতখানি সজাগ, ভারত সম্বন্ধে তার একাংশও নয়। কী আশ্চর্য, জন মিলার ভাবল, মার্কিন বিপ্লব প্রাচ্য মনের ওপর এমন কিছু প্রভাব বিস্তার করে নি, যেমন করেছে ফরাসী ও রুশ বিপ্লব, এমনকি য়ুরোপের শিল্প-বিপ্লবও! এ শতাব্দীর প্রথমে আবিসিনিয়ার হাতে ইতালির পরাজয় প্রাচ্যের হৃদয় স্পন্দন এনেছে; জাপানের হাতে রুশিয়ার পরাজয় এনেছে বিরাট উত্তেজনা। কিন্তু আমেরিকার হাতে বৃটেনের পরাজয় তো কোন প্রভাব ছড়ায় নি। দুশো বছরে এত বড় একটা শক্তির বিকাশ প্রাচ্য মনকে কেন আন্দোলিত করে নি? তবে কি আমেরিকান রেভলিউশন নিতান্তই আমেরিকান? জগৎকে সে দিয়েছে কী? বড় যন্ত্র আর আর আকাশ-ছোঁয়া ঘরবাড়ি আর অনেক-অনেক ডলার এবং অ্যাটম ও হাইড্রোজেন বোমা? উইলসনের ফরটিন পয়েন্টস্—ফরটিন ফলেন পিলার্স্! ইংরেজ কি তার সাম্রাজ্যের মহিমায় এতই বিরাট ছিল যে আমেরিকাকে একেবারে আড়াল করে রেখেছিল! নাকি, আমেরিকাই

তাকাতে চায় নি বাইরে? তার কি সত্যি কিছু দেবার ছিল প্রাচ্যকে বা এখনো আছে? প্রাচ্যের মানুষ তো অনেকবার তার দিকে চোখ তুলে তাকিয়েছে—তার নেতৃত্ব চেয়েছে—বার বার কেন সে তাদের ব্যর্থ করেছে—ব্যর্থ করেছে চীনকে, আরবকে, সমস্ত প্রাচ্যকে? আনি বেসান্ত আমেরিকায় ভারত-মুক্তির সমর্থন চেয়ে দূত পাঠিয়েছিলেন। আমেরিকা বিবেকানন্দকে স্বাগত করেছিল, কিন্তু টাগোরকে করে নি। টাগোর অনেক দুঃখে বলতে বাধ্য হয়েছিলেন, অর্থ যে কত বড -অনর্থ তা বুঝলাম এসে মার্কিন মুলুকে।

এ-শতাব্দীতে আমেরিকা ভারতকে চেনে নি, ভারত আমেরিকাকে চেনে নি। যুদ্ধের পরে ভারত-মার্কিন সম্পর্ক একটা কেমন জগাখিচুড়ি পাকিয়ে গেছে। দুজনের দুজনকে না হলে চলে না তাই চলাচল রাখতেই হবে। এতে বোঝাবুঝির ঐকান্তিকতা নেই, শ্রদ্ধা নেই, ভাবের আন্তরিক আদান-প্রদান নেই। আমেরিকা অনেক জয় করেছে। কিন্তু মানুষের হৃদয়?

জন মিলার নিজেকে বলল, আমি যাচ্ছি হৃদয় জয় করতে। আমার সত্যিকার জীবনযাত্রা আজ শুরু হল।

ভারতে এসে নামল জন মিলার ১৯৫০ সালের এপ্রিলে।

ছয় বছর পরে দিল্লীর এক দীর্ঘায়িত গ্রীষ্ম-সন্ধ্যায় বিবেক সোমের বাংলো বাড়ির জলে-ভেজা ঘাসে সবুজ চেয়ারে বসে জন মিলার বলল, আমার মনে হয় ভারত সারা পৃথিবীতে সবচেয়ে অনুত্তেজিত দেশ।

সোম একটু হেসে মন্তব্য করল, এত বড় দেশ। বিরাট নীল আকাশ তার, তিনদিকে সুনীল সমুদ্র, একদিকে আকাশ-ছোঁয়া হিমালয়। দেহে শিরা-উপশিরার মতো নদনদী। তারপর, ছ'হাজার বছরের সভ্যতা। কত গড়া, কত ভাঙার সাক্ষী। কত বিজয়ীর দর্পিত পদচিহ্ন তার ইতিহাসের পাতায় লীন। কত অমৃত, কত বিষ না সে পান করেছে—কত ভালোবেসেছে, কত ঘৃণা করেছে। তাকে সহনশীল হতেই হবে; সহজে তার উত্তেজনা আসবে কি?

সত্যি। এ-দৃষ্টিতে ভারতকে না দেখলে অনেক কিছু দুঃসহ, অসহ্য মনে হয়।

এ দৃষ্টিতে পশ্চিমের লোক প্রাচ্যকে দেখতে অভ্যস্ত নয়। পশ্চিম হল ছোট শিশুর মতো। যা চাই, এখুনি চাই। প্রাচ্য তার অনেক অভিজ্ঞতা

নিয়ে জানে, পাওয়ার পরেও চাওয়া আছে; পাওয়ার স্বাদটা ফুরিয়ে গেলে নতুন চাওয়া দেখা দেবে। তখন তার নাম হবে লোভ।

তোমরাও তো চাও!

চাই বইকি! ঈষদুষ্ণ গলায় বলল সোম। খুব চাই, অনেক চাই। আমরা যে বহুদিন কিছু পাই নি! আমাদের দেশে পঁয়ত্রিশ কোটি মানুষের দিকে চেয়ে দ্যাখো কী আছে তার? কী সে পেয়েছে? তার শিক্ষা চাই, স্বাস্থ্য চাই, খাদ্য, বস্ত্র, ঘরবাড়ি, আসবাব সব চাই, বিশ্রামও চাই, সঙ্গে চাই কাব্য, সাহিত্য; শিল্প, সংগীত; পাশাপাশি কলকারখানা, উন্নত কৃষি, কি তার চাই না? তোমরা তাকে দিচ্ছ কোথায়? তোমাদের এত আছে তবু সবই তোমরা নেবার জন্য পাগল। আমাদের নেই, তবু আমাদের কিছু দেবে না!

কিছুই কি দিই নি আমরা?

দিয়েছ, কিছু নিশ্চয় দিয়েছ। কিন্তু এ কী-রকম দেওয়া? তোমরা সভ্যতাকে যান্ত্রিক শিখরে তুলেছ, কিন্তু মানুষের মন যে যান্ত্রিক নয় তা মনে রাখো নি। প্রত্যেকবার দেবার আগে তোমরা হিসেব করেছ, প্রতিদানে কতখানি পাবে। তোমাদের দেশবাসীকে বোঝাতে হয়েছে তোমরা দিচ্ছ তোমাদের স্বার্থে—পাকিস্তানকে অস্ত্র দিচ্ছ তাও তোমাদের স্বার্থে, আমাদের অর্থ দিচ্ছ, তাও তোমাদের স্বার্থে। বলতে পারো নি, আমরা দিচ্ছি, কেন না আমাদের আছে, ওদের নেই। আমরা স্বার্থের জন্যে দিচ্ছি না, দিচ্ছি দেবার জন্যে। ভাবতে পারো নি, না দিলে দুনিয়া তোমাদের বড় বলে মানবে কেন?

তুমি বড় নীতিবাগিশের মতো কথা বলছ, সোম। বলতে বলতে বুঝতেও পারছ না, কী ভয়ানক খারাপ শোনাচ্ছে তোমার কথা। তোমরা একটা তর্জনী-উঁচু উপদেশ ঝরা হাত তুলে সারা দুনিয়াকে সর্বদা লেকচার দিচ্ছ। আচ্ছা, দুনিয়ার সবাইকে তোমরা নীতিকথা শোনাতে পারো এমন অহংকার কোত্থেকে পেলে? আরও একটা কথা আছে, বলতে দাও আমাকে, রাগ কোরো না। তোমাদের নিজেদের হাতও তো সাফ নয়, তাতেও অনেক কালি আছে, কিছুটা রক্তও। তোমরা তোমাদের কথামৃত শুনতে শুনতে নিজেরাই সম্মোহিত হয়ে পড়ো। অন্যপক্ষ যে শুনতে চাইছে না, ভেতরে ভেতরে রাগছে, তা তোমাদের খেয়াল থাকে না।

তুমি হক কথা বলেছ, জন। সোম তৎক্ষণাৎ মেনে নিল। সত্যি, উপদেশ

দেবার একটা বদ-অভ্যেস আমাদের জন্মগত। আমরা পাঠ শুরু করি যে চটি বই নিয়ে তার প্রথম বচন, 'সদা সত্য কথা বলিবে'। সারা বইয়ে কেবল উপদেশ। পাঠশালায় 'কথামালা' পড়াতে পড়াতে প্রত্যেকটি গল্প বলেই মাষ্টার মশাই জিজ্ঞেস করবেন, 'বালকগণ, ইহা হইতে কী শিখিলে?' আমরা গুরুর কাছ থেকে যে-পাঠ নিতাম—এবং আজ যা পাই না বলে আমাদের আফসোস—তা হচ্ছে জীবনপাঠ। বাপের সঙ্গে ছেলের সম্পর্ক অনেকটা ছাত্র বা শিষ্যের সম্পর্ক, যাকে আমাদের স্বর্গের চেয়ে গরীয়সী মনে করার কথা। আমরা স্ত্রীকে ঝেড়ে উপদেশ দিই, উল্টে, ঝুড়ি ভরে উপদেশ পাই। সন্তানকে কেবল বলি, এটা কোরো না, ওপথে যেয়ো না, অমন লোকের সঙ্গে মিশো না, অমন খাবার খেয়ো না। আমরা উপদেশ দিতে পারলে আর কিছু চাই নে।

শুনতে শুনতে জন মিলার হাসছিল। ইতিমধ্যে বেয়ারা ট্রেতে করে চা নিয়ে এলে তাকে দেখে সামান্য বিস্ময়ে চোখ তুলে তাকাতে সোম বুঝিয়ে দিল: মিসেস সোম আজ বাড়ি নেই। একটা বিবাহ-বার্ষিকী নিমন্ত্রণে গেছেন। এখুনি আসবেন।

মিলার চায়ে চুমুক দিয়ে বলল, এই যে উপদেশ দেওয়ার কথাটা তুললে, এতে তোমাদের সঙ্গে আমাদের মিল আছে। তুমি উনিশ শতকের আমেরিকান চিন্তাধারার খোঁজ করো তাহলে দেখবে কী ভয়ানক নীতিবাগিশ মার্কিনমানস। একমাত্র আত্মশক্তি দিয়ে এত বড একটা দেশ তৈরি করে আমেরিকা ভাবল সে না করতে পারে এমন কিছু নেই, আর সে যা করেছে, যে-পথে চলেছে তাই পৃথিবীতে সবচেয়ে বড়। ভুলে গেল সে রেড ইণ্ডিয়ানদের নিশ্চিহ্ন করেছে, নিগ্রোদের রেখেছে দাস করে; ভুলে গেল সে লাটিন আমেরিকায় যা দিয়েছে তার আসল নাম পরোক্ষ সাম্রাজ্যবাদ। ভুলে গেল তার গৃহযুদ্ধ, তার সামাজিক অন্যায়, ব্যাপক দস্যুপনায় তার আইনের চোখ-ঠারা প্রশ্রয়। শুধু মনে রাখল প্রকৃতিকে সে জয় করেছে, লাগিয়েছে মানুষের সেবায়, গড়েছে পৃথিবীর বৃহত্তম শিল্প-সভ্যতা, এনেছে জীবনে বিদ্যুতের গতি, জিতেছে ইতিহাসের সবচেয়ে সাংঘাতিক দুই যুদ্ধ, এবং নিজের হাতে জমা করেছে এমন এক মারাত্মক শক্তি যার আঘাতে সভ্যতাকে করতে পারে সে নিশ্চিহ্ন। তার শ্রেষ্ঠত্ব ও বিরাট শক্তি যে নীতিবলে অপরাজেয় এ বিশ্বাস মার্কিনমানসে বদ্ধমূল। তাই লেকচার ও উপদেশ দিতে আমেরিকার এত সহজ প্রবণতা। তাই মার্কিন কূটনীতির দোষগুণ যাই থাক না কেন, কোন ক্ষেত্রেই সে নীরব

নয়। ইংরেজ চুপ করে থাকতে পারে, রাশিয়া তো পারেই, কিন্তু ভুনিয়ার যেখানে যাই ঘটুক না কেন, আমেরিকান মন্তব্য আসবে সর্বাগ্রে। কথাবিন্যাসে, বাক্‌বিতণ্ডায় দুনিয়ায় আমাদের জুড়ি নেই।

সোমের মনে পড়ে গেল জন মিলারের সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের দিনটা। সোমের দিল্লীবাস—নাকি প্রবাস—তখন বেশী দিনের নয়। সে মাত্র মাস চারেক এখানে এসে জুটেছে, যেমনি অধিকাংশ এসে জোটে সেই সরকারী নোকরির টানে নয়, এক বড়-রকম দেশী-বিদেশী মিশ্র কোম্পানীর প্রতিনিধি হিসেবে। তার কাজ হল ভারত-সরকারের বাণিজ্য-শিল্প-অর্থনীতির ওপর নজর রাখা, খাতির জমানো যতখানি সম্ভব, যতগুলি সম্ভব, পদস্থ মানুষের সঙ্গে, সরকারী নীতি ও সিদ্ধান্ত বুঝিয়ে রিপোর্ট দেওয়া কোম্পানীর হেড আপিসে, আর কোম্পানীর বিবিধ প্রয়োজনের তদারক করা সরকারী দপ্তরে। বিদেশী শিক্ষা পেয়েও বিবেক সোম বাঙালী, তাই চাকরির প্রথম মাসগুলিতে তার প্রধান সমস্যা ছিল যাদের চেনে না, চিনতে চায় না, যাদের সঙ্গে তার বুদ্ধির বা হৃদয়ের কোন যোগাযোগ নেই, যাদের কথাবার্তা, চালচলন তাকে আঘাত করে, বিস্বাদ করে তার মনকে, তাদের সঙ্গে রোজ নিতান্ত চাকরির জন্যে কী করে ভাব জমানো যায়, তাদের প্রস্তর-কঠিন সবার-উপরে-আমরা-সত্য অহংকারকে নেহাত সৌজন্য ও ব্যক্তিত্ব দিয়ে গলিয়ে কাজ হাসিল করে নিতে হয়। সারা সপ্তাহ এ সমস্যার সঙ্গে লড়াই করে, কখনো জিতে, কখনো হেরে, মাঝে মাঝে কোন কোন রবিবারে বিবেক বেপরোয়া হয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ত। সব রবিবার তো আর রবিবার নয়; মাঝে মাঝে যে-রবিবারটা সাপ্তাহিক এনগেজমেণ্ট-লিষ্ট থেকে হঠাৎ মুক্তি পেয়ে যায়, ক্যালেণ্ডারে যার হিসেব থাকে না, জীবনতরু থেকে সে-ছিন্নপত্রই একমাত্র ছুটির রবিবার। সে-রবিবার খোলা ধূসর আকাশের মতো উদাস, আরাবল্লী পর্বতমালার আভাস নিয়ে যে আকারহীন পাথরের বিস্তৃতি দিল্লীর আশেপাশে তাদেরই মতো মনে-না-থাকার গৌরবে মহান।

এমনি একটা রবিবারে সোম কি করবে কিছু না ভেবে গাড়ি নিয়ে একা বেড়িয়ে পড়েছিল। বর্ষা তখন শেষ হয়ে শরতে সবে মিলিয়েছে। দিল্লীর ধূলি-ধূসর আকাশেরও চেহারা যে সুনীল হতে পারে, মেঘ আর কোমল সূর্যের হোলিখেলা যে এখানেও সম্ভব, তা দেখা যায় শুধু এই প্রথম শরতে। গাছ থেকে পাতা ঝরার শব্দ শুনতে পায় পথচারী। ঘাস ও পাতাগুলো আশ্চর্য

সবুজ, বাতাস কি অবিশ্বাস্য পরিষ্কার! কুণ্ডলী পাকিয়ে পাকিয়ে ধুলো ওড়ে না, ঢেকে যায় না সব কিছুর রঙ ধূসর আস্তরণে। মরুভূমির ডাকে হাওয়া হয়ে ওঠে না উত্তাল, গ্রীষ্ম-বর্ষা-শীতের প্রাণ-কাঁপানো সোঁ-সোঁ আওয়াজ যায় থেমে। উত্তর ভারতের মানুষ শরতের মাহাত্ম্য ও মাধুর্যের খবর রাখে না; শরৎ নিয়ে কবিতা লেখেন নি মির্জা গালিব বা মহম্মদ ইকবাল; দিল্লীর মানুষ হেমন্ত কাকে বলে তাও জানে না। শীতকে যে-জাত বলে 'সর্দি' তার সঙ্গে প্রকৃতি নিয়ে আলোচনা করতে সোম রাজী হয় না। সে আজ পর্যন্ত তার কোন বুরোক্র্যাট হিন্দুস্থানী বন্ধুকে চেঁচিয়ে উঠতে শোনে নি, দ্যাখো, দ্যাখো, আকাশটা কী সুন্দর! বাঙালী বলেই বর্ষার শেষে, শীতের আগে, যখন শরৎ আসে, আসে হেমন্ত, সোমের মন নেচে ওঠে। রাজস্থানী মরুর হাওয়া আরাবল্লীর বিক্ষিপ্ত পাথর-জমি, আর অন্তহীন ধুলো তার এই বাঙালী ভাববিলাসকে এখনো নষ্ট করতে পারে নি। তাই দিল্লীতেও সে বছরে ছয় ঋতুর সন্ধান করে! অথচ এ দেশের লোকেরা জানে প্রধানত শীত ও গ্রীষ্ম। জানে বর্ষাও। আর হোলি খেলে হইচই করে, তাই জানে বসন্ত। দেওয়ালী ওদের বড উৎসব, কিন্তু তাতে হেমন্তের মৃদু হিমের কোমল স্পর্শ নেই। শরৎ না জেনেই ওরা রামনবমী করে।

প্রথম শরতের যে দিনটাতে বিবেক সোম-জন মিলার পরিচয়, সেদিন সকালে গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে সোম গেল ইণ্ডিয়া গেটে; কিছুক্ষণ একা-একা নৌকো চালিয়ে চলে এল জিমখানায়। সাঁতার কেটে, স্নান সেরে, হঠাৎ মনে হল তৃষ্ণা পেয়েছে। বেয়ারাকে ডেকে এক বোতল বিয়ার্ডের অর্ডার দিল। বিয়ার পান করতে করতে ভাবল, এবার কোথায় যাই! দেশাই-এর বাড়ি গেলে ব্রিজ চলতে পারে, কিন্তু ললিতা দেশাই-এর ন্যাকামি মনে পড়ে মুখে অসহ্য তেতো লাগল। নরসিংহম ডেকেছিল ভারতীর কাব্য পড়িয়ে শোনাবে বলে, কিন্তু তার আগে কেন সে এখনো জয়েন্ট সেক্রেটারী হল না, অন্তত ঘণ্টা খানেক সেই দুবার-শোনা বিলাপ আর একবার শুনতে হবে। সরোজ চ্যাটার্জির বাড়ি গেলে আড্ডা বেশ জমে, অনেকেই এসে জুটেছে নিশ্চয়, কিন্তু হঠাৎ মনে পড়ে গেল সরোজের বোন সুলতার স্লিভহীন ব্লাউজ আর মেইডেনফর্ম কাঁচুলি ভর দিয়ে এগিয়ে-আসা জৈব শরীর, আর তখুনি টের পেল সোম তার বাঁ-পাটা একেবারে অবশ হয়ে গেছে।

পা'টাকে উদ্ধার করতে বেঁকে বসে সামনের দিকে তাকাতে চোখ পড়ল

এক বিদেশীর মুখে, পাশের টেবিলে সেও বসেছে বিয়ারের বোতল নিয়ে। দেখলেই বোঝা যায় আমেরিকান। আর যেহেতু প্রত্যেক আমেরিকান কথা বলবার জন্যে উৎসুক, তাই আলাপ জমল সহজে।

আধ ঘণ্টার মধ্যে জন মিলার সেদিন ভারতবর্ষের এমন কোন সমস্যা নেই যা নিয়ে মন্তব্য করতে ইতস্তত করল। সোমের বিস্ময়ের চেয়ে মজা লেগেছিল বেশি। মনে মনে বলেছিল, তুমি তো বাছা এক বছরও কাটাও নি এদেশটায়, এরি মধ্যে এত সব বুঝে ফেললে?

তবু জন মিলারকে তার ভালো লেগেছিল। তার মতামত উদার। ভারতের প্রতি তার দরদ একেবারে নকল, লোক-দেখানো মনে হল না। আর অন্য সব আমেরিকানদের মতো কলকাতার নাম উঠতেই সে নাক সিঁটকোয় নি; বলে নি: দ্যাট্ ইজ অ্যান্ অফুল প্লেস, ইফ্ ইউ এক্সকিউজ মি।

সে আজ ক' বছর আগেকার কথা। এর মধ্যে সোম-মিলার পরিচয় বন্ধুত্বে পাকা হয়েছে। মিলার দু'বার দেশে গেছে অবকাশে, সেখান থেকে যেসব চিঠি সোমকে লিখেছে ডালেস সাহেব তার চেহারা দেখলে চমকে যেতেন, মিলারের পাসপোর্ট হয়তো বাজেয়াপ্ত হত। দু'বারই মিলার ফিরে এসেছে ভারতবর্ষে। শুধু তাই নয়, আচার্য বিনোবা ভাবের সঙ্গে পায়ে হেঁটে বিহারের অংশ ঘুরে বেড়িয়েছে। ভারতের এমন কোন বড় শহর নেই সে দর্শন করে নি। শান্তিনিকেতনে কাটিয়ে এসেছে তিন মাস, মন দিয়ে রবীন্দ্রনাথ পড়েছে; পণ্ডিচেরীতে থেকেছে দু' সপ্তাহ, বেলুড়ে এক মাস। এমন কোন রাজনৈতিক নেতা নেই যাঁর সঙ্গে সে আলাপ করে নি। প্রধান মন্ত্রী নেহেরু থেকে দ্রাবিড় নেতা রামস্বামী ন্যায়েকার পর্যন্ত।

সন্ধানী দৃষ্টিতে জন মিলার ভারতবর্ষকে দেখেছে, দেখছে। সোম তার ক্ষুদ্রাংশও পারে নি, করে নি।

কথাবার্তা আর একটু এগোতে সোমপত্নী সুরমা বাড়ি ফিরল। গাড়ি থেকে নেমে গেটে ঢুকে খুশীতে বলে উঠল, আরে মিলার সাহেব যে! কখন এলেন?

মিলার উঠে দাঁড়িয়ে জোড়-হাতে নমস্কার করল। বলল, অনেকক্ষণ।

সুরমা সৌজন্য করল: আমার এত দেরি হবে ভাবি নি। কিছু খাবার-টাবার জুটেছে তো, না দু'জনে বাক্যসমুদ্রে ডুবে আছেন?

এবার কথা বলল সোম: মিলারের মনোভাবটা এতক্ষণ ছিল, সেই সবাইকে-দেখতে-পাচ্ছি কাউকে-দেখতে-পাচ্ছি-না গোছের।

উত্তীর্ণ সন্ধ্যার অন্ধকারে সুরমার গালে রং লাগল। বলল, তোমার সবটাতে ফাজলামি! মিলারের প্রতি : এবার কোত্থেকে, এতদিন পরে?

মিলার বলল, কাশ্মীর ঘুরে এলাম। মাসখানেক ছিলাম।

সোম প্রশ্ন করল : কী দেখে এলে?

কাশ্মীর, উত্তর দিল জন।

সোম বুঝল সুরমার সামনে সে আর রাজনীতি কপচাতে চায় না।

•

জন মিলার যখন নিজামুদ্দিনে তার ফ্ল্যাটে ফিরল রাত তখন এগারোটা। সোমরা তাকে ডিনার খাইয়ে দিয়েছে। রুই মাছের ফ্রাই, মুরগীর ডিম দিয়ে রান্না হালকা পোলাউ, খানিকটা মাছের ঝোল আর সাদা সরুভাত, পুডিং। রাত্রে খাবারের পরে একটু ওয়াইন হলে ভালো হয়, কিন্তু বাঙালী সোমের বাড়িতে ও-পাট নেই। ক্লাবে, পার্টিতে সোম এক-আধটু পান করে, কিন্তু বাড়িতে ওসব অচল। পাঞ্জাবী বন্ধুদের ডেরায় গেলে এ অতৃপ্তিটা বয়ে বেড়াতে হয় না। তবু সোম-সুরমাকে জন মিলারের ভালো লাগে। ওদের নিজস্ব কালচার আছে। সোম অক্সফোর্ডে পড়েছে, তবু সে একান্ত বাঙালী আর সুরমা, সী ইজ স্যুইট ইনডিড! তন্বী দীর্ঘাঙ্গী সুরমার রংটা ব্রাজিলের মেয়েদের মতো শ্যামলা-ফর্সা, চুল পড়েছে সারা পিঠ ছড়িয়ে। গভীর কালো চোখের ওপর প্রায় জোড়া ভ্রূ। একটু চওড়া কপাল। হাসলে গালে যে ভাঁজ পড়ে জন মিলারের সেটি বড় পছন্দ—দেশের মেয়েদের মুখে এ-জিনিস তার চোখে পড়ে নি বা তাকিয়ে দেখে নি। ঠোঁটের ভাঁজে কোথায় যেন লাস্যের ইংগিত। দাঁতগুলো চকচকে, সমান; তাই হাসিটি মিষ্টি। চিবুকে প্রচ্ছন্ন অনুরোধ, বেশি কাছে এসো না।

এই প্রচ্ছন্ন অনুরোধটি জন মিলারকে বার বার বিহ্বল করেছে। খুব সপ্রতিভ মেয়ে সুরমা, বন্ধুত্ব তাদের অনেক দিনের। কিন্তু অনেক কাছে থেকেও সুরমা বেশ দূরে। হেসে ঢলে পড়লেও নাগালের বাইরে। খেতে বসে বার বার সুরমার মুখের দিকে তাকিয়ে তার মনে হয়েছে, সুরমা সোমসর্বস্ব, সোমরসে পরিপূর্ণ। অথচ তার ঠোঁটে লাস্যের ইংগিত, আর সঙ্গে সঙ্গে চিবুকের অনুরোধ—বেশি কাছে এসো না, একটু সরে বসো!

ফ্ল্যাটে ফিরে মিলার প্রথমে পানীয়ের তৃষ্ণা মেটাল। সঙ্গে সঙ্গে চোখের উপর ভেসে উঠল সুরমার মুখ। মাঝে মাঝে সিল্কের আঁচল খসে পড়ে

সুরমার যৌবন জন মিলারের চোখে মুহূর্তের চোখ রেখেছে। কী ভয়ানক এই বাঙালী মেয়ের শাড়ির আঁচল—ভেবেছে জন মিলার। তার দেশের মেয়েরা যৌবন লুকোতে চায় না, উত্তর ভারতের মেয়েরা লুকোতে জানে না। কিন্তু এই বাঙালী মেয়ে জানে তার দেহের ঐশ্বর্য, জানে কী করে তাকে আড়ালে রাখতে হয়, কী করে সামান্য আভাসে, ইংগিতে জানিয়েও দিতে হয় তার সম্পদের ভাণ্ডার! জন মিলার বুঝল তার তৃষ্ণা আজ একটু বেশি। তাই আরও কিছু পান করল! এবার মনে হল সে স্বাভাবিক হয়েছে।

এমন সময় টেলিফোন বাজল।

হ্যাঁ, আমি জন মিলার…আজই ফিরেছি…হ্যাঁ, তা পারা যাবে…ত্ব'চার দিন সময় লাগবে…না, অত তাড়াতাড়ি হবে না…বড় রিপোর্ট ?…বেশ তো, আজ সোমবার, বুধবার পাবেন…না, না, আর কাউকে পাঠবেন…হ্যাঁ চলবে… আচ্ছা গুড নাইট।

সজ্জা ছেড়ে জন মিলার শোবার পোষাক পরতে যাবে, এমন সময় আবার বাজল টেলিফোন : জন মিলার বলছি। গুড ইভনিং। ও, আই সী! বেশ তো, এসো। হ্যাঁ, এখানেই। আমি একাই আছি। ভালো আছি—তবে ঘুম পাচ্ছে! হ্যাঁ, এখুনি এসো।

পনের মিনিটের মধ্যে একখানা কালো গাড়ি এসে দাঁড়াল মিলারের বাড়ির দরজায়। একটু পরে জন নিজেই দরজা খুলল।

হ্যালো, ডার্লিং। বলে যে মেয়েটি ঢুকল তার দেহের সবচেয়ে বড় ব্যাপার মধ্যভাগে। কাঁধ-খোলা টাইট-ফিটিং ফ্রকে সে-ব্যাপার ভয়ংকর প্রকট। মেয়েটির চোয়াল চওড়া, ঠোঁট ভারী ও মোটা, চোখে মধ্যদিনের তীক্ষ্ণ প্রখরতা। কপালের বাঁ-দিকে আধ-ইঞ্চি কাটা দাগ।

হ্যালো! জবাব দিল জন। হাতে হাত মেলাল।

এতদিন কোথায় গায়েব হয়েছিলে, জন ডার্লিং? গলার স্বর যথাসাধ্য মোলায়েম করে দেহ দুলিয়ে প্রশ্ন করল এডিন নিউটন, তার আগে জনের ঠোঁটপ্রান্তে আবছা চুমু দিয়ে।

কাশ্মীর গিয়েছিলাম। জন একটু আলগা করে নিল নিজেকে।

এই তিন মাস তের দিন কাটিয়ে এলে কাশ্মীরে? তীর ছুঁড়ল এনিড নিউটন।

জন একটু হাসল। এর আগে দিল্লী এসে এই মেয়েটিকে সে এড়িয়ে গিয়েছিল।

কবে ফেরা হল, আমার সোনার চাঁদ?

আজই।

জানো জন, আমার সোনা, তোমাকে আমি তিন হাজারবার টেলিফোন করেছি। শুধু বেজেই গেছে ঐ নিষ্প্রাণ যন্ত্রটা...এনিডের মধ্যপ্রদেশ আশ্লেষে উঠল, নামল।

জন বুঝল, তরল জ্বালাময় পদার্থ এঁর পেটে আজ একটু বেশি পড়েছে।

কাশ্মীরের মেয়েরা খুব সুন্দর আর ভয়ানক নোংরা, না?

জন বলল: হুঁ।

হাউ মেনি অব দেম ডিড ইউ স্লিপ উইথ? এনিডের নিজস্ব কণ্ঠস্বর এবার ঠেলে বের হতে চাইল।

নান্।

আই ডোণ্ট বিলীভ্ ইউ—মিষ্টি মিথ্যুক জন, তুমি বড় সুন্দর মিথ্যে বলতে পারো।

জন একটু কড়া হল। কাজের কথাটা আগে সেরে নাও, এনিড। রাত এখন কম নয়। বারোটা বাজে।

ওঃ, দি নাইট ইজ ইয়ং, এ্যাণ্ড সো আর উই। সোফায় এলিয়ে পড়ল এনিড নিউটন।

তার মোটা মাংসল পা-দু'টোর দিকে তাকিয়ে জন বলল: কী এনেছ?

তড়াক করে লাফিয়ে উঠল এনিড নিউটন। হঠাৎ তার যেন সংবিৎ ফিরল। বদলে গেল একেবারে। গম্ভীর মুখ কঠিন হয়ে উঠল। কটা চোখে ভয়ের ছায়া!

উঠে দাঁড়াল। জনের দিকে পেছন ফিরে মৃদু স্বরে বলল, খোলো।

এনিডের ফ্রকের বাঁধন খুলল জন মিলার। আলগা হয়ে গেল ফ্রক। বুক থেকে খসে পড়ল অন্তর্বাস। রইল শুধু করসেট আর এনিড। একবার সে ভয়ার্ত গাম্ভীর্যে তাকাল জনের দিকে। তারপর কোমরের সঙ্গে চ্যাপ্টা করে বাঁধা একটা সিল্কের থলি বার করল। দিল তুলে জনের হাতে নিঃশব্দে।

থলিটা খুলে জন একতাড়া নোট পেল। সবগুলো দশ ডলারের। গুণে খুশী হল। দশখানা থলিতে পুরে ফিরিয়ে দিল এনিড নিউটনের হাতে।

এনিড হাসল। বাকি নোটগুলো জন পকেটে পুরল। এনিডকে পেছন ফিরিয়ে ফ্রকের কাপড় তুলে ধরল। জোড়া লাগাতে গেল বন্ধন। এনিড ব্যথাভরা চোখে একবার তাকাল। জন বলল, আজ এখুনি তোমায় বাড়ি যাওয়া দরকার, মধুমতী, রাত হয়েছে অনেক, আর সাবধানের মার নেই। বলে, এনিডের মুখখানা ফিরিয়ে আনল নিজের মুখের দিকে, একটা গোঁজামিল চুমু দিল তার ঠোঁটে। এনিড উত্তাপ দেখাতেই নিজেকে মুক্ত করে নিল জন মিলার।

এনিড বিদায় নিলে জন মিলার পকেট থেকে নোটগুলো বের করে অর্থ-দর্শনে পুনরায় প্রীত হল। ডলারের বড় অভাব যুক্তরাষ্ট্রের বাইরে। যেমন অভাব, তেমনি মূল্য। কালই এ নোটগুলো চলে যাবে ভারত ছাড়িয়ে অন্য কোন দেশে, যেখানে দেশী ছাপানো নোটের মর্যাদা কমে গেছে, আর ডলার যেখানে শক্তি।

দুই

রাইসিনা হোস্টেলের এক-কামরা গৃহে বসে চিঠি লিখছিল পিটার কাবাকু। লিখছিল তার স্ত্রী ওয়াচিরাকে। প্রত্যেক রবিবারে নিয়মিত একখানা পত্র স্ত্রীকে লেখা পিটারের অবশ্যকর্তব্য। সব কাজ ফেলে এ কাজ সে নিবিড় নিপুণতার সঙ্গে করে থাকে। শুধু এ নয় যে সাগরজলের দূরত্বের ওপারে উৎসুক প্রতীক্ষায় কেবল ওয়াচিরা অপেক্ষা করে স্বামীর সাপ্তাহিক এই চিঠির; পিটারের চিঠি পড়া হয় তার ও ওয়াচিরার সমবয়সী মহলে, এবং তারপর বয়োজ্যেষ্ঠদের বৈঠকে। কেননা, পিটার যা লেখে তাতে থাকে তার ভারত-দর্শনের ইতিবৃত্ত, ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের অভিজ্ঞতাকে আফ্রিকার ব্যবহারে লাগাবার সম্ভাবনার ইংগিত।

এ বাড়িটা তৈরি হয়েছিল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় মার্কিন সৈন্যদের জন্যে। শ'খানেক কামরা, মাঝে মাঝে দেওয়ালের মধ্য দিয়ে সরু করিডর, যেখানে সূর্যের প্রবেশ নিষিদ্ধ। সৈন্যরা থাকত বলে ব্যক্তিগত গোপনীয়তার বালাই নেই। এক সারিতে গোটা পঁচিশেক পাইখানা এবং প্রস্রাবাগার, গোটা কুড়ি স্নানের ঘর। যখন বাড়িটা নির্মিত হয়েছিল তখন কেউ যুদ্ধের পরে

কী হবে ভেবে দেখে নি। যে-বাড়ির ঠিকুজিতে দশ বছরের বেশি আয়ু লেখা নেই, সে আজ সতের বছর টিঁকে আছে। দেওয়াল খসে পড়েছে মাঝে মাঝে, মেঝের আবরণ সরিয়ে সাবেকি ইঁট-বালু উঁকি মারছে, সিঁড়ি গেছে ভেঙে এখানে ওখানে, তবু বাড়িটা রয়েছে, না ভেঙে ফেললে হয়তো আর এক যুগ থাকবে।

এখন মানুষের দিক থেকে এক আশ্চর্য মিলনভূমি এই বাড়িটা। সরকারি খাতায় এর নাম কুমারগৃহ। অর্থাৎ অবিবাহিত সরকারি কর্মচারীদের এখানে আশ্রয়। আসলে কিন্তু তা নয়। অনেকে আছে স্ত্রী নিয়ে, সন্তান নিয়ে। বেশ কিছু ভারতীয়ের সঙ্গে আছে বেশ কয়েকজন বিদেশী; পৃথিবীর নানা দেশ থেকে এসেছে তারা ভারতের রাজধানীতে—চীন, ইরান, বর্মা, শ্যামদেশ, এমেন, ইজরেইল এবং আফ্রিকা, যেখান থেকে এসেছে পিটার কাবাকু। আফ্রিকা তো একটা দেশ নয়, মহাদেশ। তবু পিটার নিজেকে ভাবে, আমি আফ্রিকান। ভারতীয়রা আমাকে তাই বলে জানে, দেখে। আফ্রিকান মানে ঘোর কৃষ্ণবর্ণ দেহ, মাথায় কুঞ্চিত ছোট ছোট গুচ্ছ-চাপা চুল, চওড়া-উঁচু কপাল, থ্যাঁদা নাক, প্রশস্ত বেরিয়ে-আসা চোয়াল, মোটা ভারী ঠোঁট। এ যার আছে, সবগুলি অথবা কিছু, সে-ই আফ্রিকান, হোক না তার নিবাস ইংরেজের আফ্রিকা, বা পর্তুগীজ কি বেলজিয়ম আফ্রিকা। মিশরীরা ভারতীয় চোখে আফ্রিকান নয়, কেননা তাদের গায়ের চামড়া শাদা বা তামাটে। দক্ষিণ সুদানীরা আফ্রিকান, কেননা তারা কালো।

চিঠি লিখতে বসে পিটার মুশকিলে পড়ে। প্রত্যেক সপ্তাহে তার এই এক সমস্যা। তিন বছর হয়ে গেছে ভারতে সে অতিথি। ভারত সরকার বৃত্তি দিয়ে তাকে আমন্ত্রণ করেছেন পঠন-পাঠনের জন্য। ভারতীয় গণতান্ত্রিক অগ্রগতি দেখবার সুযোগও সে পাচ্ছে। ঘুরে বেড়িয়েছে বিচিত্র, বিরাট এ দেশটার অনেক শহরে, দেখেছে কিছু গ্রামও। তার মতো প্রায় তিন শ' মিশকালো আফ্রিকান ভারত সরকারের অতিথি। সবাই পাঠ নিচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়ে, বেশ কয়েকজন অর্থ উপার্জনের ব্যবস্থাও করে নিয়েছে। কেউ বা রেডিয়োর আফ্রিকান বিভাগে কাজ পেয়েছে, কেউ বা পররাষ্ট্র দপ্তর থেকে অনুবাদের কাজ পেয়ে দু'-চারশো টাকা রোজগার করে, আবার কেউ বা কাজ শেখে খবরের কাগজে, সামান্য বৃত্তি দক্ষিণা পায়। এদের বেশির ভাগ আছে দিল্লীতে, আর এরা যে আফ্রিকার ছাত্রসমিতি গঠন করেছে তার

সভাপতি নির্বাচিত হয়েছে পিটার কাবাকু। পিটার শুধু তাই পিটার নয়, সে ভারত-রাজধানীতে জেগে-ওঠা আফ্রিকার তরুণ প্রতিনিধি। তার প্রবাসী জীবনে আছে কর্মব্যস্ততা, উত্তেজনা, উত্তাপ, আর আছে ভারতকে জানবার কর্তব্যবোধ, দূর-দৃষ্টি নিয়ে ভারত-আফ্রিকার ভবিষ্যৎ সম্পর্ক দেখতে পাওয়ার সযত্ন প্রচেষ্টা।

তিন বছরের অভিজ্ঞতায় পিটার কাবাকু জানে ভারত-পরিচয় সহজ নয়। ভারত-প্রবাসী বেশির ভাগ তরুণ নিগ্রো-হৃদয়ে ভারতের জন্য অবিমিশ্র শ্রদ্ধা জমে নাই। বরং কয়েকজন তো ভারত বলতে রেগেই ওঠে। এর কারণ জটিল, কিন্তু, তাদের যদি বলা যায় একটি বাক্যে তার পরিচয় দাও, তারা বলবে, 'তোমরা আমাদের মানুষ বলে মনে করো না, মনে করো আমরা মানুষের চেয়ে নীচু'।

তিন বছর আগে যেদিন পিটার জাহাজ থেকে বোম্বের ভারত-দ্বার দিয়ে ঢুকে এদেশের মাটিতে পা দিয়েছিল, সেদিনই তার এ কথা মনে হয়েছিল। এদেশের সরকার অর্থ ব্যয় করে পরম আদরে তাকে ডেকে এনেছে তার উপকারের জন্যে। এ দেশ গান্ধীর দেশ, নেহেরুর দেশ! অনেক শ্রদ্ধা, অনেক বড় শ্রদ্ধা নিয়ে পিটার ভারতভূমিতে পদার্পণ করেছিল। কিন্তু জেটিতে নেমে সে হঠাৎ বুঝতে পারল গায়ের রং, দেহের গঠন, মুখের আদল ভারতে তাকে দূরে সরিয়ে রাখবে। ব্যস্ত-সমস্ত মানুষগুলো যে-চোখে তার দিকে তাকিয়েছিল, সুসজ্জিতা, সুদর্শনা মেয়েরা তাকে দেখামাত্র নিজের অজ্ঞাতে যেমনি করে নাসিকা-কুঞ্চন করেছিল, ট্রেনে যেভাবে সহযাত্রীরা তাকে একাদিকে নিতান্ত একাকী করে রেখে দিয়েছিল তাতে পিটার বুঝেছিল, এদেশ তাকে খাওয়াবে, পড়াবে, তার সঙ্গে ভদ্র ব্যবহার করবে, তাকে দূরে সরিয়ে রেখে হয়তো খাতির করবে, কিন্তু বন্ধু, প্রিয়জন বলে স্বীকার করবে না, তাকে নিয়ে পেছনে হাসবে, বলবে, মানুষ হতে ওদের এখনো অনেক দেরি।

মনে আছে পিটারের সেই শান্ত এপ্রিলের প্রসন্ন সন্ধ্যা, যখন বোম্বাই থেকে রেলগাড়ি তাকে নিয়ে এল দিল্লী স্টেশনে। নিওন আলোয় ঝলমল করছে রাজধানীর স্টেশন, নানা লোকের ত্রস্ত, ব্যগ্র, উৎসুক ভিড়, যাত্রীরা নামছে, কুলির চেঁচামেচি, মাল্সের ধাক্কা। আর রেল স্টেশনের সেই পুরাতন, পরিচিত গন্ধ, যে-গন্ধ ভূগোলের সীমা মানে না।

পিটার স্টেশনে নেমে একটু হকচকিয়ে গিয়েছিল। একে অপরিচিত দেশ, তারপরে এ তো বোম্বে নয় যেখানে সে ছিল মাত্র কয়েক ঘণ্টার আগন্তুক, এ হচ্ছে দিল্লী, যেখানে তাকে বেশ কয়েক বছর থাকতে হবে, ভালো লাগাতে হবে, ভালো লাগতে হবে। বুক যে কাঁপছে সহজে পিটার টের পেল, একটু পরে বুঝতে পারল পা দুটোও একেবারে স্থির নেই। অনেক আশা-আকাঙ্ক্ষা নিয়ে ভারতের রাজধানীতে এসেছে পিটার, শুধু পড়তে নয়, জানতে, বুঝতে, যাতে ফিরে গিয়ে সে তার দেশের সেবা করতে পারে। তার দেশ কিনিয়া হতভাগ্য ; বড় দুঃখে দিন কাটছে তার।

দুটি তরুণ-তরুণী এগিয়ে আসছে তার দিকে, পিটার দেখতে পেল। দু'জনেই ভারতীয়। খুব ভালো লাগল পিটারের ঃ যুবকটি য়ুরোপীয় পোষাক পরেছে, যেমন পরেছে পিটার নিজে। ফর্সা রং, কালো চুল পাট করে ব্যাক ব্রাশ করা, মুখে প্রচ্ছন্ন বন্ধুত্ব। মেয়েটি তত শাদা নয়, কিন্তু সুন্দর মনে হল মুখের ছাঁদ, বড বড চোখ, টিকলো নাক, পাতলা ঠোঁট, আর ডান গালে বড় একটা কালো দাগ। পরেছে সালোয়ার কামিজ, যা পিটারের মনে হল বিলেতি মেয়েদের ফ্রকের চেয়ে ভালো, তার ওপর পাতলা মেঘ-রঙের উড়নি, মাথায় এক ঝাঁক কোঁকড়া চুল, ঘাড়ের কাছে ছাঁটা।

একটু দূর থেকে পিটারকে ওরা দেখতে পেয়েছে। এ গাড়িতে সে এক আফ্রিকান, সুতরাং ভুল হবার কারণ নেই। পিটার হয়তো বেশ একটু আগ্রহের সঙ্গে ওদের দিকে তাকিয়েছিল, তাই বুঝি ওকে দেখে মেয়েটির মুখে যে সূক্ষ্ম পরিবর্তন হল, তা চোখে বিঁধে গেল। এর সঙ্গে পিটারের পরিচয় অনেক দিনের, ছোটবেলা থেকে। এ পরিবর্তন আরও স্পষ্ট, তীর্যক ও তীক্ষ্ণ দেখেছে সে নাইরবির পথে বিলেতি মেয়েদের মুখে ; সামান্য মৃদুতর এর চেহারা দেখেছে নাইরবিতেই ভারতীয় মেয়েদের মুখে। আসলে এ সেই একই অনুভূতি, পিটার জানে, যদিও মেয়েটি চট করে নিজেকে সামলে নিয়েছে, এবং বেশ হাসিমুখে এখন এগিয়ে আসছে।

ছেলেটি এসে জিজ্ঞাসা করল সে পিটার কাবাকু কিনা। পিটার বলল, হ্যাঁ। ছেলেটি হাত বাড়িয়ে পিটারকে করমর্দন করল। বলল, আমি মদন কাপুর, তোমাকে ভারতের রাজধানীতে স্বাগত করছি, আশা করি তুমি প্রবাস উপভোগ করবে।

পিটার মৃদু কণ্ঠে জবাব দিল, তোমাকে অনেক ধন্যবাদ। আমি ভারতে

এসে সৌভাগ্যবান। আশা করি আমি অনেক কিছু শিখতে পারবো, এবং তোমাদের বন্ধুত্ব ও শুভেচ্ছা পাবো।

মদন এবার পার্শ্ববর্তিনীর পরিচয় দিল, আমি এসেছি ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল অব কালচারেল রিলেশন্‌স্‌ থেকে, আর ইনি, কুমারী ললিতা ভাটিয়া, ভারত-আফ্রিকা মৈত্রীসঙ্ঘ থেকে।

ললিতা মৃদু হেসে দু'হাত জড়ো করে বলল, নমস্তে।

পিটার এই সুন্দর অভিবাদন আগেই রপ্ত করে নিয়েছিল। একটু আনাড়ি হলেও বেশ আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে সেও বলল, নমস্তে।

ললিতা এবার লজ্জায় রক্তিম। তবু শুধু একবার গলা ঝেড়ে, একবার জিভ দিয়ে ঠোঁট ভিজিয়ে কিনিয়ার পিটার কাবাকুকে ভারতের ললিতা ভাটিয়া স্বাগত জানাল। ছোট বক্তৃতাটি নিশ্চয় সে মুখস্থ করে এসেছিল, তাই এক নিঃশ্বাসে এক মিনিটে অতগুলো কথা অমন চমৎকার ইংরেজিতে বলতে পারল, যার মর্ম হচ্ছে, তুমি, পিটার কাবাকু, ভারতে এসেছ জাগ্রত আফ্রিকার প্রতিনিধি হয়ে। তোমাকে আমরা স্বাগত করছি এবং আমাদের আশা তুমি ও তোমার মতো অন্যান্য আফ্রিকান ছাত্রদের মাধ্যমে ভারত ও আফ্রিকার মধ্যে নতুন মৈত্রী ও আন্তরিকতার সৃষ্টি হবে।

পিটার শুনল, কিন্তু একবারও মেয়েটির দিকে তাকাল না। তার ভাষণ শেষ হলে, পিটার বলল, আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। আপনার প্রতিটি কথা সার্থক হোক।

প্ল্যাটফর্ম থেকে বেরিয়ে এসে অপেক্ষমান গাড়িতে বসল পিটার, তারপর মদন কাপুর, তার পাশে ললিতা ভাটিয়া। পুরোনো ও নতুন দিল্লীর রাস্তা পেরিয়ে, গাড়ি এসে থামল এই রাইসিনা হোস্টেলের ফাটকে। আপিস-রুমে গিয়ে কিছু কাগজপত্র সই করতে হল। তারপর ওরা দুজনে ওকে পৌছে দিল ওর ঘরে, এই তেত্রিশ নম্বর কামরা, একখানা খাট, একটা টেবিল, খানকয়েক চেয়ার, আয়না-বসানো ওয়াড্রোব, বই-রাখার শেল্‌ফ। দু'চারটে ভদ্রতা-বিনিময় করল মদন ও পিটার, ললিতা চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল একপাশে। তারপর ওরা আবার হাত তুলে বলল, নমস্তে, এবং বিদায় নিল।

পিটার ওয়াচিরাকে প্রথম চিঠি লিখতে বসে বার বার দেখতে পেল ললিতার মুখ, আর সে-মুখে সেই হঠাৎ-কুঞ্চন, যার পেছনে—কী? ঘৃণা?

ভয়? ঘৃণা হয়তো নয়, কিংবা হয়তো ঘৃণাই। বিরাট আফ্রিকাকে বাকি পৃথিবীর মানুষ শুধু হিংস্র পশুর গভীর জঙ্গল বলে জেনে এসেছে, যে-জঙ্গলের বুকে বাস করে আদিম, অসভ্য বীভৎস মানুষ, নগ্ন দেহ, ভূত-প্রেত-ম্যাজিকে বিশ্বাসী, ভয়ানক অনাচারে লিপ্ত। এমন নিগ্রো ক'টি যে অ-নিগ্রো জগতে সমান মর্যাদা পেয়েছে? শুধু তার গায়ের রং ঘোর-কৃষ্ণ বলে, তার দেহাকৃতি আলাদা বলেই কি পৃথিবীতে নিগ্রোর এই অনাদর? শাদা, অর্ধ-শাদা, হলদে, ফ্যাকাশে, তামাটে মানুষরা কোন্ মাপে নিগ্রোর চেয়ে বড়? হলিউডের ছায়াচিত্র কি নিগ্রোজাতির এতো সর্বনাশ করেছে?

ললিতার সঙ্গে ওয়াচিরার কোন মিল নেই। ওয়াচিরা কিনিয়ার নিগ্রো মেয়ে, তার দেহের রং গভীর কালো, ললিতার ও মদন কাপুরের চোখে সে হয়তো ভয়ানক কুশ্রী। তবু পিটারের সে প্রিয়তমা। ললিতা, তুমি যতই লাস্যময়ী হও না কেন, আমার আফ্রিকান চোখে ওয়াচিরা তোমার চেয়ে সুন্দরী।

পিটার লিখল, আজ আমি এসে পৌঁছেছি দিল্লীতে। এখানকার সবাই আমাকে পরম আদরে গ্রহণ করল। স্টেশনে একটি যুবক ও একটি মেয়ে আমাকে স্বাগত করতে এসেছিল। একজন ভারত সরকারের পক্ষ থেকে, অন্যজন, এমন একটি প্রতিষ্ঠান থেকে যার উদ্দেশ্য ভারত ও আফ্রিকার মৈত্রী সুদৃঢ় করা। দিল্লী শহর বিরাট, আর বেশ সমৃদ্ধ বলে মনে হচ্ছে। যে বাড়িতে আমি এসে উঠেছি সেটা একটা হোস্টেল। বেশির ভাগ বাসিন্দা আমার মতো একা। কেউ কেউ অবশ্য সপরিবার। একা হোক আর সপরিবার হোক, প্রত্যেকের একখানা করে ঘর। ঘরটা বড়ই, আসবাবপত্র বেশ ভালো। আরও কিছু আফ্রিকান আছে শুনেছি, বিদেশীও আছে, কিন্তু এখনো কারো সঙ্গে পরিচয় হয় নি। মনে হচ্ছে, ভারত-প্রবাস আমার উপকারে লাগবে। ভাবতে শিহরণ লাগে এটা গান্ধী-নেহেরুর দেশ। এরা বিনা রক্তপাতে ইংরেজকে তাড়িয়েছে। আমি শুধু সেই বিদ্যাটুকু প্রাণ-মন দিয়ে শিখতে চেষ্টা করবো। এরা আফ্রিকানদের ভালোবাসে, এদের আত্মম্ভরিতা নেই। অবশ্য প্রাথমিক ধারণার কথাই বলছি।

ললিতার মুখ-কুঞ্চনটা পিটার হজম করে গেল। নিগ্রোদের এমন অনেক কিছু হজম করতে হয়।

এ ঘটনার পর তিন বছর কেটে গেছে। তিন বছরে পিটার দেখেছে অনেক,

শিখেছে অনেক, জেনেছে অনেক। যে-পিটার তিন বছর আগের এক বসন্ত-সন্ধ্যায় দিল্লীতে পদার্পণ করেছিল, সে আর নেই। দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাজতত্ত্ব নিয়ে সে এম. এ. পাস করেছে। ভারত সরকার তাকে কমিউনিটি প্রজেক্টে কাজ করবার ও শিখবার জন্যে আরও দু'বছরের বৃত্তি দিয়েছেন। ইতিমধ্যে মাউ মাউ বিদ্রোহ আর ইংরেজ অত্যাচারের আগুনে তার দেশ জলে ছাই হতে চলেছে। পিটার মাউ মাউ দলের রীতিনীতিতে বিশ্বাস করে না। তার স্থির ধারণা, সহিংস লড়াইয়ে ইংরেজকে তাড়াবার ক্ষমতা কিনিয়ার এখনো নেই, হতে অনেক দেরি। কিনিয়ার মুক্তির একমাত্র পথ গান্ধী প্রদর্শিত অহিংস অসহযোগের পথ। এ ক'বছর পিটার গান্ধীবাদ নিয়ে অনেক পড়েছে, অনেক তর্ক-বিতর্ক করেছে, ভেবেছে, কিনিয়ার ও অন্যান্য আফ্রিকান দেশের কাগজে প্রবন্ধ লিখেছে। কিন্তু গান্ধীবাদ কিনিয়ায় ঠিক কীভাবে বিনিযুক্ত করা যায় তা সে বুঝে উঠতে পারে নি। তার সাপ্তাহিক চিঠি এখনো গ্রামে তার সমবয়সীদলের মধ্যে একসঙ্গে পঠিত ও আলোচিত হয়, বয়োজ্যেষ্ঠ নেতারাও পড়েন, কিন্তু ওয়াচিরার জবাব থেকে পিটার জানতে পায়, স্বদেশে তার শান্তিবাদী নীতির সমাদর সুগভীর নয়।

হায়, হিংসা এমনই কুটিল বিষ! দেহপ্রাণকে সে জর্জরিত করে, দৃষ্টিকে অন্ধ। তা নইলে যে-গিকুয়ু উপজাতিতে পিটারের জন্ম, অথচ পুরোপুরি যার রীতিনীতি সে কোনদিন মানে নি, তার মতো শান্তিকামী গোষ্ঠি আর কোথাও নেই। তার মাতৃভাষায় অভিবাদন হচ্ছে, থা-আ-আ-ই অর্থাৎ শান্তি। তুমি আমার উপকার করেছ, তোমাকে 'ধন্যবাদ' বলবো না, বলবো, থা-আ-আ ই —তোমার শান্তি হোক। দেবতাদের কাছে প্রার্থনার প্রত্যেক দ্বিতীয় পদে শান্তি-কামনা। শান্তির চেয়ে গিকুয়ুর আর বড় কিছু নেই। সেই গিকুয়ু আজ প্রাণপণ করে ইংরেজের বিরুদ্ধে লড়ছে, আর ইংরেজও বিজ্ঞানের বড় বড় মারণাস্ত্র হেনে তার বাড়ি, ঘর, গ্রাম জ্বালিয়ে দিচ্ছে।

এ কথাটাই পিটার আজ ওয়াচিরাকে লিখছিল: আমাদের বীরত্ব আছে, সাহস আছে, দৃঢ়প্রতিজ্ঞা আছে। আমরা ইংরেজের সঙ্গে মৃত্যুপণ লড়ছি। কিন্তু পরাজয় আমাদের অনিবার্য। ইংরেজ হিংস্রতায় আমাদের চেয়ে অনেক বড়। সমস্ত আফ্রিকার বুকে য়ুরোপীয় হিংস্রতার ছাপ রয়েছে। হিংসার অনেক অস্ত্র রয়েছে ইংরেজের হাতে, সব-কিছুর ব্যবহার সে করবে। পৃথিবীটার বিবেক বলে কিছু আর নেই। স্পেনের গৃহযুদ্ধে বিমানপোত ব্যবহারে

পৃথিবীর বিবেক কেঁপে উঠেছিল। কিন্তু কিনিয়ায় যে ন্যাপাম বোমা ব্যবহৃত হচ্ছে তাতে ধরিত্রীর বুক কাঁপছে না। মৃত্যু, হত্যা, হিংসা দেখে দেখে পৃথিবীর সয়ে গেছে। আর একটা মহাযুদ্ধে ইংরেজের শক্তি ক্ষীণতর না হওয়া পর্যন্ত হিংসার পথে আমরা কিছু পাবো না। আমাদের অন্য পথ বেছে নিতে হবে। একটা পথই আছে। সে হচ্ছে গান্ধীর পথ। অহিংস-অসহযোগের পথ। আমরা আমাদের সবটুকু সাহস আর বীরত্ব দিয়ে ইংরেজের সঙ্গে পূর্ণ অসহযোগ করতে পারি। আমরা ইংরেজের স্কুলে পড়বো না, বিলেতি জিনিস কিনবো না, ট্যাক্স দেবো না। ইংরেজের চাকরি করবো না। কিন্তু গান্ধীর জীবনী পড়ে আমি যা বুঝেছি, এ সংগ্রামের জন্যে আমাদের আরও অনেক সাহস ও ত্যাগের দরকার। ওরা আমাদের মারবে, জেলে পুরবে, অত্যাচার করবে। প্রতিবাদে আমরা নীরবে শুধু ওদের কাছ থেকে আরও দূরে সরে যাবো। আমরা ইংরেজকে ঘৃণা করবো না, শুধু ওদের অত্যাচারকে ঘৃণা করবো। "জেনারেল টিমোথী"* বীরপুরুষ, কিন্তু গান্ধী ছিলেন তার চেয়েও বড। ভারতবর্ষে ইংরেজের বিরুদ্ধে যারাই অস্ত্র তুলেছে, তাদের সবাইকে ইংরেজ শেষ করে দিয়েছে। কিন্তু গান্ধী অস্ত্র তোলেন নি, তাই ইংরেজও আজ তাঁকে প্রণাম করে। টাগোরের নাম শুনেছ? এশিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ কবি টাগোর। তার কিছু বই আমি পড়েছি। তিনিও হিংসার পথ ত্যাগ করতে বলেছেন এশিয়াকে, আফ্রিকাকে। ও পথ য়ুরোপের পথ। ওতে মানুষের সর্বনাশ। ও পথে গিয়ে আমরা কী পাবো, কী দেবো?...

চিঠি শেষ করা পিটারের হল না। হঠাৎ বেয়ারা এসে খবর দিল টেলিফোন এসেছে। নীচে আপিস ঘরে গিয়ে টেলিফোন ধরতে হল।

কথা বলছে সলোমন্ কুচিরো। মাতৃভূমি ন্যাসাল্যাণ্ড। মাত্র কয়েক মাস এসেছে নাইরবি থেকে।

পিটার, তুমি এখন কী করছ?

কিছু না।

আমি আসতে পারি? বিশেষ কাজ আছে।

তুমি এখন কোথায়?

কাছেই। বৃটিশ কাউন্সিল লাইব্রেরীতে।

* অন্যতম মাউ মাউ নেতা। ইংরেজদের হস্তে নিহত হয়েছেন।

চলে এসো।

ঘরে ফিরে এসে পিটার চিঠির সরঞ্জাম তুলে রাখল। বাকিটা রাত্রে শেষ করতে হবে। সলোমন এখুনি এসে পড়বে। তাকে নিয়ে বড় সমস্যা। সে নতুন এসেছে। নতুন প্রবাসে তার মন ভারী। এ দেশে তার প্রাণ জ্বলছে। অথচ তাকে রাখতেই হবে। প্রত্যেকটি আফ্রিকান এখানে এসেছে নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য নিয়ে। সে-উদ্দেশ্য পূর্ণ করতে হবে। পিটার তাদের নির্বাচিত নেতা। যদি উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়, সে-ব্যর্থতা পিটারের। পিটার আফ্রিকান নিগ্রো। ব্যক্তি-সন্তুষ্ট মন নয় তার। সমষ্টি ছাড়া সে ভাবতে পারে না। সে শুধু 'আমি' নয়, সে 'আমরা'। তার সমাজ, তার শিক্ষা, তার ঐতিহ্য, আচার-কানুন সব গোষ্ঠি নিয়ে। ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য, ব্যক্তি-স্বার্থ এ সব ইংরেজি ভাবনা। আফ্রিকান-মানসে তার স্থান এখনও দুর্বল।

কয়েক মিনিটের মধ্যে সলোমন এসে হাজির হল। অল্প-বয়সী যুবক, নাদুস-নুদুস চেহারা, রং নিগ্রো-কালো হলেও মুখের আদল মন্দ নয়, এক গোছ বড় বড় চুল অবিন্যস্ত। মাংসল গালের মাঝখানে নাক তত চ্যাপ্টা নয়, এবং দাঁতগুলি আশ্চর্যরকম শাদা। পুরু খাটো ঠোঁট, কিন্তু চিবুকে কেমন আদুরে কোমলতা। চোখ দুটো বেশ বড়, হলদে, অসহায়।

সলোমন এসে চেয়ার দখল করে বসল। হাতে খান দুয়েক বই। রাখল টেবিলের ওপর। কিছুক্ষণ অসহায়ভাবে তাকিয়ে রইল পিটারের দিকে। তারপর ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল। পিটার তার মাথায় হাত বুলিয়ে বলল, কী হল?

অসম্ভব!—চেঁচিয়ে উঠল সলোমন।—অসম্ভব আমার এখানে থাকা। তুমি আমার ফেরবার ব্যবস্থা করে দাও। আমার টাকা আছে। আমি কালই চলে যেতে চাই।

কেন? তুমি তো এখন খুব আরামে আছ! আবার দমে গেলে কেন?

এ দেশে আমি থাকবো না, কিছুতেই থাকবো না। এ দেশে কোন নিগ্রোর আসা উচিত নয়। এরা একেবারে কপট, এরা অহংকারী, এদের চাল অসহ্য। এরা আমাদের মানুষ বলে মানে না।

তুমি ভুল বুঝেছ, সলোমন। তুমি—

না, না, না। আমি ভুল বুঝি নি। চামড়া-প্রীতিতে এরা ইংরেজেরও বাড়া। ইংরেজের গায়ের রং শাদা, তারা আমাদের ঘৃণা করতে পারে। এরা নিজেরা

কালো, তবু এরা আমাদের ঘৃণা করে। এরা কালো, কিন্তু এদের লোভ একমাত্র শাদার দিকে। দেখ না এদের কাগজ-ভরতি বিয়ের বিজ্ঞাপন! এরা প্রত্যেকে ফর্সা মেয়ে চায়, প্রত্যেক মেয়ে ফর্সা পুরুষ চায়। এরা ফর্সা বিদেশীর সঙ্গে ঘুরে বেড়ায়, কিন্তু নিগ্রোর ছায়া দেখলে এদের মুখ শুকিয়ে যায়। এরা আমাদের ঘৃণা করে। বাকি সবটুকু ভদ্রতার মিথ্যে মুখোস। তাই আরও অসহ্য। আমি এদের ঘৃণা করি। এরা আমার সঙ্গে কথা বলে না, আমার ছায়া এড়িয়ে চলে। আমি এদের প্রত্যেককে ধর্ষণ করতে চাই।

পিটার গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল। যা কোনমতে করা উচিত নয়, সলোমন তাই করে ফেলেছে। সে কোন ভারতীয় মেয়ের প্রেমে পড়েছে। ভেবেছে সে তরুণ, সে মানুষ। ভুলে গেছে, সে নিগ্রো।

তিন

পিটার কাবাকুর অনুমান মিথ্যে নয়। সলোমন ভুলে গিয়েছিল সে নিগ্রো। ভেবেছিল, সে মানুষ, সে তরুণ। ভেবেছিল, সে প্রেমিক।

শুধুই কি সলোমন? পিটার কাবাকুও কি কোনদিন ভাবে নি, আমি শুধু নিগ্রো নই, তারও ওপরে আমার যে-সত্তা অহংকারে প্রতিষ্ঠ, সে হচ্ছে মানুষ? আমি সম্মান চাই, যা মানুষের দরবারে মানুষের প্রাপ্য। আমি বন্ধুত্ব চাই, যে-বন্ধুত্ব সমব্যথার পুরস্কার। আমি প্রেম, প্রীতি, স্নেহ চাই, যা মানুষকে দেয় সাম্রাজ্য। যা দিয়ে মুক্তি, পেয়ে গৌরব।

বিবেক সোম যা সহজে পায়, জন মিলার যা অনায়াসে পায়, পিটার কাবাকু আর সলোমন কুচিরো তা পায় না কেন? শুধু এক কারণে। তারা নিগ্রো।

তারা নিগ্রো, শুধু তাদের স্বদেশ আফ্রিকায় নয়, সমস্ত পৃথিবীতে। বহু আগে আরব ব্যবসায়ীরা হঠাৎ তাদের সন্ধান পেয়েছিল, আর তাদের চেহারা দেখে বুঝেছিল, পৃথিবীর কম-কালো বা বেশি-শাদা মানুষদের হীনতম সেবার অধিকার পেয়ে তারা ধন্য হবে। ধরিত্রীর হাটে হাটে তারা বিকিয়েছিল ক্রীতদাস-পণ্যে। শুধু পরদেশে নয়, নিজের দেশেও তারা ক্রীতদাস। অথবা শ্বেতদাস। অন্যদেশে তারা পুরো মানুষ নয়, পুরো নিগ্রো। হ্যাঁ, এই ভারতবর্ষেও। মহাত্মা গান্ধীর ভারতবর্ষেও। পিটার কাবাকু এটা জানে, তার

বিদগ্ধ মন এই কঠিন বাস্তবকে মেনে নিয়েছে। সলোমন কুচিরো সবেমাত্র এই তীব্র বেদনার জ্বালায় জ্বলছে। তাই তার দুঃখ দুঃসহ।

দিল্লীর রাজপথে একদিন জমকালো সোনালি সন্ধ্যায় কুচিরো তাকে প্রথম দেখেছিল। সে-দৃশ্য ভোলবার নয়, অথচ তাকে মনে করাও দুবিসহ বেদনা। পিটার কাবাকু সলোমনকে রাজপথের ক্ষণিক অতিথি করেছিল। তাই সলোমনের দুঃখের সমব্যথী পিটার; তার দুর্ভাগ্যের অংশীদার।

রাজপথ, জনপথ। এক পথে চলে শাসন, অন্য পথে জনসাধারণ। এক পথ ক্ষমতার, অন্য পথ জনতার। এক পথে শক্তি, অন্য পথে ব্যক্তি।

আড়াআড়ি, পাশাপাশি, মিলেমিশে চলে রাজপথ, জনপথ। কখনো বিরোধে, কখনো মিলনে; কখনো সান্নিধ্যে, কখনো ব্যবধানে। জনপথ রাজপথের মহিমার রসদ যোগায়। রাজপথ জনপথকে দেয় ব্যাপ্তি ও বল।

সান্নিধ্যের চেয়ে ব্যবধানটাই বুঝি বড়। রাষ্ট্রপতি-ভবনের বিরাট প্রাসাদের সম্মুখে মহাধিকরণ, সেখানে রাজপথের আত্মা প্রতিষ্ঠিত। তার প্রথম বলিষ্ঠ পদক্ষেপে বিজয়-চৌক কম্পিত। সাজানো সুপরিকল্পিত শহরের শোভন অংশের বিরাট বিরাট উদ্যানবেষ্টিত বাংলো বাড়িগুলোর মধ্যে রাজপথের পথিকপ্রধানরা আশ্রিত। প্রধানদের নিচু স্তরেও যাঁরা মহান্, তাদের জন্যে সেরা পল্লীতে হাল-ফ্যাসানের ফ্ল্যাট। জনপথের চলতি মানুষদের দু-ঘর তিন-ঘরের লাইন-বাঁধা বাড়ি, অথবা বাস্তুহারা পল্লী; পুরোনো শহরের সংখ্যা-পীড়িত, কোলাহল-চকিত কলোনী। রাজপথের পথিকরা চলেন নিজের গাড়িতে; জনপথের পথচারীরা পদচারী; বাহন তাদের সাইকেল, বহুপ্রতীক্ষিত সরকারী বাস আর শিখচালিত ত্রিচক্রযান। দপ্তরে রাজপথ-বিহারীরা বসেন গালিচা-বিছানো বড় বড় ঘরে, যার দেয়ালে সুন্দর ছবি, মেঝেয় দামী আসবাব আর বিরাট প্রশস্ত টেবিলে চকচকে জিনিসপত্রের প্রদর্শনী আভিজাত্য। জনপথ-যাত্রীদের পঁচিশজনের জন্যে ঘর একখানা; টেবিলে অতীতের কালিমা বর্তমানের ঘামের সঙ্গে মিলে বিকশিত কুশ্রী, চেয়ারের হাত ভাঙা কি পা নড়বড়ে, আর টেবিলে, আলমারিতে, মেঝেয় স্তূপীকৃত সেই হলদে, ফ্যাকাশে মোটা কাগজের শাদা-ফিতে-জড়ানো ফাইল, যার মধ্যে গোটা দেশের ভূত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ বন্দী। জনপথ কাজ করে। রাজপথ কাজ করায়।

এই রাজপথে একটি প্রখ্যাত বাড়িতে স্বল্প-দিনের অতিথি হয়েছিল সলোমন কুচিরো। যিনি গৃহস্বামী, তিনি—তাঁর ভাষায়—উদারনীতি ও প্রশস্ত আদর্শের প্রেরণায় চেয়েছিলেন একজন আফ্রিকানকে গৃহে অতিথির সম্মান দিতে। পিটার কাবাকু নির্বাচন করে পাঠিয়েছিল সলোমন কুচিরোকে। সে নতুন এসেছে। এ প্রলেপ তার দরকার।

এক সোনালি সন্ধ্যায় সলোমন ট্যাক্সি করে ঢুকেছিল চওড়া ফাটকের অভ্যন্তরে, লাল-সুরকি রাস্তা পেরিয়ে বাংলো-বাড়ির দুয়ারে।

বেয়ারা এসে তাকে অভ্যর্থনা করেছিল। গৃহস্বামী ছিলেন দপ্তরে। গৃহস্বামিনী তাকে লক্ষ্য করেছিলেন ভেতর থেকে, অলক্ষ্যে।

এমন সময় সে এল। এল সাইকেলে চেপে, ফাটকের মধ্যে দিয়ে, তীব্র বেগে। লাফ দিয়ে নামল সাইকেল থেকে। প্রথমে ট্যাক্সি দেখে উৎসুক হয়ে হঠাৎ দাঁড়াল। তারপর দেখতে পেল, গাড়ির দরজা খুলে নামল একটি নিগ্রো যুবক। ভাড়া চুকিয়ে দিল। স্টার্ট নিতে ককিয়ে কেঁদে উঠল গাড়ি, যেন ধাক্কা দিয়ে কেউ তাকে বের করে নিয়ে গেল। বেয়ারা নেমে এসে সেলাম জানাল। নিগ্রো যুবক হাত বাড়িয়ে দিল বেয়ারার দিকে। বেয়ারা তার সুটকেশ নিয়ে বারান্দায় রাখল। নিগ্রো যুবক একটু অপ্রস্তুত হয়ে দাঁড়িয়ে ভাবল, এগোবে, না আরও অপেক্ষা করবে।

তখন নিজেকে সে এগিয়ে নিয়ে এল। একেবারে আগন্তুকের সামনে। সলোমন কুচিরো তাকে চিনল। প্রথম যেন দেখল না, তার পরেই ভয়ংকরভাবে দেখল—চোখ দিয়ে, মন দিয়ে, চেতনা ও সত্তা দিয়ে। অবাক্ হয়ে, বিহ্বল হয়ে, অস্থির হয়ে, তাকে দেখল।

টেনিস সর্ট তার পরনে। হাঁটুর অনেকখানি উঁচু থেকে পা পর্যন্ত অনাবৃত। নির্লোম, কুমারী পা, ব্যায়ামে সুগঠিত। শাদা সর্টের ওপর শক্ত-আঁট শাদা ব্লাউজ। গায়ে লেপ্টে বসেছে কোন্ ঐশ্বর্যের লোভে। বড় বড় নিঃশ্বাসের সঙ্গে দুটি কুমারী-বুক সগৌরবে প্রচার করছে নিজেদের অস্তিত্ব। কাঁধের পাশ থেকে উন্মুক্ত বাহু সুগোল, সুন্দর। এক হাতে টেনিস র‍্যাকেট। লালচে চুলগুলি শক্ত করে বাঁধা, তবু কপালে বেশ কিছু চূর্ণ চুলের দৌরাত্ম্য। মুখখানা পরিশ্রমে রঙিন। গলায়, কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম। চোখ দুটো ঘন কালো, অসম্ভব শাদা তাদের আঙিনা।

কাছে এসে সেই শাদাকালো আর বড় বড় চোখ তুলে সে সলোমনকে

দেখল। নাদুস-নুদুস চেহারা; মিশকালো রং, চুল মজার মাপে কোঁকড়ানো, আর কপালটা কি অসম্ভব চওড়া! দাঁতগুলো হাঁসের পালকের মতো শাদা, ঠোঁট দুটো কি ভীষণ মোটা, আর চোখ দুটো কি দারুণ হলদে! নিগ্রো? অসভ্য, অন্ধকারবাসী জীব? ভীষণ হিংস্র? তবে কেন ছেলেটার নাদুস-নুদুস চেহারায় এমন অসহায় ভাব?

আমি সলোমন কুচিরো।

মৃদু স্বরে, সামান্য হাসি টেনে, আত্মপরিচয় দিল আগন্তুক।

আমি শীলা শর্মা।

একেবারে না হেসে, নিজের পরিচয় জানাল সে।

আমার এখানে—

নিমন্ত্রণ। আপনি আমাদের অতিথি। আসুন।

এমন সময় ঝড়ের মতো আবির্ভূত হলেন গৃহস্বামিনী। মেয়ে নিগ্রো ছোকরার চোখে পড়ুক, তিনি আদৌ চান নি। অথচ এ-ভয় তাঁর ছিল সবচেয়ে বেশি। স্বামী গিয়ে একে নিয়ে আসবেন, এই ছিল ব্যবস্থা। হঠাৎ টেলিফোন এল, আমি আটকে গেছি। ছেলেটি নিজেই আসবে। তুমি ওকে রিসিভ ক'রো।

এমনি কাণ্ড হয়েছে আজকাল শুকদেবের। রিসিভ ক'রো বললেই হল! কেমন লোক, কী-রকম হাবভাব, এসব আগে থেকে না দেখে কি রিসিভ করা যায় সব লোককে? তাই সুলোচনা শর্মা আড়াল থেকে একটু দেখে নিচ্ছিলেন ছেলেটাকে। এরই মধ্যে যা তিনি একেবারে চান নি, তাই ঘটে গেল। চান নি শীলা কোনক্রমে নিগ্রো ছেলেটার সামনে আসুক, আর সে-ই কিনা রিসিভ করল! কী ভয়ংকর না ছোকরা দেখছিল শীলাকে! তাই সুলোচনা আর ভেতরে থাকতে পারলেন না। ছুটে বাইরে এসে সলোমনের সামনে দাঁড়ালেন।

আমি মিসেস শর্মা।

সলোমন দুহাত একত্র করে বলল, নমস্তে।

মাপ করবেন, আমার দেরি হয়ে গেল।

তাতে কী হয়েছে? আমার তো কোন অসুবিধে হয় নি।

সুলোচনা তাকিয়ে দেখলেন, শীলা তখনো নিরীক্ষণ করছে নতুন অতিথিকে। মুখে-চোখে তার কেমন প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপের হাসি। সুলোচনা কড়া চোখের ইসারায় তাকে প্রস্থান করবার আদেশ দিলেন।

আপনি আসুন। আমার স্বামীও আসছেন।

বারান্দায় উঠে দাঁড়াতে সুলোচনা বেয়ারাকে হাঁক দিলেন। বললেন, এঁকে এঁর ঘর দেখিয়ে দে। সলোমনকে বললেন, আপনি সুস্থ হয়ে নিন। আমার স্বামী এখুনি এসে যাবেন।

যেন অত্যন্ত অসহায় মনে হল সুলোচনার নিজেকে। তাই বার বার স্বামীর নাম করতে লাগলেন।

রাজপথের এই প্রখ্যাত শিবিরে সলোমন কুচিরোর আগমন স্মরণীয় ঘটনা। কিন্তু এর পেছনে স্মরণীয়তর ইতিহাস। রাজপথের টুকরো কাহিনী। সলোমন কুচিরো সে-কাহিনী বা ইতিহাসের অংশ; পিটার কাবাকুও তার থেকে বিচ্ছিন্ন নয়।

সকালবেলা ব্রেকফাস্ট টেবিলে বসে শুকদেব বেশ একটু অস্বস্তি বোধ করছিলেন। কোলের ওপর প্রভাতী পত্রিকা মধ্যপথে অপঠিত পড়ে আছে। টেবিলে খানসামা প্রাতঃকালীন আহার্য পরিবেশন করে গেছে। মিসেস শর্মা দুধ-শাদা রুটিতে সযত্নে ননী লাগাচ্ছেন। ডানদিকে শুকদেব-তনয়া শীলা আধ-সেদ্ধ ডিমে মোলায়েম, আলতো কামড় বসিয়েছে; পাতলা রক্তাভ ঠোঁট এখনো ডিমের স্পর্শ পায় নি। তার পাশে বসে আছে শীলার ছোট ভাই রমেশ, নজর তার বাবার কোলে, কাগজের দিকে। আজ ম্যাটিনি শোতে কী কী সিনেমা আছে এখনো দেখা হয় নি। বড় আকারের একটা কলা চিবোতে চিবোতে সে বলে উঠল, ডাডি, তোমার কাগজ পড়া হয়েছে? মে আই হ্যাভ্ ইট্?

চমকে উঠলেন অন্যমনস্ক শুকদেব শর্মা। কথার অপচয় না করে এগিয়ে দিলেন কাগজখানা ছেলের দিকে। একবার তাকালেন মণিবন্ধের ঘড়িতে, পরক্ষণে স্ত্রীর দিকে অপাঙ্গে। আটটা সাতাশ। এবার উঠতে হবে দাড়ি কামিয়ে স্নান করতে। কিন্তু তার আগে কথাটা বলা চাই। বলতে খুব ভরসা পাচ্ছেন না শুকদেব শর্মা। কিন্তু বলতে হবে।

তাকিয়ে দেখলেন পত্নী সুলোচনা ব্রেকফাস্ট প্রায় শেষ করে এনেছেন। একপাত্র পড়িজের পর দু'খানা মাখন-মাখানো রুটি, একটি ডিম সমাপ্ত করে তিনি পেয়ালায় চা ঢালবার উদ্যোগ করছেন। রূপোর কেস থেকে সিগারেট বের করে ধরালেন শুকদেব। ধোঁয়া ছাড়লেন

চিন্তার সঙ্গে মিলিয়ে। তারপর, সাহসী লোক তিনি, কাজে লেগে গেলেন।

আজ কত তারিখ মনে আছে?

বললেন স্ত্রীকে সম্বোধন করে।

আঠারোই।

তারিখটার তাৎপর্য বুঝতে পারছ?

সুলোচনা মুখ তুলে তাকালেন।

সেই নিগ্রো ছেলেটা আজ আসছে, এই তো?

হ্যাঁ। আমি যদি পাঁচটা নাগাদ দপ্তর ছাড়তে পারি তো নিজেই গিয়ে ওকে নিয়ে আসবো।

আর যদি না পারো?

তাহলে সে নিজে চলে আসবে। তুমি রিসিভ ক'রো।

কী সর্ব্বনাশ! আঁতকে উঠলেন সুলোচনা।

আমি একা ওকে রিসিভ করবো!

তাতে কী হয়েছে, সুলোচনা। তুমিই তো প্রত্যেক বছর বিদেশী অতিথিদের আপ্যায়ন করে থাকো। এজন্যে তোমার কত সুনাম।

কিন্তু—

জানি তোমার কিন্তু কোথায়। আমি সবরকম খবর নিয়ে শুনেছি ছেলেটি ভালো।

ক্যানিব্যাল নয় তো ডাডি?

ব্যঙ্গময় স্বরে প্রশ্ন করল শীলা।

আরে না, না। দস্তুরমতো শিক্ষিত ছোকরা। এখানে বি. এ. পড়তে এসেছে।

হিজ্ হ্যাবিটস্ মাষ্ট্ বি অফুল্। মন্তব্য করলেন সুলোচনা।

আই উড নট থিংক সো। আশ্বাস দিলেন শুকদেব: আর তা হবেই বা কেন। ওরাও সভ্য হয়ে উঠেছে।

কী যেন নামটা বললে ডাডি? জানতে চাইল রমেশ।

সলোমন কুচিরো।

কিচিরমিচির কথা বলে, ডাডি? হেসে গড়িয়ে গড়িয়ে প্রশ্ন করল রমেশ।

দস্তুরমতো ইংরেজি বলে। শোধরালেন শুকদেব : ভুলে যেয়ো না সেন্ট্রাল ও ইষ্ট আফ্রিকা ইংরেজের শাসনে।

তোমার মনে আছে, মা, লংফেলো সাহেব ওদের কথা যা-সব বলে গেছেন? মার দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করল রমেশ।

লংফেলো নামটা উঠতে সুলোচনা সামান্য রক্তিম হলেন।

ওসব তো ইংরেজের কথা। মন্তব্য করল শীলা।

তার মানে? তুমি কি বলতে চাও মিঃ লংফেলো বাজে কথা বলে গেছেন?

হি ইজ্ এ প্রেজুডিসড ম্যান। শীলা জবাব দিল।

ভাই-বোনে তর্ক সুলোচনা বন্ধ করে দিলেন। বললেন, লংফেলো যা বলে গেছেন তার সব হয়তো সত্যি নয়। কিন্তু অনেকখানি যে সত্যি সে-বিষয়ে আমার সন্দেহ নেই।

ইয়েস্, পার্টলি হি মে বি রাইট। সিগারেট-মুখে অভিমত জানালেন শুকদেব।

সুলোচনা বললেন, তোমাকে একটা কথা বলি, শীলা। তুমি এই নিগ্রো ছেলেটির কাছে যাবে না।

কেন, মামি?

কেন তাতে তোমার প্রয়োজন নেই। আমরা ওদের একেবারে জানি নে। উই হ্যাভ্ টু বি কেয়ারফুল।

তোমার মা ঠিক বলছেন, শীলা। শুকদেব সায় দিলেন : এটাই নিয়ম। তোমাদের একটা গল্প বলি, শোনো। পড়তে গেছি বিলেতে। লণ্ডনে বাসা নিয়েছি একটি মধ্যবিত্ত পরিবারের সঙ্গে। ল্যাণ্ড-লেডী বিধবা। কেম্ব্রিজে যাবার আগে লণ্ডনে আমার কয়েক সপ্তাহের বাস। পরে শুনেছিলাম, অনেক ইতস্তত করে নেহাত পয়সার জন্যে ঐ পরিবারে আমাকে গ্রহণ করা হয়েছিল। চার সপ্তাহ আমি ছিলাম সেখানে। সবার সঙ্গে দেখা হত, কথাবার্তা হত, গল্প হত। কিন্তু অ্যানা বলে তরুণী মেয়েটিকে আমি কখনো দেখতে পেতাম না। জানতাম সে বাড়িতেই আছে, কিন্তু তাকে কখনো আমার সামনে আসতে দেওয়া হত না। আমিও তার অস্তিত্ব একেবারে উপেক্ষা করে চলতাম। দেখা হল শুধু বিদায় নেবার দিন। সবার সঙ্গে সেও আমায় বিদায় জানাল। তাই বলছি, এটাই নিয়ম।

তুমি ঠিক বলেছ, বাবা। একটি ইংরেজ পরিবার যদি তোমার সঙ্গে অমন ব্যবহার করে থাকে, উই মাষ্ট ডু দ সেম টু অ্যান আফ্রিকান।

শীলা উঠে চলে গেল।

শুকদেব গম্ভীর হলেন। সুলোচনা রক্তিম।

একটি আফ্রিকান ছেলেকে নিজগৃহে অতিথির মর্যাদা দেবার পেছনে আরেকটি কাহিনী আছে।

শুকদেব শর্মা আই. সি. এস. ভারত সরকারের দৃঢ় স্তম্ভ। যাঁদের নিয়ে দিল্লীর রাজপথ, তাঁদের মধ্যেও তাঁর স্থান উচ্চে। সকাল সাড়ে ন'টা থেকে রাত্রি দশটা পর্যন্ত তিনি যে ক্লান্তিহীন, বিশ্রামহীন শ্রম করেন—তিনি এবং তাঁরা—তারই জোরে ভারতের এই বিশ্ববন্দিত, বিস্ময়কর অগ্রগতি। একথা জানে সবাই। সবচেয়ে বেশি জানেন তিনি এবং তাঁরা।

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা শুকদেবের সাধনার বা সংগ্রামের ফল নয়। কিন্তু স্বাধীন ভারত তাঁর পরিশ্রমের, ঐকান্তিক আদর্শনিষ্ঠার ফল বইকি? তাই স্বাধীন ভারতের রাজধানীতে শুকদেব শর্মা মানী মানুষ। সরকারী ও বেসরকারী দুই মহলে তাঁর সম্মান প্রসারিত। তিনি দ্বন্দ্বকুটিল পৃথিবীতে ভারতের মহিমা সম্বন্ধে সদা-সচেতন। তাই রাজধানীর বিদেশীদের সঙ্গে তাঁর বিশেষ সৌহৃদ্য। আমেরিকান, রুশ, চীন, আরব, ইংরেজ সবাই তাঁর মিত্র। বিদেশ-নীতিতে যেমন ভারতের, বিদেশী-নীতিতে যেমন শুকদেবের, কোন শত্রু নেই।

অভিজাত, সীমিত সমাজে শুকদেব মেলামেশা করেন। বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে কথাটা তিনিই প্রথম তুলেছিলেন। ভারতবর্ষ নানা দিক থেকে বিশেষ দেশ। পৃথিবীর মানুষকে সে আকৃষ্ট করে। এককালের শক-হুনদল-পাঠান-মোগলের মতো আজও পৃথিবীর নানা প্রান্ত থেকে ভারতবর্ষে মানুষ আসে। আসে সাহায্য করতে, দেখতে, জানতে, শেখাতে, শিখতে। অথচ ভারতীয় সমাজের কতটুকু বা এরা জানতে পায়। থাকে বড় হোটেলে, কিন্তু তবু সে তো হোটেলই!

দু'পাতা সরকারী বই-এর পাতা কণ্ঠে মুখস্থ করে রাতারাতি যারা গাইড হয়ে যায় তাদের তত্ত্বাবধানে বিদেশী পর্যটকদের ভারত-দর্শন। অথচ এই সংগঠনের সময় ভারতের প্রয়োজন বিদেশীরা তাকে সত্যিকার জানুক, বুঝুক।

তাই শুকদেব শর্মা প্রস্তাব করেছিলেন, দিল্লীর শীর্ষসমাজে প্রত্যেক বছর পঞ্চাশটি বিদেশীকে যদি পঞ্চাশটি পরিবারে দুই সপ্তাহের জন্যে আতিথ্য দেওয়া যায়, তাহলে দেশের জন্য বড়রকমের কাজ হতে পারে।

আইডিয়াটা উর্বর ভূমিতে পড়ে অংকুরিত হয়ে উঠল। মাসখানেকের মধ্যে আই. সি. এস. অ্যাসোসিয়েসনে শুকদেব শর্মা প্রস্তাব যথাযথ উত্থাপন করলেন। সঙ্গে সঙ্গে সোৎসাহে গৃহীত হল। শোনা গিয়েছিল প্রধান মন্ত্রী স্বয়ং প্রস্তাব শুনে খুশী হয়েছিলেন।

প্রথম বছর দেখা গেল দশটি পরিবার বিদেশী অতিথি রাখতে রাজী হয়েছেন। টুরিস্টব্যুরো থেকে লিষ্ট চেয়ে পাঠানো হল। প্রস্তাবের জনক হিসেবে শুকদেব শর্মা প্রথম অতিথি নির্বাচনের সম্মান পেলেন। যাঁকে তিনি বেছে নিলেন সে ইংরেজ। নাম আরনেস্ট লংফেলো।

সম্ভব হলে একজন ইংরেজ বাছবেন, এটা শুকদেব সুলোচনার মত নিয়ে আগে থেকে ঠিক করেছিলেন। হাজার হলেও ইংরেজ ইংরেজ; পৃথিবীর সেরা জাত; সেরা মানুষ। তার সঙ্গে ভারতের মাথায় মিল, মনের মিলও অনেকখানি। তোমার বাড়িতে ইংরেজ অতিথি, অমনি সমাজে তোমার দাম গেল বেড়ে। একজন ইংরেজ এসে তারিফ করুক স্বাধীন ভারত কত সুসভ্য! এ যেন বিজয়ের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার। সুলোচনার জীবনে একমাত্র খেদ তিনি য়ুরোপে যান নি। আজ যদি একজন ইংরেজ এসে তাঁর আতিথ্যে মুগ্ধ হয়, সে খেদ খানিকটা কমবে; সমাজের মহিলারাও জানবেন, বিলেত না গিয়েও সুলোচনা ইংরেজ অতিথির আপ্যায়ন করতে পারে।

লোকটিও জুটলো পছন্দসই। বেশ নাম। আরনেস্ট লংফেলো। সুলোচনা ভাবলেন, হয়তো কবি লংফেলোর বংশধর। শানদার লোক, নামের পেছনে সি. আই. ই. খেতাব রয়েছে। আসছেন পূর্ব-আফ্রিকা থেকে ভারত-ভ্রমণে। ভারতকে জানতে, বুঝতে। জানাবার, বোঝাবার ভার প্রধানত সুলোচনার। ভাবতেও আনন্দ।

বিমানবন্দরে অভ্যর্থনা করতে গেলেন শুকদেব নিজে। সুন্দর চেহারা। ছ' ফুট দীর্ঘ দেহ। একটুও মাংসল নয়। রংটা অতিরিক্ত লাল নয়। দাঁতগুলো কালো নয়। মজবুত মানুষ। নীল চোখ, গাল ভাঙা, কপালে কতিপয় কুঞ্চন, সোজা টিকোলো নাক, শক্ত ছোট্ট চিবুক। চুলে পাক ধরেছে, দেহে নয়। প্রায়-পঞ্চাশ শরীরে চল্লিশের মধ্যাহ্ন। একজন উচ্চপদস্থ ভারতীয়

রাজপুরুষের গৃহে তার থাকবার ব্যবস্থা হয়েছে, আগে থেকে তা সে জেনে এসেছিল। শুকদেবের পরিচয় পেয়ে সে প্রসন্ন হল।

গাড়িতে আলাপ হল, কথাবার্তায় পরিচয়-বিনিময়।

ত্রিশ-বত্রিশ বছর আগে আরনেস্ট লংফেলো ওয়েল্‌স্‌-এর এক ছোট শহর থেকে পালিয়ে চলে গিয়েছিল দক্ষিণ-আফ্রিকায়। সোনার খনিতে কুলি-চালাবার কাজে তার কর্মজীবনের আরম্ভ। তখন থেকে মিশকালো প্রায়-উলঙ্গ নিগ্রো মানুষদের পিঠে চাবুক মেরে নিজের জীবনের বলিষ্ঠ বনিয়াদ সে গড়ে তুলেছে। নিজের পুঁজি কিছু জমতে, দক্ষিণ-আফ্রিকা ছেড়ে সে চলে আসে রোডেসিয়ায়—সিসিল রোড্‌সের দেশে। 'আফ্রিকায় এসে স্বপ্নকে বৃহৎ করবে', বলে গেছেন সিসিল রোড্‌স্‌ঃ 'হোয়েন ইন আফ্রিকা, থিংক বিগ'।

এই বৃহৎ স্বপ্নের অস্ত্র নিয়ে শিশুমন এক নিগ্রো রাজার কাছ থেকে রোড্‌স্‌ একদিন এই বিরাট অঞ্চল ছলে-বলে-কৌশলে বাগিয়ে নিতে পেরে-ছিলেন। পঁচাত্তর হাজার মাইল খনিজ-সম্পদ-পূর্ণ জমির বিনিময়ে মাসে একশো পাউণ্ড আর এক থোকে এক হাজার রাইফেল। বাণিজ্য-ইতিহাসে সে এক অবিস্মরণীয় কীর্তি। আর উত্তর রোডেসিয়া? ওখানকার উপজাতিরা তো রোড্‌সের প্রতাপে বিমুগ্ধ হয়ে নিজেরাই মহারাণী ভিক্টোরিয়ার সংরক্ষণ ভিক্ষা করেছিল! নায়াসাল্যাণ্ড—যাকে রোড্‌সের অনুচর স্যার হ্যারি জনস্টন মাত্র হাজার পাউণ্ডে বৃটিশ পতাকার নিচে আনতে পেরেছিলেন। কী মহান দিনই না ছিল সেই উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগের বছরগুলো! রোডেসিয়ায় সিসিল রোড্‌স্‌ এখনো দেবতাঃ শাদা মানুষরা কথাবার্তায় তাঁর নাম উঠলে বলে, মিঃ রোড্‌স্‌। প্রত্যেক মানী মানুষের গৃহে তাঁর ছবি; প্রত্যেক বড় দোকানে।

রোডেসিয়ায় লংফেলো অনেকখানি উর্বর জমি কিনল, হল কয়লাখনির অংশীদার এবং ক্রমে কপারবেল্টের ক্ষুদে মালিক। আজীবন কঠোর পরিশ্রমে নিজের ভাগ্য সে নিজের হাতে গড়ে নিয়েছে। উনিশশো তিপ্পান্ন সালে দুই রোডেসিয়া ও নায়াসাল্যাণ্ড নিয়ে যখন ফেডারেশন হল আরনেস্ট লংফেলো তার সপক্ষে ছিল। শ্বেতাঙ্গ আফ্রিকায় সে উদার, নিগ্রোরা যে একদিন মানুষ হবে, এ-সত্য স্বীকারে তার আপত্তি নেই। তবে সে আজকে নয়, সে আজকে নয়। সে-দিন আসবে, যে-দিনের জন্যে তার মতো অনেকে অক্লান্ত কাজ করে যাচ্ছে। গহন অন্ধকার থেকে তারা নিগ্রোদের ধীরে ধীরে আলোয় আনবার

চেষ্টা করছে। এক পা এক পা করে নিগ্রোরা এগিয়ে আসবে তাদের বিকাশের পথে, কিন্তু শ্বেতাঙ্গ শুভানুধ্যায়ীদের হাত ধরে। আরনেস্ট লংফেলো এতদিন রাজনীতির প্রত্যক্ষ পরিবেশ থেকে দূরে থেকেছে। এবার তার সেক্ষেত্রে প্রবেশের ইচ্ছা। ভারত-ভ্রমণ সে-ইচ্ছার আংশিক প্রকাশ।

পূর্ব-আফ্রিকায় ভারতীয় সমাজের সঙ্গে আরনেস্ট লংফেলোর পরিচয় আছে। ওরা ব্যবসা করে। লেখাপড়া শিখে হয় আইনজীবী আর শিক্ষক। আর হয় কুশলী কারিগর। শ্বেতাঙ্গসমাজ থেকে ব্যবধান ওরা মেনে নিয়েছে, আর নিজেদের দূরে সরিয়ে রেখেছে নিগ্রোসমাজ থেকে। ঘরেও নয়, পারেও নয়, ওরা মাঝখানে। ভারত স্বাধীন হওয়ার আগে ওরা সাহেবদের একান্ত অনুগত ছিল। এখন তাদের নিগ্রোপ্রীতি বেড়েছে, কিন্তু ত্বক-গভীরতার সীমা ছাড়ায় নি। সিনেমা হলে সাহেবদের সঙ্গে এক জায়গায় ওরা বসতে পায় না; নিগ্রোদের সঙ্গে একত্র বসতে চায় না। অর্থাৎ গায়ের চামড়া ও শিক্ষার কিছু সম্মান ওরা জানে। তাই আরনেস্ট লংফেলো ওদের প্রতি অপ্রীত নয়। কিন্তু হালে নিগ্রোদের মধ্যে কেমন যেন ঝড়ের হাওয়া বইতে শুরু করেছে। কিনিয়ায় কী বিভীষিকা না চলছে, শোনা যাচ্ছে কয়েক বছরের মধ্যে নাকি গোল্ড কোস্ট স্বাধীন হবে। স্বাধীন হবে সুদান, নাইজিরিয়া, টাঙ্গাইনাইকা। লণ্ডনে ক্ষমতায় আসীন এক নির্বুদ্ধি লেবার গভর্নমেণ্ট। তারা এত বছরের গোছানো সাম্রাজ্য ছন্নছাড়া করে দিচ্ছে। এশিয়া গেছে। এবার আফ্রিকা যাবে, যদি না তার শ্বেতাঙ্গ বাসিন্দারা তাকে ধরে রাখতে পারে।

কয়েক বছর ধরে আরনেস্ট লংফেলো লক্ষ্য করে এসেছে যে নিগ্রোদের কাছে ভারতবর্ষের আবেদন হঠাৎ ভয়ানক বেড়ে গেছে। আফ্রিকায় যেসব ভারতীয় বাস করে, তাদের উপেক্ষা করে, নিগ্রোরা ভারতের ওপর দৃষ্টি হেনেছে। কিসের সন্ধানে? যে-শক্তিতে ভারত বিনা রক্তপাতে বৃটিশ শাসনের অবসান ঘটাতে পেরেছে, সেই শক্তির সন্ধানে। আরনেস্ট লংফেলো দেখে এসেছে গান্ধী-সাহিত্যের চাহিদা নিগ্রোসমাজে বেশ বেড়ে চলেছে। নেহেরুর বচন নিগ্রোদের কান দিয়ে মর্মে প্রবেশ করে। অথচ ভারতীয় নেতারা কতটুকু আফ্রিকার সত্যিকার পরিচয় রাখেন? যে-আগুনে তাঁরা ইন্ধন যোগাচ্ছেন, তার দাহিকাশক্তি একদিন একটা মহাদেশকে জ্বালিয়ে দিতে পারে, এ কি তাঁরা জানেন?

তাই আরনেস্ট লংফেলো ভারত-সন্ধানী। এদেশটাকে জানা চাই।

প্রত্যক্ষ দৃষ্টিতে দেখে নিতে হবে এরা কী ভাবছে, কোথায় এদের শক্তি, কোথায় এদের দুর্বলতা, কোন্ পথে এদের গতি, কোন্ লক্ষ্যে এরা পৌছতে চায়। আর, যেহেতু আরনেস্ট লংফেলো ব্যবসায়ী, প্রসঙ্গত অনুসন্ধান করে দেখবে ভারতীয় বাজারে প্রতিষ্ঠার সুযোগ কতখানি।

শুকদেব-পরিচয়ে লংফেলো তৃপ্ত হল। কেম্ব্রিজের মানুষ, তাই ইংরেজি উচ্চারণ, ভাষাব্যবহার এত অভিজাত। নিজে সে কোনদিন কলেজে পড়ে নি, কিন্তু আপন চেষ্টায় বিদ্যাশিক্ষার ত্রুটি করে নি কখনো। কিন্তু তার উচ্চারণে এখনো অনভিজাত উৎপত্তির পরিষ্কার ঘোষণা। অবশ্যি, স্বোপার্জিত কোটি-পতি আরনেস্ট লংফেলো বড় একটা অক্সফোর্ড কেম্ব্রিজের খাতির করে না: অশ্বেতকায় হলে তো নয়ই। তবে, এ-মানুষটা অধ্যাপক কিংবা দার্শনিক কিংবা লেখক বা সম্পাদক নয়, এই যা ভরসা। এ হচ্ছে একজন পাকা শাসক—অ্যাড্মিনিষ্ট্রেটর। নভোচারী নয়, বন্ধুর-পথচারী। এ দেশ চালায়, তাই বাস্তববুদ্ধি আছে। সামান্য আলাপে এ পরিষ্কার বলল, ভারত সরকারের অর্থনীতি বড্ড আদর্শবাদী, নীতি-ঘেঁষা; বাস্তব জীবনে তার বৃহৎ পরিশোধন অবশ্যম্ভাবী।

আমরা নিজেদের ঘর ঠিক করার আগেই, সারা দুনিয়াকে উপদেশ দিতে শুরু করেছি—এটাও ক্রমে কমে আসবে।

কথাগুলো শুনে আরনেস্ট লংফেলো খুশী হল। তাহলে এরা বোঝে। অত আতংকের কারণ নেই। তাহলে এরা কৃষ্ণ-মহাদেশের কালো-মানুষদের খেপিয়ে তুলবে না।

ভারত-পরিচয়ের অয়মারম্ভে ইংরেজ আগন্তুক আরনেস্ট লংফেলো আশ্বস্ত হল।

ক্রমে ক্রমে ভারত-দর্শনে আরনেস্ট লংফেলোর সন্তোষ বেড়ে চলল। আহা, কী পরিতৃপ্তি! আমরা ছেড়ে চলে গিয়েছি বটে, কিন্তু এরা আমাদের ছাড়ে নি। কত কষ্টে, কত পরিশ্রমে আমরা এদের মানুষ করে দিয়ে গেছি। দেখলেও কেমন আনন্দ হয়। এই যে মিঃ শর্মা, একেবারে খাঁটি বিলিতি সিভিল সারভেণ্ট। যেমন মনপ্রাণ দিয়ে ইংরেজ-সরকারের সেবা করেছেন, তেমনি সেবা করছেন স্বাধীন ভারত সরকারের। এই তো সিভিল সারভেণ্টের ধর্ম। সরকার যায় আসে, বাট উই গো অন ফর এভার। আর হলই বা স্বাধীন, কিন্তু কোন্ রাগদ্বেষ নেই এদের মনে। আমাদের মতোই এদের পার্লামেণ্ট

আছে, কেবিনেট গভর্নমেন্ট আছে। হোক না প্রজাতন্ত্র, তবু বৃটিশের রাজ-মুকুটকে গ্রহণ করেছে সম্ভ্রমে শ্রদ্ধায়। কেমন সুন্দর ইংরেজি বলে এরা, ইংরেজকেও হার মানায়! আর, ইংরেজিই তো এদের আসল ভাষা! এই ভাষাই এদের দেশটাকে এক রেখেছে, ভারতীয় নামে জাতি-পরিচয়কে সম্ভব করেছে। কেমন সুন্দর রাস্তার নামগুলো—কিংস্‌ওয়ে, কুইনস্‌ওয়ে, হেষ্টিংস্ রোড, ডালহৌসী রোড; রাস্তায় বেরোলেই ইংরেজ শাসকদের প্রস্তরমূর্তি চোখে পড়ে—হ্যাঁ, একটু নোংরা হয়ে থাকে ওগুলো, কিন্তু লর্ড হার্ডিঞ্জ এখনো স্বাধীন ভারতের রাজধানীর বুকে সাম্রাজ্য-গর্বিত চোখে বীরের মতো দাঁড়িয়ে আছেন। নিগ্রোগুলোর চোখে-মুখে শাদা মানুষের প্রতি প্রচ্ছন্ন ঘৃণা : এরা কেমন শাদা মানুষ দেখলেই খুশী। ইংরেজের উপযুক্ত মর্যাদা এখনো আছে এই দেশটায়, হোক না সে স্বাধীন!

লংফেলো সুলোচনা-দর্শনে মুগ্ধ। গৃহস্বামীর সঙ্গে দেখাশোনা তার পরিমিত, তিনি কর্মব্যস্ত 'রাজপুরুষ'। কিন্তু সুলোচনার নজর সর্বদা তার ওপর। যেমন চেহারাটি সুন্দর—এমনতর মোলায়েম নরম সৌন্দর্য বহুদিন তার চোখে পড়ে নি—তেমনি সর্ববিষয়ে সুলোচনা পারদর্শিনী। গাড়ি চালিয়ে শহরের সবকিছু প্রাচীন স্মৃতিসৌধ সুলোচনা তাকে দেখিয়েছেন। লংফেলো এই মহিলার বুদ্ধি, জ্ঞান, বিদ্যা, সরল সপ্রতিভতা দেখে কেবলই মুগ্ধ হয়েছে। কী সুন্দর ইংরেজি বলেন সুলোচনা! বয়স হয়তো চল্লিশের বেশিই হবে, কিন্তু দেখে মনে হয় যৌবন শাড়ির আড়ালে এখনও লোভনীয় ভাণ্ডার সাজিয়ে রেখেছে।

শুকদেব শর্মা আরনেস্ট লংফেলোকে বোঝাতে ত্রুটি রাখেন নি স্বাধীন ভারত কী, কোন্ পথে তার গতি, কী তার নির্বাচিত আদর্শ। লংফেলোর মনে বড় একঘেয়ে লেগেছে শুকদেবের দীর্ঘ বক্তৃতা, সকালে চায়ের টেবিলে বা রাতে ডিনার খেতে খেতে। মাঝে মাঝে যেন ঘুমও পেয়ে গেছে দু'-একবার। কিন্তু মোটামুটি সে সব শুনেছে, বুঝেছে কম, এসব বোঝবার দরকার হয় না।

যীশুকে ধন্যবাদ, সুলোচনা রাজনীতি আলোচনা করেন না। তাঁর কাছে লংফেলোর প্রকৃত ভারত-পরিচয় হয়েছে। সুলোচনাই তাকে বুঝিয়েছেন যা তার বোঝবার দরকার ছিল।

যেমন, কংগ্রেসী নেতারা যা-ই বলুন, আসলে রাজ্য চালনা করছেন শুকদেব

শর্মারা! তাঁদের ছাড়া মন্ত্রীরা চোখে অন্ধকার দেখেন, নয়তো সর্ষেফুল। এ-দেশটার পুরোপুরি সভ্য হতে আরও পঞ্চাশ বছর লাগবে, এখন যা-কিছু সভ্যতা তা শহর-জীবনে সীমাবদ্ধ।

যেমন, পুরুষ যা-ই বলুন, এ-দেশের আসল সমস্যা জনসংখ্যা। যতদিন প্রত্যেক স্ত্রীলোক জন্ম-নিয়ন্ত্রণ না প্রবর্তন করবে ততদিন এ-সমস্যার সমাধান নেই।

যেমন, ভারতবর্ষের গ্রামগুলো দেখলে এখনো লংফেলো মিস্ কাথ্রিন মেয়োর মাদার ইণ্ডিয়ার সন্ধান পাবে।

আরও যেমন, পাকিস্তান না হলে মুসলমানরাই আবার ভারতের কর্তা হয়ে বসতেন, এবং তাদের সাহায্য করতে এগিয়ে আসত সব প্রতিবেশী মুসলমান দেশ।

শুকদেব শর্মার সব কথা আরনেস্ট লংফেলোর মনঃপূত হয় নি। কিন্তু যে-শিশু মাত্র পায়ে-হাঁটার স্বাদ পেয়েছে সে তো চাইবেই দৌড়ে দরজার বাইরে চলে যেতে! আমরা অনেক শতাব্দী দুনিয়াদারি করেছি, তোমাদেরই নেড়ে-চেড়ে দেখেছি কয়েকশো বছর, আমরা সব জানি, সব বুঝি। শুকদেব শর্মা বলেছেন ভারত সবার মিত্র, কারো শত্রু নয়; আর লংফেলো বুঝেছে, এটা তোমাদের শূন্য দম্ভ, কেননা তোমাদের মিত্রতা-শত্রুতায় কারো বড় একটা এসে যায় না। শুকদেব শর্মা বলেছেন, আমরা শান্তিপূর্ণ সহযোগিতার পথে সমাজতন্ত্র গড়তে চাই, আরনেস্ট লংফেলো মনে মনে মন্তব্য করছে, 'গড়ো, আমরা দেখব'। শুকদেব শর্মা বলেছেন, এশিয়ার জাগরণ এ-শতাব্দীর সবচেয়ে বড় ঘটনা। লংফেলোর চোখে কোন আতংক আসে নি। নতুন-জাগা মানুষে তার নিদ্রাভঙ্গে এতই আশ্চর্য হয় যে, সে ভাবে নিখিল বিশ্ব বুঝি বিস্মিত চোখে তাকেই দেখছে।

আফ্রিকা নিয়ে শুকদেব শর্মার সঙ্গে মাঝে মাঝে খোলাখুলি মতবিরোধ হয়েছে আরনেস্ট লংফেলোর। ওটা তার স্বক্ষেত্র, ওখানে কোন ননসেন্স তার অসহ্য। তুমি বলছ, আফ্রিকা জেগেছে। তার মানে বোঝো? তার মানে, আমরা মরেছি। কারণ, যদি কোনদিন ঐ অন্ধকার মহাদেশটা স্বাধীন হয়, তার লোকগুলো সহজে আমাদের রেহাই দেবে না। তাই আফ্রিকাকে নিয়ে সস্তা আদর্শবাদের বড়াই তার অসহ্য।

ডিনার টেবিলে বসে একথা এক রাতে শুকদেব শর্মাকে সে বুঝিয়ে দিয়েছিল।

আপনারা আফ্রিকার কিছুই জানেন না। নিবেদন করেছিল আরনেস্ট লংফেলো: আমরা জানি। ওদেশটাকে আমরাই মেলে ধরেছি পৃথিবীর কাছে।

সেকথা মানতে আমার আপত্তি নেই। কিন্তু এখন তো ওরা জেগেছে।

আপনি জাগা বলেন একে? আমরা ওদের জন্যে কী করেছি একবার গিয়ে দেখে আসুন। গভীর জঙ্গল আর অসংখ্য হিংস্র পশু আর নগ্ন নৃশংস মানুষ ছাড়া কী ছিল আফ্রিকা চারশো বছর আগে? বিবেকহীন আরব ব্যবসায়ীরা এসে ভিড়ত তার পারে, শুধু জাহাজ-বোঝাই ক্রীতদাস কিনে নিয়ে পৃথিবীর দেশে দেশে বিক্রি করতে। সেই নিষ্ঠুর অমানুষিক ব্যবসা আমরা বন্ধ করেছি। আফ্রিকা বলতে আজ যা-কিছু বোঝায় সবই তো আমাদের তৈরি।

সেকথা তো আপনারা এশিয়া সম্বন্ধেও বলতেন।

হয়তো বলতাম। কিন্তু এ-দু'য়ে অনেক তফাত। এশিয়ার মানুষদের প্রাচীন ঐতিহ্য আছে। আপনারা সুপ্রাচীন সভ্যতার সচেতন উত্তরাধিকারী। আপনাদের প্রাচীন ইতিহাস আছে, দর্শন আছে। শুনেছি, য়ুরোপ যখন অসভ্য ছিল, ইংলণ্ডকে যখন ব্যাবিলনের ব্যবসায়ী নাবিকরা বলত 'টিন আইল্যাণ্ড', তখনও আপনাদের এশিয়ায় বিরাট সভ্যতা বিরাজ করত।

পৃথিবীর সবগুলো প্রধান ধর্মের জন্ম এশিয়ায়। যোগ দিলেন সুলোচনা।

নিশ্চয়।

বলে চলল আরনেস্ট লংফেলো: ভাবের ক্ষেত্রে আপনার কাছে পৃথিবীর মানুষ ঋণী। কিন্তু আফ্রিকা? তার কোন অতীত নেই, কোন ঐতিহ্য নেই। পৃথিবীর ভাণ্ডারে কিছুই সে দিতে পারে নি। কোন প্রাচীন সভ্যতার সচেতন উত্তরস্বত্ব তার নেই। সেখানকার যেটুকু সভ্যতা, যা-কিছু আলো, সবই আমাদের দেওয়া। এটা আপনাদের মনে রাখতে হবে।

কিন্তু এ তো অতীতের কথা। এখনকার প্রধান কথা হচ্ছে, ওরা অনেক, আপনারা সামান্য। ওদের ঘৃণা করে সরিয়ে রাখলে আপনারাই বিপন্ন হবেন। ঘৃণা হচ্ছে সবুজ-চোখ হিংস্র পশু—আপনাদের শেক্সপীয়রই বলে গেছেন: বললেন শুকদেব।

ঘৃণা? ঘৃণার কথা তুলবেন না। ওটা জঘন্য অপবাদ। নিগ্রোদের আমরা ঘৃণা করি নে। কিন্তু তা বলে ওদের আমরা নিজেদের সমান বলেও মানতে

রাজী নই। আপনার বাড়ির চাকরদের আপনি সমান্ বলে গ্রহণ করেন না। কিন্তু তার মানে কি এই যে আপনি তাদের ঘৃণা করেন?

এটা মনে রাখবেন যে নির্বাচনের সময় আমারও একটা ভোট, আমার চাকরেরও তাই।

তা জানি। কিন্তু আফ্রিকায় আমি এ-সাম্যের সমর্থন করি নে। আপনার আর আপনার ভৃত্যের নির্বাচনে একটাই মাত্র ভোট হতে পারে, কিন্তু আপনি জানেন, সে আপনাকেই নির্বাচিত করবে। যদি না করে, আপনি চটবেন। আজ যদি আপনার মন্ত্রী একজন শিক্ষিত ভদ্রলোক না হয়ে গাঁযের একটা চাষা হত, আপনার প্রতিক্রিয়া কেমন হত ভাবুন তো। আফ্রিকায় আমরা নিগ্রোদের রাজনৈতিক সাম্য দিতে পারি নে। কেন? শুধু এজন্যে যে তাদের সমতা মানে আমাদেব শেষ।

এটাকেই তারা ঘৃণা বলে মনে করে।

দেখুন, মিঃ শর্মা, আপনাকে একটা সোজা কথা জিজ্ঞেস করি। আপনারা আমাকে অনেক সহৃদয়তার সঙ্গে অতিথি করে নিয়েছেন। আজ যদি আমার বদলে একজন আফ্রিকান নিগ্রো আপনার বাড়িতে অতিথি হত, তাকে আপনি এমনিভাবে গ্রহণ করতে পারতেন? পারতেন গ্রহণ করতে আপনার স্ত্রী, আপনার ছেলেমেয়ে?

এ প্রশ্নেব জন্যে কেউ প্রস্তুত ছিল না। শুকদেব তাকালেন সুলোচনার দিকে। দেখতে পেলেন, একটা অজান৷ আতংকের ছায়া! শীলা বড় বড় চোখে তাকিয়ে আছে বাপের দিকে। রমেশ হেসে উঠল হঠাৎ। বোকা হাসি।

পাবতেন না:

বিজয়ী বীরের কণ্ঠে বলল লংফেলো: তাতে আপনাদেব কোন দোষ নেই। একদিন হয়তো পারবেন, তবে তা অনেক দূরের দিন। ওদের চেহারা, ভাষা, আদব-কায়দা, ওদের উপজাতি-জীবনের অদ্ভুত সব নিয়মকানুন, ওদের ধর্মাভাব—সবকিছুই আপনার রুচি ও কৃষ্টিকে চাবুক মারবে। একদিন হয়তো ওরা মানুষ হবে। কিন্তু সে দায়িত্ব, ইফ্ ইউ অ্যালাউ মি টু সে সো, আমাদেরই।

দিল্লীতে আরনেস্ট লংফেলোর দু' সপ্তাহ কাটল ভালোই। শুকদেব শর্মা তাকে গণ্যমান্য ব্যক্তির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। রোটারী ক্লাবে

বক্তৃতার নিমন্ত্রণ পেল আরনেস্ট লংফেলো। আফ্রিকার ইংরেজদের উদার নীতি ব্যাখ্যা করে সে ঘোষণা করল :

সবিনয়ে নিবেদন করছি, য়ুরোপের বাইরেকার পৃথিবীতে যে নব-জাগরণ এসেছে, তার বাহক য়ুরোপ নিজেই। আফ্রিকাতে সভ্যতার গঙ্গা আমরাই এনেছি। আজ যে মানুষের অধিকারের দাবি আপনারা শুনতে পাচ্ছেন—একটু বেশি কলরবের সঙ্গেই—তাও আমাদেরই আনা। আমরা এই নতুনের প্রতি সজাগ। একে আমরা অমঙ্গল মনে করি নে। কিন্তু এই নতুনকে সংহত প্রগতির পথে চালিত করতে হবে। নইলে আফ্রিকায় বর্বরতার পুনঃপ্রতিষ্ঠা হবে। আমরা নিগ্রোদের দূরে সরিয়ে রাখতে চাই নে। ধীরে ধীরে তাদের অধিকার দিতে চাই। আমরা চাই শ্বেতাঙ্গ আর নিগ্রো একসঙ্গে নতুন আফ্রিকা গড়ে তুলুক। এরই নাম পার্টনারশিপ। আমরা রেস্যাল কনফ্লিক্ট চাই নে। রেস্যাল কো-অপারেশন চাই।

মন্ত্রীদের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের সুযোগ পেল আরনেস্ট লংফেলো। কাগজে কাগজে তার বক্তৃতা ছাপা হল। একটি ইংরেজ-চালিত সংবাদপত্র থেকে রিপোর্টার এসে তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করল। সুলোচনাকে পাশে নিয়ে লংফেলোর ছবি ছাপা হল সে-পত্রিকায়। সাংবাদিক সাক্ষাৎকারে লংফেলো উচ্চকণ্ঠে স্বাধীন ভারত এবং তার নাগরিকদের সুখ্যাতি করল। গভীর আন্তরিকতার সঙ্গে বলল :

এ-দুটো সপ্তাহ আমার জীবনে চিরস্মরণীয়। ভারতবর্ষের কথা আমি বহুদিন ধরে শুনে আসছি। আজ যে-ভারতকে দেখলাম তার বর্তমান সুন্দর, ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল। আমি দু' সপ্তাহ একটি ভারতীয় পরিবারের অতিথি হবার সৌভাগ্য পেলাম। আমার হস্টেস আমার কাছে চিরদিনকার মতো স্মরণীয় হয়ে রইলেন। তাঁদের সৌজন্য, শিক্ষাদীক্ষায় প্রশংসা করবার ধৃষ্টতা আমার নেই। তাঁদের বন্ধুত্ব পেয়ে আমি ধন্য হলাম।

এই দু' সপ্তাহ পরম আত্মতৃপ্তির সঙ্গে সুলোচনা শর্মা তাঁর ইংরেজ অতিথির মনোরঞ্জন করেছেন। আরনেস্ট লংফেলো রাজধানীর অভিজাত সমাজে সুলোচনার মান বাড়িয়েছে, দাম বাড়িয়েছে। সুলোচনা তাঁর অতিথির চোখে-মুখে বার বার মুগ্ধতায় আলো দেখতে পেয়েছেন। নিজ দেহের প্রতি তাঁর মমতা ও কৃতজ্ঞতা আরও বেড়ে গেছে।

স্বামী শুকদেবের জীবনে স্ত্রী সুলোচনার আধিপত্য সুদীর্ঘ ও বৃহৎ।

স্বামী তাঁকে ভালবাসেন, মান্য করেন, তাঁর সাহস, বুদ্ধি ও সপ্রতিভতার তারিফ করেন। কিন্তু সুলোচনা জানেন, শুকদেব শর্মার জীবনে স্ত্রী ছাড়াও অন্য নারীর আগমন ও প্রস্থান হয়েছে, হতে পারে। বেশির ভাগ পুরুষ বহু নারীলোভী; শুকদেবও তাই। কিন্তু অন্য নারীর দেহ নিয়ে লোভ করলেও, মন নিয়ে শুকদেব কোনদিন টানাটানি করেন নি, নিজের মনও সুলোচনায় ছাড়া অন্যত্র বিক্ষিপ্ত করেন নি।

জমিদার বাড়ির ছেলে শুকদেব, বিদেশে শিক্ষিত; রূপমুগ্ধ হয়ে মধ্যবিত্ত ঘরের সুলোচনাকে বিয়ে করেছিলেন—স্বামীর বর্ধমান সৌভাগ্যে সুলোচনা সমাজের উচ্চস্তরে উন্নীতা। গোটা মানুষটাকে তিনি পেয়েছেন, তার ছোট-খাটো বিচ্যুতিকে ধর্তব্যের মধ্যে আনেন নি। নিজেকে সাধ্যমত তিনি খাঁটি রেখে এসেছেন। জীবনের প্রলোভন অনেক। সুন্দরী নারীকে প্রলুব্ধ করায় পুরুষের চেষ্টার ত্রুটী থাকে না। বহুবার অনেক বড় বড় মানুষের লোভদৃষ্টি সুলোচনার চোখে পড়েছে। স্বামীর সৌভাগ্যকে অপ্রতিহত রাখবার জন্যে তাঁদের সঙ্গে বেড়াতে হয়েছে, খেতে হয়েছে, নাচতে হয়েছে, সিনেমায় যেতে হয়েছে। কারো উষ্ণ নিঃশ্বাস পড়েছে সুলোচনার মুখে, গলায়, ঘাড়ে; কারো বা হাত এসে ধরেছে তার হাত, স্পর্শ করতে চেয়েছে তার যৌবন। একবার এক নবাবসাহেব তাঁকে প্রায় বাহুবদ্ধ করে ফেলেছিলেন আর কি! আর একবার নরম্যান কলিনস্—সেই সুদর্শন ইংরেজ আই. সি. এস. যে হঠাৎ মীরাটের ডি. এম. হয়ে আসে—তাকে জোর করে চুমু খেয়েছিল। কিন্তু এসব সামান্য আঁচড় ছাড়া সুলোচনার দেহের পবিত্রতা নিখুঁত, তাঁর সতীত্ব উজ্জ্বল।

পঞ্চাশ-ঘেঁষা স্বামীর দেহপরায়ণতা কমে এসেছে। দিনরাত তিনি দেশের সেবায় ডুবে আছেন। সুলোচনা সর্বদা তাঁর সঙ্গে, দেহে, অদেহে। দেহ নিয়ে মাতামাতি করবার বয়স তাঁরও নেই। তবু নিজেকে তিনি সাজিয়ে রাখেন। ওটা রুচি, সংস্কৃতি। সৌন্দর্যের মতো ঐশ্বর্য নেই। তাকে সযত্নে, সাদরে, কৃতজ্ঞতায় সঞ্চিত রাখতে হয়। পুরুষ মুগ্ধ হয়ে তাকাবে: এর চেয়ে বড় তৃপ্তি নারীর আর কোথায়? স্বামী হঠাৎ দেখে বলবে, 'বাঃ'; হয়তো কিছুই বলবে না, অথচ সবই বলে দেবে তার মুগ্ধ চোখ! শুধু স্বামী কেন, সব পুরুষের মুখে 'বাঃ' শুনবার সৌভাগ্য পেয়েছেন সুলোচনা। আর তার জন্যে মনে যেন একটু ক্ষুধা সদাই সঞ্চিত আছে।

আরনেস্ট লংফেলোর জীবনে নারী এসেছে অনেক, কিন্তু সে এখনো বিয়ে করে নি। সেই কোন কৈশোরে ভাগ্যের খোঁজে দক্ষিণ আফ্রিকায় পাড়ি দিয়েছিল, এতদিন ভাগ্যজয়ে কেটে গেছে, বিয়ের কথা ভাবে নি। স্ত্রীলোক না হলে পুরুষের জীবন চলে না, তাই বেঁচে থাকবার জন্যে নারীর যেটুকু প্রয়োজন ততখানিই সে শুধু জানে। আফ্রিকার খনিতে কাজ করতে আসে শতশত অন্ধকারের মতো কালো রমণী, তাদের দেহে আর কিছু না থাকলেও পরিপুষ্ট যৌবন সাজানো থাকে প্রথম বয়সে। সে যৌবন কাড়াকাড়ি করে ভোগ করবার বস্তু নয়, তা নিয়ে যে লোভ সেটা নেহাত সাময়িক। তাছাড়া, স্বজাতি শ্বেত স্ত্রীলোকও লংফেলোর জীবনে কম আসে নি। আফ্রিকার ইংরেজ, যারা ভাগ্যের খোঁজে ঘর বাঁধে, তাদের ঘরনীদের জীবনযাত্রায় নীতি-বোধের তেমন দুর্ভেদ্য বাধা নেই। মাঝে মাঝে দু'-একটি মেয়েকে লংফেলোর মনে ধরেছে, কিন্তু হয় তারা ওর জন্যে বিশেষ কেয়ার করে নি, নয়তো নিজেও এগিয়ে গিয়ে বিয়ের প্রস্তাব করে নি। শুধু একবার খনির একজন ডিরেক্টারের স্ত্রী তাঁর মেয়ের সঙ্গে লংফেলোকে ভয়ানক জড়াতে চেয়েছিলেন, কিন্তু লংফেলোর ভাগ্য ভালো, সে জাল থেকে বেরিয়ে এসেছিল একরকম অনাহত থেকেই।

এবার, অর্ধশতাব্দী বয়সের কাছাকাছি পৌঁছে, ভাগ্যলক্ষ্মীকে অনেকখানি জয় করে, সে ভাবছে বিয়ে করে কেমন লাগে দেখতে হবে। তার রাজনীতিক্ষেত্রে অনুপ্রবেশের বাসনার সঙ্গে এই বিবাহ-ইচ্ছার সম্পর্ক আছে। বিয়ে না করলে পুরোপুরি সামাজিক সম্মান পাওয়া যায় না। যারা সমাজের ভিত্তি, সেসব পুরুষরা কৌমার্যের প্রতি প্রসন্ন থাকেন না। পরিণত বয়সের কুমারদের সম্বন্ধে নানা বিচিত্র ধারণা সমাজে প্রচলিত থাকে। লোকটা হয় ভীরু, নয় একান্ত স্বার্থপর নয় কোন দুষ্ট রোগগ্রস্ত, আর নয়তো ইমপোটেণ্ট। হয়তো তার পেছনে পুলিশ, হয়তো সে কোন দুষ্কর্মের অতীত থেকে পলাতক। হয়তো সে ভয়ানক ভাবপ্রবণ, প্রথম যৌবনে কোন লাজুক মেয়ের প্রেমে হতাশ হয়ে ওপথে আর পা বাড়ায় নি। বিবাহিত পুরুষরা তাকে ঠিক নিজেদের মতো করে গ্রহণ করতে চায় না, মেয়েরা তার প্রতি কেমন একটা রহস্যময় ব্যবহার করে। এর কোনটা রাজনৈতিক জীবনের পক্ষে অনুকূল নয়। পঞ্চাশ বছর বয়সে তো লংফেলো রাজনীতিতে শিক্ষানবিশী করতে নামবে না, নেমেই একজন নেতা হবে এবং আশা আছে, সহজে মন্ত্রী হবে। তাই সমাজে তাকে

গৃহীত হতে হবে একজন স্থিতবুদ্ধি, সুখী, পরিতৃপ্ত পুরুষ হিসেবে। সামাজিক অনুষ্ঠানে যেতে হবে স্ত্রীকে পাশে নিয়ে। নইলে লোক তাকে বিশ্বাস করবে কেন? ভাববে কেন, সমাজে সে নোঙর করেছে? লংফেলো নামক তরী যে তীরে এসে দাঁড়িয়েছে, ইচ্ছে করলেই সেখান থেকে পাল তুলে আবার পাড়ি দিতে পারে না, তার প্রমাণ দিতে হবে ডাঙায় ঘর তুলে। আর পুরুষের ঘর তোলা মানেই বিয়ে করা।

স্ত্রীলোক আরনেস্ট লংফেলো অনেক দেখেছে, কিন্তু সুলোচনা সবার থেকে আলাদা। এ হচ্ছে প্রাচ্যের সৌন্দর্য। বর্ণে আছে ইতালির স্পর্শ, স্পেনের হাত-ছোঁওয়া, যেন একটা মৃদু, কোমল, নরম কবিতা। দেহের চামড়ায় কোথাও এতটুকু দাগ নেই। চোখ দুটো গভীর কালো। একদিকে বিস্ময়কর সপ্রতিভতা, অন্যদিকে এমন একটা স্বাভাবিক লজ্জা যা তার আগে কখনো চোখে পড়ে নি। সাধারণ ইংরেজ মেয়ের চেয়ে সুলোচনা যে বেশি শিক্ষিতা তা বুঝতে মোটে কষ্ট হয় না। অথচ অনেক প্রাচুর্যের মধ্যে বাস করেও সুলোচনা সদাই কর্মব্যস্ত। সংসারে তিনি সর্বময় কর্ত্রী, তার ওপর স্বামীর পার্শ্বচারিণী। সুলোচনা যেমন অনায়াস মাধুর্যের সঙ্গে মিশছেন সমাজের উচ্চতম স্তরে, তেমনি নিম্নতম মানুষের সঙ্গেও তাঁর ব্যবহার ভদ্র, মধুর ও শালীন। এই একান্ত অপরিচিত বিদেশী অতিথিকে নিয়ে তিনি দিল্লী শহরের ঐতিহাসিক প্রাচীনতার নিদর্শনগুলি ঘুরে বেড়িয়েছেন, সবকিছু বিশুদ্ধ ইংরেজিতে তাকে বুঝিয়ে দিয়েছেন, পুরোনো পাথর সজীব নতুনতার স্পর্শে মুখর হয়ে উঠেছে। সুলোচনার মধ্যে লংফেলো নারীর একটা একান্ত অপরিচিত চেহারা দেখেছে, তার মন আকৃষ্ট হয়েছে।

এই আকর্ষণটা কী জাতের তা লংফেলো নিজেই ভালো করে বুঝতে পারে নি। দেহের? মনের? সুলোচনার কি সে প্রেমে পড়েছে? তা নয়, প্রেমে সে পড়েনি। সে-বয়স তার নেই, আর তত কাঁচাও নয় তার বিবেচনা। সুলোচনার দেহ তার দেহে তেমন কোন বুভুক্ষা জাগায় নি যা তার বুদ্ধিকে বিগড়ে দিতে পারে। শুধু তার মনে হয়েছে, আকর্ষণীয় তুমি, তোমাকে আরও জানতে, আরও বুঝতে আমার ইচ্ছে করছে, তোমাকে আরও একটু কাছাকাছি পেতে।

অথচ এমনি করেই তার স্বল্প-দিনের অতিথিজীবন শেষ হয়ে এল, কেটে

গেল একে একে ছোট্ট, নিতান্ত স্বল্পায়ু দুটো সপ্তাহ এবং এসে গেল বিদায় নেবার দিন।

যেদিন সে চলে যাবে তার আগের রাতে শুকদেব শর্মা কিছুতেই একটা নৈশ ভোজনের নিমন্ত্রণ এড়াতে পারলেন না। জাপান থেকে এসেছে বাণিজ্য-মিশন, তাঁদের নিয়ে কেটেছে কয়েকটা ব্যস্ত দিন, আজ তাঁদের সম্মান করতে হবে নৈশ ভোজে, তার অন্যতম প্রধান উদ্যোক্তা শুকদেব শর্মা নিজে।

গভীর খেদে, বাধ্য হয়ে, লংফেলোর কাছে তাঁকে মার্জনা চাইতে হল। বললেন, কোনমতে যদি এড়াতে পারতাম তাহলে আপনাকে,সুলোচনার কাছে ছেড়ে যেতাম না।

কথাটা একটু অদ্ভুত ঠেকল লংফেলোর। কিন্তু শুকদেব শর্মা শুধু দুঃখের সঙ্গে নিজের অক্ষমতা জানাতে চেয়েছেন। যে-অতিথি পরের দিন বিদায় নেবেন, তাঁকে শেষ নৈশ ভোজনে আপ্যায়িত করবার সুখ থেকে বঞ্চিত হয়ে তিনি ক্ষুণ্ণ।

লংফেলো উদারভাবে জবাব দিল, আপনার অবস্থা আমি সম্পূর্ণ বুঝতে পারছি। পুরুষের জীবনে এরকম হয়েই থাকে। আমি জানি মিসেস শর্মা একাই একশো; আপনি কিছু দুঃখ করবেন না।

সুলোচনা পরম আদরে অতিথিকে খাওয়ালেন। মুঘল-আমলের রেস্তোঁরা থেকে বিশেষ অর্ডার দেওয়া তন্দুরী মুরগী এল, তার সঙ্গে নান। বাবুর্চি তৈরি করল মাংসের রোষ্ট আর মাছের ফ্রাই। নিজের হাতে সুলোচনা তৈরি করলেন সুগন্ধি ডেসার্ট। খাওয়া শেষ হলে অতিথির হাতে তুলে দিলেন দামী দামী লিকিউর। নিজে নিলেন না।

খেতে খেতে গল্প করলেন তাঁর বিবাহের, এবং বিয়ের পর প্রথম জীবনের প্রসঙ্গ। প্রশ্ন করে জেনে নিলেন লংফেলো কেন এতদিন বিয়ে করে নি। প্রশ্নের জবাবে জানালেন শীলার ইচ্ছে সে হবে ডাক্তার, আর রমেশ ইঞ্জিনীয়র। শীলা এখন বি. এস-সি পড়ছে দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের সেণ্ট স্টিফেন্স্ কলেজে। পাস করে ভর্তি হবে লেডী হার্ডিঞ্জে ডাক্তারির জন্যে। তার বাবার ইচ্ছে এখান থেকে পাস করার পরে বিলেতে গিয়ে সে সর্বোচ্চ ডিগ্রী নিয়ে আসে। শীলার বিয়ের কথা তাঁরা এখন ভাবছেন না। এ-প্রসঙ্গে শীলা একটুও লজ্জা পেল না; বড় বড় চোখ করে জানাল, বিয়ে নামক ব্যাপারে তার মৌলিক আপত্তি! এ আপত্তির অবতি কোন মানে নেই, সহাস্যে বললেন সুলোচনা, আমাদের

দেশের মেয়েরা বিয়ের দিন পর্যন্ত বলে তাদের বিয়েতে ভীষণ আপত্তি! তবে ডাক্তারির সঙ্গে বিবাহিত জীবনের সামঞ্জস্য হতে পারে এমন পাত্র তাঁরা প্রেফার করবেন। প্রত্যেক মেয়ের বিয়ে করা উচিত, সুলোচনা মনে করেন, কেননা বিয়ে না করলে মেয়েদের জীবন ঠিক সার্থক হয় না। রমেশ স্বাধীন ভারতবর্ষ তৈরি করার কাজে হাত লাগাতে চায়, তাই সে হবে এঞ্জিনীয়র। তার এখনো স্কুল শেষ করতে এক বছর। তারপর ইণ্টারসায়ান্স, এবং তারপর এঞ্জিনীয়র। হয় সে যাবে জার্মেনী, আর নয়তো গ্ল্যাসগো।

লংফেলো খেতে খেতে আফ্রিকার নানা রোমহর্ষক গল্প বলল। কতবার কতরকম বিপদে সে পড়েছে তার দু'চারটে নমুনা দিল। একবার কিনিয়ার জঙ্গলে একদল একেবারে উলঙ্গ আফ্রিকান তাকে তেড়ে এসেছিল তীর ধনুক আর বল্লম নিয়ে; শুধু পিস্তল ছিল তার সঙ্গে, আর তাই দিয়ে সে নিজেকে রক্ষা করতে পেরেছিল। আর একবার শিকার করতে গিয়ে সে এক সিংহের মুখে পড়েছিল, নেহাত তার আয়ু ছিল তাই সে-যাত্রায়ও সে বেঁচে গিয়েছিল। আফ্রিকার গ্রামে গ্রামে এখনো রাজত্ব করছে ম্যাজিক আর ভূত-প্রেত। নিগ্রোদের তো কোন ধর্ম নেই, তারা পূজো করে কেবল পূর্বপুরুষদের আত্মাকে। ক্রিশ্চান মিশনারীরা অবশ্যি অনেককে অন্ধকার থেকে আলোয় এনেছেন, কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গে ইসলাম ধর্মও ছড়িয়ে পড়েছে অনেক বেশি। নিগ্রোরা যাদের কবলে বাস করছে তারা হচ্ছে গ্রামের উইচ-ডক্টর; তারাই গ্রামের পুরোহিত। নানারকম অসভ্য অস্বাস্থ্যকর দুর্নীতিতে গ্রাম্য জীবনযাত্রা আক্রান্ত। মেয়েরা একটু বড় হলেই জোর করে দল বেঁধে তাদের ওপর একটা জঘন্য অপারেশন করা হয়। তাতে কত নির্দোষ নিরপরাধ মেয়ের প্রাণ যায়। ক্রিশ্চান মিশনারীরা এই বর্বর প্রথাকে আক্রমণ করার জন্যে নিগ্রোদের কাছে মহা-অপরাধী। তবু অসীম ধৈর্যের সঙ্গে য়ুরোপের মানুষ নিগ্রোদের এই প্রাচীন বর্বরতার হাত থেকে বাঁচবার জন্যে সংগ্রাম করছে। নিগ্রোসমাজে কোন নীতিবোধ নেই। যুবক-যুবতীরা দিনের পর দিন একটা বিশেষ গৃহে একসঙ্গে বাস করে এবং সেখানে যা চলে তা বর্ণনা করতে লংফেলোর অস্বস্তি লাগছে। অথচ আজকাল একদল নিগ্রো নেতার আবির্ভাব হয়েছে—যেমন ধরুন জেমো কেনিয়াটা—যারা এসব ট্রাইবাল রীতিনীতির ওপর কোনরকমের হস্তক্ষেপ বরদাস্ত করতে রাজী নয়। নিগ্রোদের অসভ্য রাখাই তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য,

এবং তাদের বর্বরতাকে প্রশ্রয় দিয়ে, ক্ষেপিয়ে তুলে, সেই অস্ত্রে তারা শ্বেতাঙ্গ-নিধন করতে চায়।

এসব গল্পে-গল্পে নৈশ আহার শেষ হল।

শীলা ও রমেশ উঠে চলে গেল নিজেদের ঘরে।

আরনেস্ট লংফেলো গিয়ে বসল শুকদেব শর্মার বৈঠকখানায়। এসে অবধি সে এই ঘরখানার সুরুচি-সজ্জার প্রশংসা করেছে। প্রশস্ত ঘরের এক-পাশে ডিভান, তার সঙ্গে দামী সোফা সেট। ডিভানে অতি সুন্দর কাশ্মীরী-কাজ-করা চাদর বিছানো। ঘরের অর্ধেক ঢেকে রয়েছে দামী পার্সিয়ান কার্পেট। এক কোণে পিয়ানো; একপাশে মূল্যবান রেডিওগ্রাম। তার ওপর সুলোচনার হাস্যময়ী ছবি, রূপোর ফ্রেমে আটকানো। সেণ্টার টেবিলে চীন থেকে আনানো মনোরম পুষ্পদান। দেয়ালে অমৃতা শেরগিলের আঁকা একখানা তৈলচিত্র আর মহাত্মা গান্ধীর প্রার্থনারত আলেখ্য। উল্টো দিকে কাঁচের শো-কেসে নানারকম কিউরিয়ো—দেশী ও বিদেশী।

সোফার পিঠে হেলান দিয়ে লংফেলো আরামে পাইপ জ্বালল। বেশ কেটে গেল তুটো সপ্তাহ। সবদিক থেকে সার্থক। ভারতে আসার আগে সে ভাবতে পারে নি এই স্বল্পায়ু প্রবাস এত সুন্দর হবে। চমৎকার দেশ ভারতবর্ষ। এরা ইংরেজের কদর জানে। এদের সভ্যতার মাপকাঠি এখনো আমাদের হাতে। আমরা যা, এরা তাই হতে চায়। কেমন সুন্দর করে এরা আমাদের সব কীর্তি সাজিয়ে রেখেছে। কোনখানে কোন-কিছু নষ্ট হতে দেয় নি। আমরা প্রশংসা করলে কেমন এরা পরিতৃপ্ত হয়। এরা আমাদের পোষাক আমাদের চেয়ে ভালো পরে, ভালো ও বিশুদ্ধ ইংরেজি বলতে বা লিখতে পারা এদের সংস্কৃতির পরিচয়। দূর থেকে কংগ্রেসীদের সম্বন্ধে নানা উদ্ভট কথা সে শুনেছিল। ভেবেছিল, কী জানি কেমন হবে সারাজীবনের বৃটিশ সংগ্রামী সেই মানুষগুলো। কাছে এসে দেখতে পেল, তারা সব অল রাইট। যে-মন্ত্রীর সঙ্গে সবচেয়ে বেশিক্ষণ তার কথাবার্তা হল তাঁর নাতিরা সব ইংলিশ স্কুলে পড়ে। তাঁর ছেলেদের একজন বিলেতে আছে, অন্যজন জার্মেনীতে। কেমন সুন্দর তাঁর ইংরেজি—ইংলণ্ডকে তিনি মনেপ্রাণে শ্রদ্ধা করেন। একটু বেশি বই-ঘেঁষা কথাবার্তা, কিন্তু তা তো হবেই! ব্যবহারিক রাজনীতিতে সবেমাত্র এঁরা মাথা গলিয়েছেন। কিছুদিন পরে বুঝতে পারবেন বই-এর ভাষা আর জীবনের ভাষা এক নয়। পার্থক্য অনেক। মন্ত্রীদের পরে—অনেকক্ষেত্রে

বোধ হয় আগেও—শুকদেব শর্মার মতো রাজকর্মচারীদের স্থান। এরা কেউ ইংরেজের সঙ্গে কোনদিন বিরোধিতা করে নি। এদের সুদক্ষ সহযোগিতায় ইংরেজ-রাজত্ব টিঁকে ছিল দেড়শো বছর। এরা বড় একটা স্বাধীনতা চায় নি। কিন্তু এদেরই জন্যে তো এই স্বাধীনতা বর্তমান। সবচেয়ে বেশি ক্ষমতা, সম্মান, প্রাচুর্য ঘটেছে এদেরই। অবশ্য তার প্রতিটি কণার জন্য এরা উপযুক্ত। অন্য দেশ হলে এদের সম্মান আরও বাড়ত। এরাই ভারতবর্ষকে তৈরি করছে। সে-ভারতবর্ষে ইংরেজের কোন ভয় নেই। তার স্থান সুনিশ্চিত। লংফেলো পরিতৃপ্তির সঙ্গে ভাবল, ভারতবর্ষের সঙ্গে একটা-কিছু পাকা সম্পর্ক স্থাপন করতে হবে। ব্যবসার সুযোগ আছে। কথাবার্তাও কিছু কিছু হয়েছে। এদের অর্থনৈতিক দৃষ্টি অবশ্যি এখনো বড় বই-পড়া। থিয়োরিটাকে বড় করে দেখার অভ্যেস। সবাই কম-বেশি সমাজতন্ত্রের কথা বলে। অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ ব্যবসাক্ষেত্রে বিদেশীকে ঢুকতে দিতে চাইছে না।

রাষ্ট্রকে এরা দেখছে পরমপিতার মতো। সব করবে রাষ্ট্র। সবার জীবন-ধারা সে-ই বদলে দেবে। রাষ্ট্রই গড়বে শিল্প, করবে ভূমি-সংস্কার, গড়বে নতুন শহর, নতুন গ্রাম। এরা জানে না, তা সম্ভব নয়। রাষ্ট্র যদি গড়ে তবে রাষ্ট্রই হবে সবকিছুর মালিক। রাষ্ট্রায়ত্ত হবে সবার জীবন। আর তারই মানে টোটালিটারিয়ানিজ্‌ম। অথচ ও-জিনিস এরা চায় না। এদের রাজনৈতিক ধর্ম গণতন্ত্র, অর্থনৈতিক ধর্ম সমাজতন্ত্র। কিন্তু একদিন এরা শিখবে। বুঝবে, দুটো একসঙ্গে হয় না। রাষ্ট্রকে অনেক বড় করে দেখো, রাষ্ট্র তোমাকে অনেক ছোট করে দেখবে। লংফেলো ভারতের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আশান্বিত। একটা ব্যবসা শুরু করতে হবে। হয়তো কোন ভারতীয় ব্যবসার সঙ্গে মিলেই করতে হবে। তাতে সরকারের উৎসাহ আছে।

হঠাৎ লংফেলোর চিন্তায় পড়ল দারুণ বাধা।

সুলোচনা ঘরে এলেন। নৈশ ভোজনের শাড়ি বদলে এসেছেন। এখন পরেছেন হালকা গোলাপী রং-এর জর্জেট। শাড়ির রং মিলিয়ে ব্লাউজ। মুখে হালকা প্রসাধন। ঠোঁট দুটো পলাশের মতো লাল। অঙ্গে মৃদু সৌরভ। সুর্মা চোখ দুটিকে আরও কালো করেছে। পায়ে বর্মী চটি।

মুহূর্তের জন্যে লংফেলো কেমন যেন বিহ্বল হয়ে গেল। কয়েক সেকেণ্ড নির্বাক চোখ রাখলো সুলোচনার দিকে। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে পাইপ সরিয়ে রাখল।

আসুন।

কী ভাবছিলেন বসে বসে? কালকেই মুক্তি পাবেন, এই তো?

একদিক থেকে তা মুক্তিই বটে।

একদিক থেকে কেন?

কাল আমি সত্যিই মুক্তি পাবো মিসেস শর্মা।

তাইতো আমি বলছি।

কিন্তু এ-মুক্তি বড় সুখের নয়।

মুক্তি সব সময় সুখের।

সব সময় নয়। মাঝে মাঝে বন্ধন আরও সুখের।

সে তো কাব্যের কথা হল।

আমি জীবনের জাঁতাকলে গড়া কাটখোট্টা ব্যবসাদার। কাব্যের কিছুই জানি নে।

তবে কবির মতো কথা বলছেন কেন?

কবির মতো নয়। মানুষের মতো।

পুরুষমানুষের মতো?

তা—নিশ্চয়ই।

তাহলে বলুন।

বলছি, কাল যে-মুক্তি পাবো তা সুখের নয়।

অর্থাৎ আমাদের ছেড়ে যেতে আপনার দুঃখ হবে?

হবে না?

জবাবের বদলে প্রশ্ন করছেন কেন?

জেনেও আপনি জানতে চাইছেন কেন?

জানি নে বলেই তো জানতে চাইছি।

জানেন বলেই তো জেনেও মানতে চাইছেন না।

জানাতে চেয়েও আপনি জানাতে পারছেন না।

জানাতে চেয়েও আমি জানাতে পারছি না ঠিকই।

আমরা কিন্তু বেশ হেঁয়ালির মতো কথা বলছি।

বলতে ভালো লাগছে।

আমার বুদ্ধির দৌড় কম। একটুতেই হাঁপিয়ে যাই।

আপনার কোন-কিছুরই দৌড় কম নয়।

কীসে জানলেন ?

অন্তরে।

বিয়ে না করলে পুরুষরা বড় হয় না।

মানলাম।

এবার চট্ করে বড় হয়ে নিন।

তাতে আপনার লাভ কী ?

আমার সহেলী হবে।

নাও তো হতে পারে।

হবে না কেন ?

এবার আপনার দৌড় ফুরিয়ে আসছে।

বলেছি তো, অল্পেই হাঁপিয়ে যাই।

কাল চলে যাবো। আশা করি আমাকে ভুলবেন না।

ভুলবো কেন ?

মনে রাখবেন ?

নিশ্চয়ই।

শুনে সুখী হলাম। আপনাদের বন্ধুত্ব আমার কাছে অনেক দামী।

কত দামী ?

কী করে বোঝাবো !

কেন ? আপনি তো অনেক ব্যবসা চালান।

টাকার দামে ?

তবে কীসের ?

আবার আপনি হাঁপিয়ে যাচ্ছেন।

আপনার ব্যবসা করার প্ল্যান পাকা হয়েছে ?

প্রায়। তাই তো বসে বসে ভাবছিলাম।

সুলোচনার মুখ একটু ম্লান হল।

ও ! ব্যবসার কথা ভাবছিলেন ?

ব্যবসার কথাও ভাবছিলাম।

'ও' কেন ?

আরও অনেক কথা।

যেমন ?

ভারতবর্ষের কথা। দিল্লীর কথা। আপনার কথা।

আমার কথা কেন?

ভাবনার স্বাধীনতা কি এদেশে অস্বীকৃত?

এদেশে কোন ন্যায্য অধিকারই অস্বীকৃত নয়।

তাহলে আপত্তি করছেন কেন?

আপত্তি করি নি তো। জানতে চাইছি।

জেনে আপনার লাভ কী?

ক্ষতি তো নেই।

থাকতেও তো পারে।

আপনি ব্যবসায়ী। কেবলি লাভ-ক্ষতির কথা ভাবেন।

আপনি ভাবেন না?

নট অলওয়েস।

এই আলগা 'নট অলওয়েস' শব্দ দুটো আরনেস্ট লংফেলোর সর্বনাশ করল। ঝড়ের মতো এগিয়ে এসে সুলোচনাকে সে বুকে জড়িয়ে ধরল। চুমোয় চুমোয় তার মুখ ভরে দিল। তারপর অন্ধের মতো নিজের ঠোঁট দিয়ে সুলোচনার ঠোঁট খুঁজে বেড়াতে লাগল।

'নট অলওয়েস' বলেই সুলোচনা বুঝতে পেরেছিলেন, বলাটা ঠিক হল না। কাল যে চলে যাবে, যে-মানুষটাকে বেশ ভালো লেগেছে, যার সঙ্গে বন্ধুত্বে সামাজিক পরিতৃপ্তি এবং এর পরে যার সঙ্গে হয়তো কোনদিন আর দেখা হবে না, তার সঙ্গে রাতের নিরালায় একটু ফ্লার্ট করবার জন্যে তৈরি হয়ে তিনি বৈঠকখানায় এসেছিলেন। হঠাৎ মনে হয়েছিল, বয়স বেড়ে যাচ্ছে, পুরুষের মুগ্ধ দৃষ্টি দেখবার দিন দ্রুত শেষ হয়ে আসছে। মনে হয়েছিল, জীবনে পরম লগন, হে গরবিণী, ক'রো না হেলা।

দেখেছিলেন, অমন তাজা পুরুষমানুষটা, নিজের যোগ্যতায় যে বিরাট ঐশ্বর্যের স্রষ্টা ও অধিপতি, তাঁর প্রতি অনুরক্ত। কিন্তু মনে মনে সন্দেহ ছিল, হয়তো ওটা তাঁরই মনের ভুল। এখনো কি আমার আছে সেই অমূল্য রতন যা পুরুষকে বিভ্রান্ত করতে পারে? না কি নিজেকেই ভোলাচ্ছি? একটু পরখ করে দেখবার লোভও ছিল। বিজয়িনী হওয়ার বাসনা কোন্ নারীর না থাকে? কথার পিঠে কথা বলতে গিয়ে ইচ্ছে করেই একটু প্রগল্ভ হয়েছিলেন। কিন্তু কখন, কোন্ অসতর্ক মুহূর্তে, সীমা উত্তীর্ণ হয়ে গেছেন।

যেতেই দেখলেন, তিনি সত্যি বিজয়িনী। আছি, আছি, আমি আজও আছি। আমি সেই সুলোচনা, যাকে দেখে অত বড় দামী ছেলে শুকদেব একদিন বিয়ের জন্যে পাগল হয়েছিলেন, যাকে দেখে মন টলে নি এমন পুরুষ লক্ষ্ণৌ-এলাহাবাদে কমই ছিল। আমি এত আছি যে একজন ইংরেজ কোটিপতিও আমার অস্তিত্বে উতলা হয়ে উঠেছে। আরনেস্ট লংফেলোর বাহুপাশে বদ্ধ হয়ে সুলোচনা প্রথম একটু ভীত, বিহ্বল হলেন, কিন্তু পরক্ষণেই বড় ভালো লাগল। পেশল, শক্ত, পুরুষের দেহ। মনে পড়ল যৌবনের শুকদেবকে। সেই অনেকদিন আগের তোমার মতো এই মানুষটা। লংফেলোর চুম্বন তাঁর গালে, কপালে, মাথায় ঝরে পড়তে লাগল। তিনি ভাবলেন, তুমি তো তবু কোনদিন এত উন্মত্ত হও নি!

লংফেলো যখন তাঁর অধর স্পর্শ করল তখন তিনি একটু সচেতন হলেন।

তারপর লংফেলোর অস্থির হাত তাঁর বুকের ওপর পড়তেই তিনি নিজেকে মুক্ত করে দু'পা সরে দাঁড়ালেন।

ধন্যবাদ। কিন্তু আর নয়।

কেন? কঁকিয়ে উঠল লংফেলো: আমি তোমায় ভালোবাসি, সুলোচনা।

ধন্যবাদ। কিন্তু আমি যে আমার স্বামীকে ভালোবাসি।

তবু—

মিনতি করল লংফেলো।

এর পরে আর 'তবু' নেই।

একটুও নেই?

আমার জীবনে অন্তত নেই।

তুমি রাগ করো নি, সুলোচনা!

নিজেকে সামলে নিল লংফেলো।

না। রাগ করবো কেন?

আমার এ-ব্যবহারে?

সব পুরুষই এমন।

কিন্তু সব নারী তোমার মতো নয়।

এদেশে বেশির ভাগ নারীই আমার মতো। তারা স্বামী ছাড়া অন্য পুরুষের সঙ্গে প্রেম করে না।

এদেশের পুরুষ ?

বেশির ভাগই আপনার মতো। সুযোগ পেলেই প্রেম করতে চায়।

আমি দুঃখিত। আমি ভেবেছিলাম—

আপনি কী ভেবেছিলেন আমি জানি। মানুষ নিজের অভিজ্ঞতার দাস। আপনার অভিজ্ঞতা অন্যরকম।

তা ঠিক।

এ-দেশটাও অন্যরকম। আপনাকে একটা কথা খোলাখুলি বলতে চাই।

বলো।

আপনাদের সমাজে দেহের স্থানটা অনেক বড়। শুনতে পাই আপনাদের মেয়েরা পর্যন্ত দেহের ক্ষুধাকে সাধারণ ক্ষুধা হিসেবে ধরে নিচ্ছে। তাই তেমন খাদ্য পেলে খেতে তাদের আপত্তি থাকে না। আমাদের সমাজে অন্যরকম। আমরা দেহকে অস্বীকার করতে অভ্যস্ত। ওর খুব একটা বড় দাম আমরা দিই নে। ক্ষুধাকে চেপে যাই। জয় করে নিই।

তাকে জয় বলে না, শাসন বলে।

যাই বলুন। শাসনই করি। ধরুন, বাড়িতে আমি একা। ছেলেমেয়ে ঘুমুচ্ছে। আপনার সঙ্গে কিছু-একটা করলে আমায় বাধা দেবার কেউ নেই। শুধু আমি ছাড়া। আমরা সর্বক্ষণ নিজেকে শাসন করতে অভ্যস্ত। সেটাই আমাদের স্বভাব।

এটা কি ভালো ?

আমার তো মনে হয়, নিশ্চয় ভালো। শিশুদের কথাই ধরুন না। আমরা বলি, বেত ছেড়ে দাও, ছেলে গোল্লায় যাবে। তেমনি আমরা নিজেরাও। মনের আকাঙ্ক্ষা সীমাহীন। জীবনে প্রলোভনের অন্ত নেই। শুধু আমার প্রহরী আমি নিজে। নিজেকে শাসন না করলে আমার দাঁড়াবার জায়গা থাকবে না।

তোমার কথা বুঝতে পারছি। কাল আমি চলে যাবো। আজ আমি তোমার আরেক পরিচয় পেলাম।

যদি আপনাকে দুঃখ দিয়ে থাকি, মাপ করবেন।

দুঃখ ? দুঃখের চেয়ে লজ্জা দিয়েছো বেশি। তাই মাপ চাইবার কথা আমারই।

লজ্জিত হবেন না। জীবনে হয়তো আর আমাদের দেখা হবে না।

আপনার কাছে তাই স্বীকার করি, আপনার এই সামান্য আহুতির জন্যে আমার মনেও লোভ ছিল।

. সুলোচনা!

এগিয়ে আসবেন না। ওখানেই বসুন। লোভ ছিল এজন্যে যে আমার বয়েস হয়েছে। ভেবেছিলাম পুরুষের কাছে আমার দাম শেষ হয়ে এসেছে। আমার স্বামী আমাকে ভালোবাসেন। কিন্তু তিনি আমি ছাড়াও অন্য স্ত্রীলোকের দেহ উপভোগ করেছেন। আমি তা জানি। তিনি আমার রূপে মুগ্ধ হয়ে আমাকে বিয়ে করেছিলেন। সাধারণ মধ্যবিত্ত ঘরের একটি মেয়েকে তিনি সামাজিক প্রতিষ্ঠা, প্রাচুর্য, আরাম ও গৌরব দিয়েছেন। আমি ছাড়া তাঁর একদিনও চলে না। জীবনের প্রতিটি সমস্যার জন্যে আমাকে তাঁর প্রয়োজন। এত পাওয়ার পরিবর্তে আমি তাঁকে আমার দেহমনের সবটুকু দিয়ে পরিতৃপ্ত। তবু আমার মধ্যেকার নারী সব সময় তাঁকে রূপমুগ্ধ দেখতে চায়। কিছুদিন হল তিনি, হয়তো নানা কাজের চাপেই, কেমন একটু অন্যমনা। আমার ভয় হয়েছিল, আমার দেহের দাম বুঝি তাঁর কাছে আর নেই। আপনি আমাকে নতুন বিশ্বাস, নতুন আশা ও শক্তি দিয়েছেন। এজন্যেই এই আহুতিটুকুর ওপর আমার লোভ ছিল। আপনাকে সব খুলে বললাম যাতে আপনি নিজের কাছে লজ্জিত বোধ না করেন। আপনি আমার উপকার করেছেন। আমার বন্ধু আপনি।

তোমার স্বামী পরম ভাগ্যবান। তুমি সুন্দর।

ধন্যবাদ। এবার আমি যাই।

একটু হেসে দক্ষিণ হস্ত প্রসারিত করলেন সুলোচনা।

আরনেস্ট লংফেলো গ্রহণ করল সে নরম, পেলব, শাদা হাত। সুলোচনা চট করে হাত সরিয়ে নিলেন না। মৃদুকণ্ঠে বললেন, গুড নাইট, আরনেস্ট।

পরের দিন সকালে আরনেস্ট লংফেলো বিদায় নিল। শুকদেব মধ্যরাত্রে একটু বেশি মদ্যপান করে ফিরেছিলেন। সকালে দেহটা তেমন চাঙ্গা না থাকলেও সপরিবারে তাকে তুলে দিয়ে এলেন বিমানে। বিদায় দিলেন মুখর করমর্দনে। লংফেলো শীলার গালে ছোট্ট একটা চুমু দিল।

রমেশকে তুলে নিল দু'হাত দিয়ে। তারপর বিদায় নিল সুলোচনার কাছে।

বড় সুখে কাটিয়ে গেলাম অনেকগুলো দিন।

সুখ আমাদের।

দুঃখ আমার।

দুঃখও আমাদের।

মনে রেখো।

নিশ্চয়ই।

কী মনে রাখবে ?

দি ইম্‌পরটেন্‌স্ অব বীয়িং আরনেস্ট।

পাশ থেকে শুকদেব হেসে উঠলেন, বাঃ, বেশ বলেছ !

স্বামীকে নিয়ে সুলোচনার নতুন চিন্তা হয়েছে। মানুষটা কেমন যেন বদলে যাচ্ছে। প্রায় পঞ্চাশ বছর এখন তাঁর বয়স, চব্বিশ বছর ধরে তিনি তাঁর স্বামী। তাঁর সবকিছু সুলোচনা জানেন। তাঁর দেহের প্রতিটি অস্থি, মনের প্রতিটি কম্পন। তাঁর সব গুণ, সব দোষ। তাঁর বল, তাঁর দুর্বলতা। কিন্তু এই হালে, গত কয়েকটা বছরে, শুকদেব কেমন যেন হয়ে যাচ্ছেন। এ পরিবর্তনের সম্পূর্ণ পরিচয় সুলোচনার জানা নেই। তাই তাঁর ভাবনা।

মধ্যবিত্ত ঘরে সুলোচনার জন্ম। বাপ ছিলেন এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শনের অধ্যাপক। যা রোজগার করতেন একপাল নির্ভরহীন আত্মীয়পোষণে তার অর্ধেক ব্যয় হত। নিজে বাস করতেন এলাহাবাদে স্ত্রী, পুত্রকন্যাদের নিয়ে। পোষিত আত্মীয়েরা থাকতেন গ্রামের বাড়িতে। দর্শনে ডুবে থাকতেন তিনি। সুদর্শন ছিলেন, ছেলেমেয়েরাও সুন্দর হয়েছিল। তার মধ্যে সুলোচনা ছিল সবচেয়ে সুন্দর। এলাহাবাদে তাঁর সৌন্দর্য ছিল সবার জানা, সবার আলোচনা। শুকদেব দর্শনের কৃতী ছাত্র বলে অধ্যাপকদের বিশেষ স্নেহের পাত্র ছিলেন। ধনী ঘরের মেধাবী সন্তান। সমাজে দশজনের একজন। এম.এ. পরীক্ষায় প্রথম হয়ে চলে গেলেন বিলেতে। প্রথম ভর্তি হলেন অক্সফোর্ডে। সেখান থেকে ডিগ্রী নিয়ে বসলেন আই. সি. এস. পরীক্ষায়। উত্তীর্ণ হয়ে দেশে ফিরে এসে দেখা করতে এলেন প্রাক্তন অধ্যাপকের সঙ্গে। তখন তাঁর বয়স মাত্র চব্বিশ, আর সুলোচনার ষোলো। সবেমাত্র যৌবন এসেছে তার দেহে, এসেছে মহা-সমারোহে। শুকদেবের চোখে পূর্ণিমার চাঁদের মতো লাগল ষোলো বছরের সুলোচনাকে। কয়েক বছর পরে এলাহাবাদের কাছাকাছি

একটা শহরে তিনি এস. ডি. ও. হয়ে এলেন। মাঝে মাঝে আসতেন এলাহাবাদে। তখন সুলোচনার বয়স উনিশ। যৌবন এসে দানা বেঁধেছে তার দেহে ও মনে। সেবার সে বি. এ. পরীক্ষা দিয়েছে। শুকদেব তাঁর অধ্যাপকের কাছে সুলোচনার পাণিপ্রার্থনা করলেন। বলা বাহুল্য, প্রার্থনা মঞ্জুর হল। সুলোচনা দ্বিবেদী হল সুলোচনা শর্মা।

সে অনেক বছর আগেকার কথা। সেকালে আই. সি. এস-এর স্ত্রী হওয়া প্রায় রাজরাণী হবার মতো বিরাট ব্যাপার। সুলোচনা প্রাণ দিয়ে স্বামীর প্রয়োজনে নিজেকে তৈরি করতে লাগলেন। পদে পদে তাঁকে লড়তে হল নিজের সঙ্গে—তাঁর মধ্যবিত্ত মনের সংস্কার ও বিশ্বাসের সঙ্গে। পদে পদে তিনি জিতে চললেন।

মধ্যবিত্ত সংসারে থেকে তিনি মদ খাওয়াকে পাপ বলে জানতেন। স্বামীর মদ্যপানকে সভ্যতার স্বাক্ষর বলে মেনে নিলেন।

স্ত্রী-পুরুষ সম্পর্ক সম্বন্ধে তাঁর মনে দৃঢ়বদ্ধ মধ্যবিত্ত সংস্কার ছিল। স্বামীর অল্পবিস্তর পদস্খলনকে তিনি মেনে নিলেন সামাজিক প্রয়োজন বলে।

বাবা স্বদেশী না করলেও দেশভক্ত ছিলেন, আর সুলোচনা, দেশের অন্যান্য ছেলেমেয়েদের মতো, স্বদেশী করাকে গৌরব বলে বিশ্বাস করতেন। এখন ধীরে ধীরে স্বামীর স্বদেশীওয়ালাদের ওপর কঠোর শাসনকে তিনি দেশের মঙ্গল বলে গ্রহণ করলেন। তাঁরও বিশ্বাস হল, গান্ধীর চেলারা দেশটাকে রসাতলে নিয়ে যাচ্ছে এবং শুকদেব প্রমুখ ইংরেজ-প্রশংসিত রাজপুরুষরা দেশের শুভ-করার পর্বতপ্রমাণ বোঝা বহন করে বেড়াচ্ছেন।

সুদক্ষ শাসক হিসেবে শুকদেবের খ্যাতি বাড়তে লাগল ; ক্রমে ক্রমে তিনি জেলা ম্যাজিস্ট্রেট হলেন। তখন সুলোচনা প্রয়োজন হলে ইংরেজি কায়দায় নাচতে জানেন, ইংরেজি বলতে পারেন প্রায় এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান মেয়েদের মতো, টেনিস খেলেন সাহেবদের সঙ্গে, দু'চার সিপ বিশুদ্ধ পানীয় গ্রহণ করতে আপত্তি করেন না। মেয়ে ও ছেলেকে তিনি এমনভাবে মানুষ করতে লাগলেন যাতে একনজরে বোঝা যায় তারা সাধারণ নয়, তারা আই. সি. এস-এর সন্তান।

উনিশশো আটত্রিশে যুক্তপ্রদেশে যখন প্রথম কংগ্রেস সরকার হল, শুকদেব শর্মা ও সুলোচনা দুজনেই ভয়ানক ঘাবড়ে গেলেন। এমন আসন্ন সর্বনাশের স্বপ্নও তাঁরা দেখেন নি। ইংরেজদের বুদ্ধি ও বিবেচনায় তাঁদের অচলায়তন

বিশ্বাস টলে উঠল। কিন্তু বিধাতা ছিলেন প্রসন্ন। সুদক্ষ শুকদেবের ডাক পড়ল গভর্নরের খাস কামরায়। নিযুক্ত হলেন তাঁর প্রাইভেট সেক্রেটারী। বেঁচে গেলেন স্বামী-স্ত্রী দুজনে। কাল যাদের ধরে জেলে পুরেছেন, মানুষ বলে মানবার কোন কারণ খুঁজে পান নি, আজ তাদেরই কাছে 'জী হুজুর' করতে হবে এত বড় লাঞ্ছনা শুকদেব শর্মা সইতে পারতেন না। তাছাড়া, এরা কি ইংরেজি জানে, এই কংগ্রেসী মন্ত্রীরা! কী ভাষা! কী উচ্চারণ! ভাগ্যিস তাঁকে গভর্নরের খাস দপ্তরে কাজ করতে হল! আই. সি. এস. সহকর্মিদের জন্যে গভীর ব্যথা অনুভব করলেন শুকদেব শর্মা। বেচারাদের কি দুর্গতি! কিন্তু ভাগ্য ভালো, এ দুর্গতি বেশিদিন রইল না। যুদ্ধ বাধার সঙ্গে সঙ্গে কংগ্রেস মন্ত্রীত্ব ছাড়ল। ফিরে এল ইংরেজদের রাজত্ব। শুকদেবরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। গভর্নরকে অযাচিত পরামর্শ দিলেন, এমন আহাম্মুকী কাজ আর কখনো করবেন না। আমরা সব সইতে পারি, কিন্তু ইংরেজ কংগ্রেসকে ভয় পেয়ে রাজ্য ছেড়ে দিচ্ছে, এতটা সইতে পারব না। সে-বছর শুকদেব শর্মা ও. বি. ই. হলেন।

যুদ্ধের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ইংরেজের যুদ্ধজয়ে ঐকান্তিক পরিশ্রমের পুরস্কারে শুকদেব শর্মার আরও পদোন্নতি হল। তারপর একদিন হঠাৎ ঝড়ের হাওয়ায় সবকিছু বদলে গেল। শুকদেব শর্মাদের তাজ্জব বানিয়ে ইংরেজ ভারতত্যাগে তৈরি হল। একবার ভেবে দেখল না কোথায় কী অবস্থায় ফেলে যাচ্ছে ইস্পাত-কাঠামো স্তম্ভগুলিকে, যাদের পুরু চামড়ার চওড়া ঘাড়ে এত বছর সাম্রাজ্যের ভার শান্তিতে বিশ্রাম করেছে। শুকদেব শর্মা এখন ভয়ংকর আতংকিত হলেন দেশের ও নিজের কথা ভেবে। পরামর্শ চলল সহকর্মিদের দিনের পর দিন। একবার ভাবলেন, এ-চাকরি ছেড়ে কোন বিলেতী কোম্পানীতে চাকরি করবেন। কিন্তু যে-হিড়িকে বিলেতী কোম্পানী একের পর এক বিক্রি হয়ে যাচ্ছে, তা দেখে আর ওদিকে গেলেন না। অগত্যা উপদেশের জন্যে হাজির হলেন গভর্নরের খাস কামরায়।

ইংরেজিতে যা নিবেদন করলেন, বাংলায় তা এই দাঁড়ায় : প্রভু, আপনারা কী করলেন? বিশ্বযুদ্ধে জয়লাভ করে শেষে ঐ গান্ধীর কাছে হার মানলেন!

গভর্নর শুকদেবকে বুঝিয়ে বললেন, চিরদিনের জন্যে শাসন করব এ উদ্দেশ্য নিয়ে কোনদিন ইংরেজ ভারতে আসে নি; সেই যে ওয়ারেন হেষ্টিংস, যার নিন্দায় তোমরা পঞ্চমুখ, তিনি পর্যন্ত ভাবেন নি ইংরেজ-সাম্রাজ্য চিরস্থায়ী

হবে। আমাদের চিরদিনকার উদ্দেশ্য ছিল ভারতকে স্বাধীনতার উপযুক্ত করে তুলব। এই হচ্ছে পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার প্রাচ্যে প্রধান মিশন। আজ সে-শুভদিন উপস্থিত। চরম বিজয়ের মুহূর্তে ইংরেজদের এই পরম আত্মত্যাগ মানুষের মহত্ত্বের নতুন নিদর্শন হোক। শুধু আমাদের দুঃখ ভারতবাসী নিজেদের মধ্যে একত্র হতে পারল না—দেশটাকে ভাগ করতে হল।

গভীর হতাশার সঙ্গে শুকদেব শর্মা সেই প্রায় দশ-মিনিটব্যাপী ভাষণ শুনলেন। তারপর আর্তনাদ করে উঠলেন, আমাদের কী হবে? কংগ্রেসী আমলে আমাদের স্থান কোথায়?

কেন? আশ্বাস দিলেন লাটসাহেবঃ আপনারা যেমন আছেন তেমনি থাকবেন। সুদক্ষ শাসক ছাড়া পণ্ডিত নেহেরু শাসন চালাবেন কী করে?

কিন্তু আপনি জানেন বিয়াল্লিশের বিপ্লবীদের দমন করতে আমি কী করেছি আর করি নি। এখন যদি ওঁরা হিসেব মেলাতে বসেন!

গভর্নর বললেন, তিনি মনে করেন না, তেমন হিসেবনিকেশ মহাত্মা গান্ধী বেঁচে থাকতে হতে পারবে। তাছাড়া, সিভিল সার্ভিসের ধর্ম হচ্ছে ঐকান্তিকতার সঙ্গে সরকারি নীতি পালন করে যাওয়া। তিনি বলে চললেনঃ যে দক্ষতা ও আনুগত্যের সঙ্গে তুমি এতদিন এক সরকারের নীতি চালু করেছ সেই একই দক্ষতা ও আনুগত্যের সঙ্গে নতুন সরকারের নীতি পালন করবে। আমাদের গর্ব যে আমরা এত উন্নতমানের সুগঠিত, সুশিক্ষিত একটা মহান সিভিল সার্ভিস পেছনে রেখে যেতে পারছি।

গভীর অন্ধকার থেকে সামান্য আলোয় যেন ফিরে এলেন শুকদেব শর্মা। এ না হলে ইংরেজ! যত অন্ধকারেই ঠেলে দাও না তুমি, ঠিক ওরা আলোর সন্ধান পাবে। ঠিক বেরিয়ে আসবে যে-কোন ব্যূহের মাঝ থেকে! এই হল ওদের শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ। হঠাৎ রাতারাতি কেমন ভারতবন্ধু হয়ে গেছেন গভর্নর সাহেব, সেই দুর্ধর্ষ সাম্রাজ্যবাদী স্যার জন ব্যারেট! এই তো সেদিনও বলতেন গ্যাণ্ডী, বা একটু মেজাজ খারাপ থাকলে, 'ড্যাট ফেলা গ্যাণ্ডী', আর আজ কেমন বিগলিত শ্রদ্ধায় বার বার বললেন, 'মহাট্‌মা গাণ্ডী'! নেহেরুকে বললেন, 'পণ্ডিটজী'! হঠাৎ শুকদেবের মনে পড়ে গেল অনেক ফাইলে তিনি নিজের হাতে লিখেছেন, 'মিঃ গান্ধী', বা শুধুই 'গান্ধী'—দু'-একবার কি লেখেন নি 'দিস্ ম্যান্ গান্ধী'? হৃৎপিণ্ডের কম্পন একটু বেড়ে গেল। ওসব ফাইলগুলো খুঁজে বের করে নষ্ট করতে হবে। গভর্নরের কথাগুলো

মনে করে ভরসা পেলেন শুকদেব। সবকিছু শেষ হয়নি তাহলে! আশা আছে।

শুকদেব শর্মা বাড়ি ফিরে এসে সুলোচনাকে বললেন, তাঁবু তুলতে হবে।

তার মানে বদলি হলে নাকি?

না, না। ইংরেজ তাঁবু তুলেছে। তাতে কাবু হলে চলবে না। এতদিন সাহেব ছিলাম। এখন বাবু হতে হবে।

হতভম্ব বিস্ময়ে তাকিয়ে রইলেন সুলোচনা।

তোমারও আর মেমসাহেব থাকা চলবে না। এবার মাঈজী হতে হবে।

সুলোচনার চিকন নাসিকা কুঞ্চিত হল।

শুকদেব শর্মা এগিয়ে এসে স্ত্রীর কাঁধে হাত রাখলেন।

মনে আছে সেই পুরোনো দিনের কথা? মধ্যবিত্ত স্বদেশী-ঘেঁষা ঘরের মেয়ে তুমি আমার স্ত্রী হয়ে কত সহজে নিজেকে মেমসাহেব করে নিয়েছিলে! এবার আবার ফিরে যেতে হবে তোমায় সেই বাপের-বাড়ির পুরোনো জীবনে।

হঠাৎ সুলোচনা মনে করতে পারলেন না কোন্ সুলোচনার কথা বলছেন শুকদেব শর্মা। তারপব চোখের সামনে দূবাগত ছায়ার মতো বিস্মৃত-প্রায় ছবি ভেসে উঠল। একটু হেসে বললেন, সে কী করে হবে?

কী করে হবে মানে? হতেই হবে! ইংরেজ সাম্রাজ্য ছাড়তে পারে আর আমবা সাহেবিয়ানা ছাড়তে পারবো না? স্যার জন ব্যারেট মহাত্মা গান্ধী বলতে পারেন আর আমি বাপুজী বলতে পারবো না? আলবৎ পারবো। পারতেই হবে।

সুলোচনা বুঝলেন। এবং তিনি যে বুঝলেন তার পরিচয় ক'দিন পরেই পাওয়া গেল। লক্ষ্ণৌর অভিজাত-সমাজকে অবাক্ করে গভর্নরের জন্মতিথির পার্টিতে সুলোচনা শর্মা এসে হাজির হলেন মিহি খদ্দরের পদ্মরং শাড়ি পরে। সবাই কেমন যেন হকচকিয়ে গেল। শাড়ির সঙ্গে সুলোচনার দুধে-আলতা রং যেন রাখি বেঁধেছে। সবুজ পাড়ের সঙ্গে সবুজ রঙের খদ্দরের ব্লাউজ ঢেকে রেখেছে ঘাড় ও সবটুকু বুক। একটা অসহ্য, দুঃসাহসী শালীনতা। সুলোচনা শর্মা ঠোঁটে রং মাখেন নি, হাতে বা গলায় পরেন নি জড়োয়া অলঙ্কার। গলায় ঝুলছে শুধু একছড়া মুক্তোর হার, দু'হাতে দুটি বালা। এমনকি গভর্নর ও লেডী ব্যারেট পর্যন্ত বিস্ময়ে তাকিয়ে রইলেন।

লেডী ব্যারেট সুলোচনাকে বললেন, এ কী সুলোচনা, তুমি কি কংগ্রেসী হলে! আমরা চলে যাবার আগেই?

সুলোচনা হেসে জবাব দিলেন, হিস্ এক্সেলেন্সী শুকদেবকে কী মহামূল্য উপদেশ দিয়েছেন! শুকদেবের ইচ্ছে আছে, কিন্তু সাহস নেই! তাই আমিই দেখিয়ে দিলাম কেমন করে পরিবর্তনকে গ্রহণ করতে হয়।

এই হল সুলোচনার স্বভাব। তাঁর মধ্যে কোন ঢাক-ঢাক নেই। বাস্তবমুখী মন তাঁর স্বচ্ছ, সহজ। যা ভাবেন তিনি সোজা বলেন। যা ভাবেন না, বলেন না।

ক'দিন পরে শুকদেব শর্মা নিজেই পরিবর্তন-যুদ্ধের সেনাপতি হলেন।

'মতিলাল নেহেরু' শীর্ষক তাঁর একটি প্রবন্ধ লক্ষ্ণৌর সেরা সংবাদপত্রে এক স্মরণীয় সকালে আত্মপ্রকাশ করল। সবাই বিস্মিত চোখে দেখতে পেল রচয়িতার নামঃ শুকদেব শর্মা আই. সি. এস.। সযত্নে সংগৃহীত কয়েকটি বিশেষণে প্রবন্ধকার মতিলালের কথা বলতে গিয়ে জীবিত দেশনেতাদেরও মনোরোচক প্রশস্তি করেছেন। অচিরে মতিলালের সুযোগ্য সন্তান জবাহরলাল নেহেরু যে ভারতভাগ্যের কর্ণধার হবেন তারও তিনি উল্লেখ করেছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে একথা জানাতে ভুলে যান নি যে ভারতের এই নবজন্মের দিনে প্রত্যেক ভারতবাসীকে তার সাধ্য ও যোগ্যতামতো কাজ করবার সুযোগ দেওয়া সমীচীন। প্রবন্ধের শেষ অংশে শুকদেব শর্মা সুকৌশলে একটু আত্মকথা মিশিয়ে দিলেনঃ যে মহান দিন সমাগত, তাকে বাস্তব করতে যাঁরা প্রত্যক্ষ অংশ গ্রহণ করেন নি তাঁদের মনেও আজ অগ্নিশিখার ঝলক পড়েছে। মহাকবি মিল্টন বলেছেন, যারা দাঁড়িয়ে শুধু দেখে, তারাও সেবক। নতুন ভারত গড়তে হলে ইংরেজ আমলের সুদক্ষ সিভিল সার্ভিসের প্রয়োজন। সিভিল সার্ভেন্টের জীবনদর্শন ভাগবদ্গীতার উদাত্ত শ্লোকগুলিতে বর্ণিত হয়েছে। সে তার কর্তব্য করে যায়, ফলাফলের বিচার না করে। অনেক কিছু তাকে করতে হয় যার জন্যে তার অন্তরের আত্মা নীরবে কাঁদে। হয়তো সমস্ত বিনিদ্র রাত্রি তাকে বিবেকের জ্বালায় জ্বলেপুড়ে মরতে হয়। কর্তব্যে তবু সে কঠোর, নির্ভীক। ইংরেজ সরকারের কর্মচারী হিসেবে যে-আন্তরিকতার সঙ্গে বৃটিশ নীতি সে চালু করেছে, স্বাধীন ভারতের উদার সরকারী নীতিও তেমনি আন্তরিকতার সঙ্গে সে সক্রিয় করবে। সিভিল সার্ভেন্ট রাজনীতি করে না, শাসন করে।

সরকারি নিয়ম অনুসারে এ-ধরনের প্রবন্ধ লেখা শুকদেব শর্মার অধিকারের বাইরে। গভর্নর তাঁকে স্নেহ করতেন। অনুমতি চাইলে শুকদেব শর্মা হয়তো পেয়ে যেতেন। বুদ্ধিমান স্যার জন ব্যারেট বুঝতেন। কিন্তু ইচ্ছে করে শুকদেব শর্মা অনুমতি চান নি। স্যার জন রুষ্ট হলেন।

গভর্নরের খাস দপ্তরে তলব পড়ল শুকদেব শর্মার। গভর্নর আর একবার বিস্মিত হলেন। এ আর সেই শুকদেব শর্মা নয়!

আপনার প্রবন্ধটা পড়লাম।

আমার সৌভাগ্য।

কিন্তু আপনি জানেন এ-ধরনের প্রবন্ধ লেখা আপনার উচিত হয় নি। অন্তত আমার অনুমতি নেওয়া উচিত ছিল আপনার।

আমি যা করেছি ভেবেচিন্তেই করেছি।

আপনি সরকারি নীতি লঙ্ঘন করেছেন।

আমি তা মনে করি নে।

আপনি কী মনে করেন সেটা বড় কথা নয়। আমি তাই মনে করি।

ইওর এক্সেলেন্সি, সময়ের পরিবর্তন হয়েছে। আপনি যে-সরকারি নীতির কথা বলছেন সে-সরকারই তল্পি গোটাচ্ছেন। আমাদের কথা এক-মুহূর্তের জন্যে আপনাদের মনে হয় নি। আমরা সারাজীবন ধরে আপনাদের সেবা করেছি। আজ যাবার সময় বড় বড় কথা ছাড়া আমাদের আপনারা কিছুই দিয়ে যাচ্ছে না।

আমরা আপনাদের চাকরির অধিকার পুরোপুরি পাকাপোক্ত করে যাচ্ছি। আপনারা এখন যা আছেন, পরেও তাই থাকবেন।

ওখানেই তো আপনার ভুল। আপনারা যাদের অধিকার পাকা করে যাচ্ছেন তারা হচ্ছে ইংরেজ আই. সি. এস.। তারা কয়েক লাখ টাকা নিয়ে রিটায়ার করে দেশে গিয়ে নতুন জীবন শুরু করতে পারবে। কিন্তু আমরা? আমাদের থাকতে হবে এ দেশেই: এখানেই আমাদের সবকিছু। আমরা পদত্যাগ করে যাবো কোথায়? কে আমাদের চাকরি দেবে? এই কংগ্রেসী নেতারা মন্ত্রীদের মাইনে করবে পাঁচশো, আমাদের দেবে হয়তো চারশো, বড় জোর হাজার পর্যন্ত তা গড়াবে। আজ আপনারা যা বলবেন তাই মেনে নেবে। তারপর আস্তে আস্তে বের করবে গোপন দাঁত আর নখ! এক হাজার! আমার চাকর-খানসামা-ড্রাইভার-বেয়ারার মাইনে দিতেই হাজার টাকা লাগে। আর টাকার

কথা নয় বাদই দিন। আমরা সারাজীবন ধরে কংগ্রেসীদের ধরেছি, মেরেছি, জেলে পুরেছি। তার স্মৃতি কি এত সহজে ওদের মন থেকে মিলিয়ে যাবে? আপনারা কি আসবেন আমাদের বাঁচাতে ক্রুদ্ধ জনতার বর্বর প্রতিশোধ থেকে? নিজে বাঁচলে বাপের নাম। তাই মুমূর্ষু সরকারের ওসব নিয়মকানুন এখন ভুলে যান। আমাদের একটু বাঁচবার পথ করতে দিন।

গভর্নর আর কথা বাড়ালেন না। তাঁর নিজের মনেও গভীর ক্ষোভ ছিল এই সাম্রাজ্য ত্যাগ নিয়ে। যুদ্ধের নিদারুণ দুর্দিনেও চার্চিল একতিল সাম্রাজ্য-ভূমি বিনা যুদ্ধে ছাড়তে রাজী হন নি। কী কঠোর দৃঢ়তার সঙ্গেই না তিনি রুজভেল্টের ভারত-নীতির বিরোধিতা করেছেন! মনে পড়ে সেই তাঁর উদাত্ত ঘোষণা। হোয়াইট হাউস্ থেকে রুজভেল্ট চিঠি পাঠিয়েছেন ভারতে রাজনৈতিক উদারনীতির ওকালতী করে। রাত্রে সে-চিঠি পড়েছেন উইনস্টন চার্চিল। পরের দিন পার্লামেণ্টে প্রশ্ন হল ভারত সম্পর্কে। আস্তে উঠে দাঁড়ালেন প্রধান মন্ত্রী চার্চিল। ঘোষণা করলেন, সাম্রাজ্য বিসর্জন দিতে আমি প্রধানমন্ত্রী হই নি। করতালিতে কেঁপে উঠল হাউস্ অব কমন্‌স্। লেবার-মন্ত্রীরা চুপ করে রইলেন। বুক ফুলে উঠল ভারতে হাজার হাজার ইংরেজ শাসকের। মনে আছে, স্যার জন বেতারে খবর শুনেই ভাইসরয়কে চিঠি লিখেছিলেন: প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা শুনে আশ্বস্ত হলাম। ভারতে আমাদের মহান্ কর্তব্য এখনো শেষ হয় নি। এ-কর্তব্য মাঝপথে অসমাপ্ত রেখে যাওয়ার কথা আমি ভারতেও পারি নে।

কিন্তু কী করে কী হয়ে গেল, সর্বনাশা দুর্বুদ্ধি পেয়ে বসল বৃটেনের মানুষদের, যাদের, তাঁর জাতভাই হলে কী হবে, স্যার জন ব্যারেট আর যেন চেনেন না। অমন যে বিরাট পুরুষ, ইংলণ্ডের রিক্ত দিনে যিনি জাতিকে অভাবিত ঐশ্বর্যের সন্ধান দিয়েছিলেন, যাঁর জন্যে আজ ইংলণ্ড বেঁচে আছে, যুদ্ধজয়ের পরের মুহূর্তে দেশবাসীরা তাঁকে এমন নিষ্ঠুরতার সঙ্গে বনে পাঠাল! ক্ষমতা পেল লেবার পার্টি। সর্বপ্রথম বিরাট স্বকীয় সংখ্যাগরিষ্ঠতায় বলিষ্ঠ। সারাজীবন যাদের কেটেছে ছাত্র পড়িয়ে, বই আর প্রবন্ধ লিখে, আর নয়তো, ভুলপথে শ্রমিকদের নেতৃত্ব করে আর সর্বনাশা আধপাকা বিপ্লবী মতবাদ প্রচারে, তারাই সত্যি-সত্যি শেষ পর্যন্ত পেয়ে বসল এত বড় সাম্রাজ্যের কর্তৃত্ব? ভারতবর্ষ সম্বন্ধে কী-ই বা জানে এই শ্রমিক-নেতারা! যাদের ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়াবার সময় ও সামর্থ্য ছিল, কিছু-একটা অভিনব বলে বা

করে জনদৃষ্টি আকর্ষণ করতে যারা মরিয়া হয়ে উঠত, যাদের কথা বিলেতের লোকেরা এক কান দিয়ে শুনত এবং মোটেই মনে রাখত না, যাদের একমাত্র ব্যবহারিক প্রয়োজনীয়তা ছিল বাইরের পৃথিবীকে জানাতে যে বৃটেনে সাম্রাজ্যের সমালোচনা গণতান্ত্রিক অধিকারে প্রতিষ্ঠিত, তারাই শুধু কালে-অকালে তথাকথিত ভারতবন্ধুর ভূমিকা গ্রহণ করত। আসলে ভারতবন্ধু ছিলেন কর্নওয়ালিস, ডালহৌসী, কার্জন, হার্ডিঞ্জ। কিন্তু আজ ঐ আধপাকা, পুঁথি-সর্বস্ব, সেন্টিমেণ্টাল শ্রমিক-নেতারা বৃটেনের শাসক। সাম্রাজ্য যে এবার যাবে তাতে আর আশ্চর্য কী! ওরা তো গড়ে নি এই বিরাট গৌরবসৌধ! ওরা এর খারাপ দিকটাই দেখেছে, এর মহান দিকটা ওদের চোখে পড়ে নি।

শুকদেব শর্মার দিকে তাকিয়ে স্যার জন ব্যারেটের করুণা হল। সত্যিই এরা আমাদের জন্যে করেছে, তিনি নিজেকে বোঝালেন। দূরদর্শী মেকলে বহুদিন আগে শুকদেব শর্মাদের চেহারা দেখতে পেয়েছিলেন। প্রাচ্যের তথাকথিত ঐতিহ্যের প্রতি তাঁর বিদ্রূপাত্মক আক্রমণে কিছু কিছু ভারতবাসী রুষ্ট হয়েছিল; কিন্তু মেকলে যা বলেছিলেন তা সত্যি। সত্যি না হলে ইংরেজি-শিক্ষা এমন করে এদেশে শিকড় মেলে বসত না। একশ-সওয়াশ বছরে এদেশটা ইংরেজির তাপে কী ভয়ানক বদলে গেছে! এরা এখন এমন ইংরেজি বলে আর লেখে যা স্যার জন ব্যারেটকেও মাঝে মাঝে তাজ্জব করে দেয়। আর এই যে বসে আছে লোকটা, কী অক্লান্ত আয়াসেই না এ নিজেকে সাহেব বানিয়েছে! এর কথাবার্তায়, আচার-ব্যবহারে, চাল-চলনে, গৃহসজ্জায়, পোষাকে, আহারে—কোথাও ভারতীয়ের চিহ্নমাত্র নেই। আছে শুধু গায়ের চামড়া, যার রং বদলায় না; আর মন, যার রং ওপরে বদলালেও ভেতরে কেমন করে যেন সাবেকি থেকে যায়। শুধু নিজেকেই নয়, স্ত্রী-পুত্র-কন্যাকেও এই মানুষটা বিদেশী ছাঁচে ঢেলে সেজেছে। আজ হঠাৎ এর পায়ের নিচে থেকে মাটি সরে যাচ্ছে। যে-পৃথিবী নিজের চারিদিকে এ গড়ে তুলেছিল তা ধসে যেতে বসেছে। সত্যিই তো, আমরা এদের বলতে গেলে, শত্রুর মুখে ছেড়ে দিয়ে যাচ্ছি। গান্ধী মানুষটা অহিংসা, প্রেম, সহযোগিতা ইত্যাদি অনেক বড় বড় কথাই বলে বটে, কিন্তু আমি ওকে কোনদিন বুঝতে পারি নি, চিরদিন সন্দেহের চোখে দেখে এসেছি। মুসলমানদের সঙ্গে যে কাটাকাটি শুরু হয়েছে তাতেই গান্ধীর অহিংসা কবরে যাবে! কিন্তু তাতে শুকদেব শর্মাদের তো লাভই হল।

সাম্প্রদায়িক তিক্ততা যেমন ইংরেজকে হঠাৎ প্রিয় করেছে, তেমনি মানুষের মনোযোগ তুলে নিয়েছে অনেক নিকটতম বস্তু থেকে, শুকদেব শর্মারা যার মধ্যে একটা।

শুকদেব শর্মার সঙ্গে অনেকাংশে নিজের মিল দেখতে পেলেন স্যার জন ব্যারেট। তোমার মতো আমিও কক্ষচ্যুত। এ-দেশে বিশ বছর থেকে আমি আর ইংরেজ নই। আমি হচ্ছি, যাকে বলে, "নবব"। এ-দেশের রোদ, বৃষ্টি, বিরাট উন্মুক্ত আকাশ, খাদ্য-পানীয়, আচার-ব্যবহার, অপরিমেয় শারীরিক আরাম আর সীমাহীন ক্ষমতায়, নিজেদের এত সযত্নে দূরে রেখেও, আমরা প্রভাব এড়াতে পারি নি। দেশে ফিরে গিয়ে আমরাও হব গৃহহীন, দেশহীন, সমাজহীন। এ আরাম থাকবে না, এ ক্ষমতা থাকবে না, এই নবাবী থাকবে না; অথচ এতদিনকার স্বভাবপুষ্ট দেহমন নিয়ে আমরাই বা বাঁচব কেমন করে? সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত পেসেন্স খেলবো, আর ক্লাবে গিয়ে দেয়ালের সঙ্গে বকবক করবো! লুসি—লেডী ব্যারেট—বোধ হয় বাঁচবেই না। সর্বনাশের সর্বনাশ, লেবার সরকার ইংলণ্ডকে 'সমাজতান্ত্রিক' করে তুলেছে। সে কিম্ভূত তরীতে আমাদের স্থান কোথায়?

গভর্নর শুকদেব শর্মার প্রবন্ধ-ব্যাপারটায় আর এগোলেন না। শুধু বললেন: শুকদেব, তোমাকে অত্যন্ত স্নেহ করি। তোমার সমস্যা আমি বুঝতে পারছি! কিন্তু, যাই করো, আমার কথাটাও ভেবো। আমাকেও জবাবদিহি করতে হয় এমন লোক অনেক আছে। তোমার প্রবন্ধ নিয়ে দিল্লী থেকে প্রশ্ন আসবেই। আমাকে তার একটা জবাবও দিতে হবে। এ-যাত্রা আমি তোমাকে বাঁচিয়ে লিখব। কিন্তু বার বার পারব না।

শুকদেব শর্মার প্রবন্ধ নিয়ে শহরে বেশ একটু চাঞ্চল্য দেখা গেল। দু'-একটা সংবাদপত্রে সম্পাদকীয় মন্তব্যে প্রবন্ধ থেকে উপযুক্ত উদ্ধৃতি দিয়ে আসন্ন স্বাধীনতার যুগে সিভিলিয়নদের পরিবর্তিত মনোভাবের পরিচয় পর্যন্ত দেওয়া হল।

তারপর দিল্লীতে যখন অন্তর্বর্তী সরকার স্থাপিত হল, শুকদেব শর্মার ডাক পড়ল রাজধানীর কেন্দ্রীয় দপ্তরে। দেশবিভাগের আয়োজন সম্পূর্ণ করবার জন্যে যেসব পার্টিশন কমিটি বসানো হল তার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ একটির সেক্রেটারী হলেন শুকদেব শর্মা। ইংরেজ-আমলে শুকদেব শর্মার মুসলমান-প্রীতি সুবিদিত ছিল। লক্ষ্ণৌর অনেক অভিজাত মুসলমান-পরিবারের সঙ্গে

তাঁর অন্তরঙ্গতা সবাই জানত এবং এক একদা-শাহী পরিবারের জনৈকা বেগমের সঙ্গে একটু অতিরিক্ত অন্তরঙ্গতা করে শুকদেব শর্মা কিছুদিনের জন্যে সামাজিক পরিবেশে কিছুটা মুখরোচক আলোচনার খোরাকও যুগিয়েছিলেন। কিন্তু এবার পার্টিশন কমিটিতে তাঁর নতুন চেহারা দেখে সকলে বিস্মিত হল। বাঁটোয়ারার আলোচনায় প্রস্তাবিত পাকিস্তান রাষ্ট্রের হাতে বিন্দুমাত্র সম্পদ্ তিনি বিনা যুদ্ধে ছাড়তে রাজী হলেন না। প্রতিপক্ষ তাঁর যুক্তির বহর দেখে স্তম্ভিত হলেন, আর কংগ্রেসী মহল হলেন খুশী। যেখানে পাকিস্তানের দাবি পুরোপুরি ন্যায্য, সেখানেও শুকদেব শর্মা প্রতিপদে প্রবল বাধা দিতে লাগলেন। তাঁর আহার, নিদ্রা, বিশ্রাম সব গেল। সকাল থেকে মধ্যরাত্রি পর্যন্ত একটানা খাটতে লাগলেন দিনের পর দিন। মন্ত্রীরা যেখানে ছেড়ে দিতে রাজী, শুকদেব শর্মা সেখানেও যুক্তির প্রতিরোধ সৃষ্টি করলেন। দিল্লীর সরকারী মহলে সুদক্ষ, পরিশ্রমী ও দেশদরদী বলে শুকদেব শর্মা কয়েক মাসেই প্রতিষ্ঠা অর্জন করলেন।

সেই থেকে এখন পর্যন্ত স্বাধীন ভারতবর্ষে শুকদেব শর্মার প্রতিষ্ঠা বেড়ে চলেছে। প্রথম প্রথম মন্ত্রীদের সম্বন্ধে তাঁর মনোভাবটা ছিল ভয় ও তাচ্ছিল্যের মিশ্রণ। ভয় ছিল এই ভেবে যে, ওসব আদর্শবাদী মানুষগুলো বুঝি পুরাতনের সঙ্গে সব সম্পর্ক একটানে ছিঁড়ে ফেলবেন; বুঝি নীতি-বাগীশ পথে চলতে গিয়ে ব্যবহারিক বুদ্ধির প্রয়োজনীয়তা একেবারে বুঝবেন না। তাচ্ছিল্য করতেন এই ভেবে যে ওঁরা কতটুকু বা জানবেন ও বুঝবেন বর্তমান জগতের জটিল দেশশাসনের নিষ্ঠুর, বাস্তব সমস্যা! শেষ পর্যন্ত নির্ভর করতেই হবে সিভিলিয়নদের ওপর।

অল্পদিনের মধ্যে তিনি মন্ত্রীদের সম্বন্ধে একটা স্বকীয় ধারণা গঠন করলেন। বুঝে নিলেন: মন্ত্রীদের সদিচ্ছার অভাব নেই, আদর্শবাদও আছে, কিন্তু তাঁরা এদেশের মানুষ, এদেশের সবটুকু দুর্বলতাও আছে তাঁদের মধ্যে। তাঁরা যত গর্জেন, বর্ষেন তার অনেক কম। তাঁরা আদর্শকে কাজে পরিণত করবার কোন দৃঢ় উপায়ের সন্ধান জানেন না। তাঁদের বিদ্যার অনেকখানিই বই-পড়া, এবং তাও ভালো করে পড়া নয়। তাঁরা স্তুতিবাদ করেন, প্রশংসায় বিগলিত হন এবং সর্বদা বুঝতে চান যে দেশের মানুষের তাঁদের ছাড়া একমুহূর্ত চলে না। তাঁরা কাজের চেয়ে কথা বেশি ভালোবাসেন, বক্তৃতা করার মতো প্রিয়বস্তু তাঁদের কাছে আর কিছু নেই, এবং একবার

কইতে শুরু করলে সহজে থামেন না। দেশনেতা হলেও তাঁদের মনে আঞ্চলিকতা শিকড় গেড়ে আছে। তাঁরা নিজের গ্রাম, নিজের জেলা, নিজের প্রদেশ, নিজের দল এবং সর্বোপরি নিজের আত্মীয়-বন্ধুর উপকার করবার দায়িত্ব এড়াতে পারেন না। তাঁদের তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও বিচারশক্তির অভাব নেই, কিন্তু অভাব আছে বাস্তব জ্ঞানের আর আদর্শের পেছনে লেগে থাকার কঠিন ধৈর্যের। আর, সবচেয়ে যেটা দেখে শুকদেব শর্মা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন, তা হচ্ছে এঁরা ঘৃণা করেন না, এঁদের রাগ নেই। আগে মনে হয়েছিল ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে সারাজীবন লড়তে গিয়ে এঁরা নিশ্চয় পুরোনো ব্যবস্থার প্রতি ভয়ানক ঘৃণা আর রাগের পাহাড় অন্তরে বহন করছেন। হয়তো চোরাকারবারী দেখলেই এঁরা রাগে কাঁপবেন, ঘৃণায় এঁদের মুখ বিকৃত হবে। হয়তো সামাজিক ও নৈতিক অন্যায়ের ওপর ভয়ানক রাগ আর ঘৃণা দেখাবেন। কিন্তু শুকদেব শর্মা দেখতে পেলেন এঁদের রাগ বা ঘৃণা কম। সবকিছুই জানেন, বোঝেন। জানেন, পৃথিবীটা ভগবদ্গীতার নীতিতে চলে না। চলে নিজের নীতিতে। জীবনের পাতায় পাতায় অলিখিত নিয়ম রয়েছে। তার নির্দেশ কঠিন, তাকে মানতে হবে।

এ-জ্ঞান শুকদেব শর্মার একদিনে হয় নি। একসূত্রে আসে নি। এই কয়েক বছরে ভারতের নবজীবনের সবগুলি পাতাই তিনি দেখেছেন। দেখেছেন সেই ১৯৪৭ সালের ১৪ই আগস্টের মধ্যরাত্রি, সমস্ত পৃথিবী যখন নিদ্রামগ্ন, ভারত তখন জেগে উঠল নতুন জীবনের আলোকে। শুকদেব শর্মা, আরও অনেক সহকর্মীদের সঙ্গে, কনষ্টিটিউয়েণ্ট অ্যাসেম্বলীর সেই ঐতিহাসিক অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন নির্দিষ্ট আসনে। ঘড়িতে বারোটা বাজতেই ভারত-সিংহের জাগরণ ঘোষণা করে একুশ-তোপ গর্জে উঠল। আর সেই আলোক-শোভিত মধ্যরাত্রির অধিবেশনে উঠে দাঁড়ালেন একটি ছোট মানুষ, তামাটে দেহের বর্ণ, পরিধানে শুভ্র চুড়িদার আচকান, মাথায় গান্ধীটুপি, বুকের ওপর জ্বলন্ত একটি রক্তগোলাপ।

সমস্ত পরিবেশটা শুকদেব শর্মার কাছে স্বপ্নময় মনে হয়েছিল। তাঁর স্ত্রী দুটি সন্তানের জন্ম দিয়েছেন, একবারও কাছে থেকে তিনি নবজন্ম প্রত্যক্ষ করেন নি। শুধু তিনি জানেন প্রসূতি কাতর চীৎকার করে অসহ্য ব্যথায়, আর তাকে প্রায় মৃত্যুর দ্বারে পাঠিয়ে তবে জন্ম নেয় নবীন জীবন। একটা জাতি, একটা দেশ কেমন করে নবজন্ম পায় কোনদিন জানা ছিল না শুকদেব

শর্মার। ভারতবর্ষের মতো এত প্রাচীন দেশ, যে মরে গেছে না বেঁচে আছে তাই কোনদিন ভেবে দেখেন নি শুকদেব শর্মা, আজ সে হঠাৎ কীসের বলে, কোন্ অচেনা অজানা জীয়ন-কাঠির স্পর্শে নতুন প্রাণে জেগে উঠছে? দীর্ঘদিন, বছরের পর বছর, বিদেশী শাসকদের উদার পবিরক্ষণের অন্তরাল থেকে তিনি দেখতে পেয়েছেন দলের পর দল ভারতবাসী স্বাধীনতার পতাকা তুলে স্বেচ্ছায় দলিত হয়েছে; নিজের হাতে তিনি সে শাসনযন্ত্রের যে অবৃহৎ চাকা চালিয়েছেন, তার নিচে পড়ে অনেক জীবন অকালে নষ্ট হয়েছে। মাঝে মাঝে স্বদেশ ও স্বাধীনতার শিহরণে তাঁর স্নায়ুশিরাও কেঁপে ওঠে নি তা নয়। মাঝে মাঝে আদালতে বসে বিচার করবার সময়, রাস্তায় প্রতিরোধকারী সত্যাগ্রহীদের ওপর গুলি চালাবার হুকুম দিতে গিয়ে, অনুভব করেছেন বুকে কীসের অস্থিরতা, গলায় কেমন চাপা আবেগ। কিন্তু সে শুধু মুহূর্তের জন্যে। কোনদিন ভাবেন নি এই আন্দোলনকারীরা সত্যি একদিন ইংরেজের হাত থেকে রাজ্যভার নিজেদের হাতে ছিনিয়ে নিতে পারবে। ভাবেন নি কোন-দিন, ইংরেজ এমন অশোভন ব্যগ্রতার সঙ্গে ভারতভূমি ত্যাগ করে চলে যাবে। অটুট বিশ্বাস ছিল ইংরেজের মানবিক উচ্চতার প্রতি; ভেবেছিলেন, একদিন ইংরেজ ভারতবর্ষকে স্বাধীনতা দেবে, কিন্তু তা দেবে এমন সব লোকের হাতে যাদের পরিচয় সবাই জানে; যাদের নির্বাচিত পথ অজানা, অচেনা, অভাবনীয় নয়।

সেই মধ্যরাত্রিতে সম্মিলিত মুখগুলির দিকে নির্বাক্ বিস্ময়ে তাকিয়ে-ছিলেন শুকদেব শর্মা। কাগজে কাগজে কত বৎসর ধরে এঁদের চেহারা দেখেছেন, এঁদের বক্তব্য এবং এঁদের বিরুদ্ধে ইংরেজ শাসকের বক্তব্য পড়েছেন; অনেককে ব্যক্তিগতভাবে চেনবার সুযোগও তাঁর হয়েছে। কিন্তু কোনদিন কি ভেবেছেন, এঁরা সত্যিই ভারতবর্ষকে স্বাধীন করবেন, অতীতের অন্ধকারে ঠেলে দেবেন এতদিনকার এই দুর্ধর্ষ ইংরেজ-শাসন? আজ যিনি তাঁর মোলায়েম অথচ তীক্ষ্ণ কণ্ঠে নিস্তব্ধ আলোর নিচে দাঁড়িয়ে ঘোষণা করেছেন: বহু বছর আগে, ভাগ্যের কাছে একদিন আমরা শপথ করেছিলাম; আজ সে-প্রতিজ্ঞা, সবটা না হলেও, অনেকখানি পূর্ণ করবার সময় এসেছে; আজ মধ্যরজনীতে, বিশ্বজোড়া সুপ্তির মধ্যে ভারত জেগে উঠেছে স্বাধীনতায়, নতুন জীবনে; এমন সময় ইতিহাসে কখনো আসে, বহুদিন পরে-পরে যখন একটা যুগের শেষ, আরেকটা নতুন যুগের শুরু, যখন একটা জাতির দীর্ঘনির্যাতিত আত্মা

হঠাৎ মুক্তি পায়, বাণী পায়। আজ তেমনি সময় সমাগত। আজ আমরা ভারত ও ভারতবাসীর কল্যাণে এবং তারও চেয়ে বড় যা, সেই বিশ্বমানবের কল্যাণে, আসুন, নিজেদের উৎসর্গ করি।—তিনি এই প্রাচীন, নবজাগ্রত দেশকে কোন্ আদর্শের পথে কোথায় নিয়ে যাবেন? তাঁর কথা শুনতে শুনতে শুকদেব শর্মার হঠাৎ হৃদ্‌কম্প যেন ভয়ানক বেড়ে গেল, গলা আটকে এল, চোখ জ্বালা করতে লাগল। তাকিয়ে দেখলেন, সমস্ত একত্রিত মানুষগুলো কেমন যেন অবাস্তব ছায়ার মতো বসে আছে, তারা যেন মানুষ নয়, শুধু ইতিহাসের বিরাট পরিবর্তনের নীরব সাক্ষী। সমস্ত ব্যাপারটা শুকদেব শর্মার রূপকথার মতো অবাস্তব অথচ আকর্ষণীয় মনে হল। তিনি যেন স্বপ্নের মধ্যে কোন এক অলীক পরিবেশে চলে এসেছেন, এক অদ্ভুত, উত্তেজনাময় পরিবেশে, যেখানে সবাই, সবকিছু অকস্মাৎ অনেক বড়, অনেক সুন্দর, অনেক মহান্ বলে প্রতিভাত হচ্ছে।

কিতাবে শুকদেব শর্মা পড়েছিলেন, একটা জাতি স্বাধীনতা হারায়, আবার ফিরে পায়, রক্তাক্ত সংগ্রামে, যুদ্ধে। ভারতকে কি ইংরেজ যুদ্ধে হারিয়ে পরাধীন করেছিল? জিজ্ঞেস করলেন তিনি নিজেকে। এতদিন ইংরেজের সেবা করে ভুলে গেছেন সেই নাতিপ্রাচীন ইতিহাস। মনে হয়েছে ইংরেজ ভারতে আছে এটাই স্বাভাবিক। আজ হঠাৎ ক্ষীণভাবে কয়েকটি ঐতিহাসিক নাম মনে পড়ল। হ্যাঁ, মনে পড়েছে। ভারতবাসী ইংরেজদের দু'বাহু বাড়িয়ে গ্রহণ করে নি। গায়ের জোরে ইংরেজ এদেশটাকে দখল করেছিল। আরও অনেক কথা আজ মনে পড়ছে, নীল দিগন্তে শরতের টুকরো মেঘের মতো তারা মনের আকাশে ক্ষীণ ছায়া ফেলছে। এদেশের লোক কোনদিন ইংরেজকে মেনে নেয় নি; সেই বাংলার সন্ন্যাসী-বিপ্লব থেকে শুরু করে কংগ্রেসের আগস্ট বিপ্লব পর্যন্ত সুযোগ পেলেই তারা অধীনতার শৃঙ্খল ভাঙতে চেয়েছে। মেনে নিয়েছিলেন কেবল কিছু মুষ্টিমেয় ভদ্রলোক, শুকদেব শর্মা যাঁদের একজন।

কিন্তু কই! এত সুদীর্ঘকালের ব্যাপক সংগ্রামের কোথায় সেই সংহার-সমাপ্তি? এ কেমনধারা বিপ্লব? এ কেমনধারা জাগরণ! যারা এতদিন পরাধীনতার শৃঙ্খলে ভারতবর্ষকে বেঁধে রাখল, শেষ পর্যন্ত শৃঙ্খল খুলল তারাই নিজের হাতে? এদেশের সংগ্রামী সৈনিক ভাঙতে পারল না সে শৃঙ্খল? কালকের প্রভু আজ হল সবচেয়ে বড় বান্ধব? সে নিজেই এসে বলল, আর তোমাদের শাসক নই আমি, এবার আমার চোখ খুলেছে, এবার আমি বেছে

নিয়েছি অন্য পথ, এবার আমি নিজেই অপসৃত হচ্ছি, তোমাদের ভাগ্যের বোঝা এবার তোমরা নিজের হাতে তুলে নাও। সে গেল, আমরা হলাম। আমরা নিজেরা পশুর মতো কাটাকাটি মারামারি করলাম, দেশটাকে কেটে দু'খণ্ড করলাম, পরস্পরের দিকে তাকিয়ে রইলাম গভীর-সবুজ ঘৃণা আর কালো অবিশ্বাস নিয়ে, আর সে, সেই আমাদের দুশো-আড়াইশো বছরের প্রভু, হাসতে হাসতে আমাদের নবজন্মের ধাত্রীর ভূমিকা গ্রহণ করল। এমন অভিনব নবজন্ম-ইতিহাস কোথায় কে দেখেছে?

শুকদেব শর্মার বুদ্ধিতে যতখানি ধার আছে তাতে তিনি বুঝলেন, এ না হয়ে যদি অন্যকিছু হত, তাহলে আজ এই নবজাগ্রত ভারতবর্ষে, তিনি, শুকদেব শর্মা আই. সি. এস.—যিনি দলে দলে স্বদেশীকে শায়েস্তা করেছেন, তিনি একটা প্রধান কেন্দ্রীয় দপ্তরের অন্যতম কর্ণধার হয়ে বসতে পারতেন না। খুব একটা ডিগবাজি এখনো খেতে হয় নি শুকদেব শর্মাকে। শুধু যে স্তুতি-সম্মান সাহেবদের দেখাতে হত, তা এখন দেশনেতাদের দেখাতে হয়। ধীরে ধীরে পরিবর্তন নিশ্চয় আসবে, তবে তার কোনটাই যে প্লাবন হবে এমন ভয় আর নেই। দেশের কল্যাণ করতে হবে, দেশকে গড়তে হবে, সত্যিকারের সুস্থ, সবল করে তুলতে হবে; কিন্তু, ভাগ্য ভালো, এসব আমাদেরই করতে হবে, আমাদেরই। আমাদের প্রতি এঁদের আস্থা আছে, আমাদের ওপর এঁরা নির্ভর করেছেন। এঁদের নতুন রীতি-নীতি, নতুন আদর্শ-কর্তব্য, আমরাই তার বাহক। ইংরেজও, সত্যি কথা বলতে হলে, কোনদিন আমাদের ওপর এতটা নির্ভর করে নি। বড় বড় পদে সব সময় তারা নিজের দেশের লোককে বহাল রেখেছে। আমরাও এবার সত্যি স্বাধীন হয়েছি।

গভীর রাত্রির অন্ধকারে গাড়ি চালিয়ে শুকদেব শর্মা বাড়ির পথ ধরলেন। ড্রাইভার তিনি ছাড়িয়ে দিয়েছেন। নতুন জমানায় জাঁকজমক কমাতে হবে। মন্ত্রীরা হয়তো পুরোনো ঠাট পছন্দ করবেন না। একজন সেক্রেটারী নিজে গাড়ি চালান, স্বাধীন ভারতের এই তো অন্যতম পরিচয়। এদিকে সুলোচনা গৃহসজ্জায় নববিধানের নতুন পরিবেশ রচনা করেছেন। দামী বিলেতী পর্দা সরিয়ে নক্সা-করা খদ্দরের পর্দা লাগানো হয়েছে। বৈঠকখানায় মহাত্মা গান্ধীর একখানা সুন্দর মূল্যবান ছবিও সুলোচনা টাঙিয়েছেন, আর স্বামীর আপিস-ঘরে জার্মান-সিলভারের ফ্রেমে প্রধানমন্ত্রীর একখানা সহাস্য প্রতিকৃতি বাঁধিয়ে টেবিলের একপাশে দাঁড় করিয়েছেন। ড্রাইভার ছাড়িয়ে দেবার আইডিয়াটাও

সুলোচনারই প্রথম মাথায় আসে, এসব বিষয়ে তাঁর বুদ্ধির তারিফ করেন শুকদেব শর্মা।

গাড়ি পার্লামেণ্ট হাউস থেকে বেরিয়ে অল্প সময়েই এসে পড়ল সেক্রেটারিয়েটের সামনে। ইংরেজ এটাকে বলত: 'গ্রেট প্লেস'। গ্রেটই বটে, ভারতের ভাগ্য এখানেই নির্ধারিত হয়। প্রতিদিন। আকাশে চাঁদ উঠেছে, তার আলোয় সমস্ত বিরাট জায়গাটা পরিস্ফুট। আলোর মালা জ্বলছে সেক্রেটারিয়েটে, তার পরে বড়লাট-ভবন; না, এখন আর বড়লাট কোথায়, এখন তো গভর্নর-জেনারেল—একটা প্রতীক‌মাত্র! স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্রপ্রধান একজন ইংরেজ, আর আমরা স্বেচ্ছায় তাঁকে বরণ করেছি! হোক না ভারত স্বাধীন, তবু সে ডোমিনিয়ন! সদ্য-অতীতের সঙ্গে এই মিলটা শুকদেব শর্মাকে প্রীত করল, নদীতে ডুবতে ডুবতে পা হঠাৎ ডাঙায় ঠেকে যাওয়ার মতো আশ্বস্ত অনুভূতি। বাঁয়ে তাকিয়ে দেখলেন, চাঁদের আলোয় 'ইণ্ডিয়া গেট' কোন রাজপুরীর তোরণের মতো মনে হচ্ছে। হঠাৎ মনে হল, একটু ঘুরে যাই, মাথাটা কেমন ভার হয়ে আছে, বুদ্ধি ঘোলাটে।

গাড়ি ফিরল বাঁ-হাতে। এ রাস্তাটার নাম কিংস্‌ওয়ে—হিন্দী করলে কী হবে? শুকদেব শর্মা মনের মধ্যে হাতড়ে বেড়ালেন। সর্বনাশ, একদিন এঁরা হিন্দীকে রাষ্ট্রভাষা করবেন! হঠাৎ হয়তো কবে হুকুমজারি করবেন, হিন্দীতে সব কাজ চালাতে হবে! শুকদেব শর্মা এলাহাবাদের মানুষ। হিন্দী, হিন্দুস্থানী তাঁর মাতৃভাষা। কিন্তু কিছু সম্পর্ক কি ছাই আছে হিন্দীর সঙ্গে যে দু'পাতা এখন লিখতে পারবেন? আর ও কি একটা ভাষা হল, যাতে মানুষ এই সুসভ্য বিশ শতকের মধ্যপথে নিজের ভাব প্রকাশ করতে পারে? 'কিংসওয়ে'র হিন্দী কী হবে? 'রাজা কা সড়ক'? বড়লাট সাহেবের প্রাসাদ থেকে ইণ্ডিয়া গেটে পঞ্চম জর্জের প্রস্তরমূর্তির পাদদেশ পর্যন্ত এই রাস্তার সরলরেখায় বিস্তৃতি—ইংরেজের আইডিয়া ছিল, বলতে হবে। গাড়ি এসে পড়ল সেই চৌমাথায়, যেখানে কিংসওয়ের বুক কেটে চলে গেছে 'কুইন্‌স্‌ওয়ে'—রাণীপথ। স্বাধীন হল ভারত, আজ, এই তো একটুখানি আগে। তথাপি এই রাজার ও রাণীর পথ অপরিবর্তিত রয়েছে; ভারতও রয়েছে ইংরেজের সাম্রাজ্যে, যার সুবেশ নাম কমন্‌ওয়েলথ। ঐ তো ইণ্ডিয়া গেট, প্রথম যুদ্ধে ইংরেজের সাম্রাজ্য বাঁচাতে যারা প্রাণ দিয়েছিল তাদের অনেকের নাম খোদাই করা আছে এর গায়ে। আর ঐ তো সম্রাট পঞ্চম জর্জ, কী সুন্দর প্রস্তরমূর্তি!

রাজা আমাদের পঞ্চম জর্জ, রাণী আমাদের মেরী—প্রথম ভাগেই শুকদেব শর্মা শিখেছিলেন পাঁচ বছর বয়সে; আজ. এই পঁয়তাল্লিশেও সে সত্য অক্ষুণ্ণ আছে। জর্জ পঞ্চমই হোন আর ষষ্ঠই হোন, রাণী মেরীই হোন আর এলিজাবেথই হোন, আসল হচ্ছে দি ক্রাউন! দি ক্রাউন ভারসাস জবাহরলাল নেহরু! দি ক্রাউন ভারসাস অমৃতলাল ভাটিয়া! দি ক্রাউন ভারসাস অরবিন্দ ঘোষ! বাই গড! কী ভাবছেন শুকদেব শর্মা! মাথাটা এখনো ঠিক হয় নি! সেসব দিন কি আর আছে? আজ, একটুখানি আগে, সেসব দিনেব শেষ হয়ে গেল।

মাথাটা ধরে উঠেছে, গলা যাচ্ছে শুকিয়ে। শুকদেব শর্মা বুঝতে পারলেন, একটু পানীয় চাই। বাড়িতে রয়েছে মনে পড়তে মনে মনে জিভ কাটলেন। রয়েছে বটে কিছু বাড়িতে, তার মধ্যে বাছাই করা পরম সুপেয় বস্তুও আছে, কিন্তু সেকথা এখন মনে আনাও বারণ। সুলোচনা বোতলগুলিকে বক্সরুমে লুকিয়েছেন। কংগ্রেসী শাসনে কবে ঘচ্ করে প্রহিবিশন হয়ে যায়, তখন কাজে লাগবে। নেতারা কেউ পান করেন, তাই যা ভরসা; আর রাজধানীতে বিদেশী মানুষ তো কম নয়! তবু সুলোচনা বলেছে, মদ্যপান এখন একেবারে ছেড়ে দিতে! মদ খাই জানলে নাকি নতুন কর্তারা ঘৃণা করবেন! শুকদেব শর্মা অনেক সতীর্থদের জিজ্ঞেস করেছেন, সবারই মনে সন্দেহ, সবাই সংশয়ে আছেন। পানবিলাস যে কমে গেছে তাতে সন্দেহ নেই। এই তো মাসখানেকের মধ্যে চারটে ডিনার পার্টিতে গেলেন শুকদেব শর্মা, দুটোতে মদ্যপান একেবারে হল না, আর দুটোতে যা হল, তাও কেমন যেন সঙ্কোচে, সংশয়ে। না জানি কর্তারা কী ভাববেন! কিন্তু যাই ভাবুন, একেবারে তো আর ত্যাগ করা যায় না জীবনের এই একটা পরম সুধাস্বাদ! পানই যদি গেল, প্রাণ আর কতটুকু রইল?

কনট প্লেসে দু'-চারটে 'বার' তখনো খোলা ছিল। তার একটায় ঢুকে পড়লেন শুকদেব শর্মা। হাতঘড়িতে তাকিয়ে দেখলেন আড়াইটে উত্তীর্ণ।

রাত শেষ হয়ে এলেও, 'বার'-এ বেশ ক'জন তৃষ্ণার্তের ছোট্ট ভিড় জমেছে। বেশির ভাগই বিদেশী, ইংরেজ। এরাও পার্লামেণ্ট হাউস থেকে সোজা চলে এসেছে পিপাসার তাড়নায়। নিজেদের মধ্যে যা আলোচনা করছিল, শুকদেব শর্মা ঢুকতে সেটা চাপা পড়ে গেল। মুখগুলোর দিকে তাকিয়ে একটা

পরিচিত চেহারা চোখে পড়ল শুকদেব শর্মার। ইয়ান মিকাণ্ডার—বৃটিশ আমলের জবরদস্ত আই. সি. এস.। কর্ম-উপলক্ষে কয়েকবার মোলাকাত হয়েছে শুকদেব শর্মার সঙ্গে। ভারতের স্বাধীনতার এত বড় বিরোধী ইংরেজদের মধ্যেও কম দেখেছেন শুকদেব শর্মা। মনে পড়ে গেল বহুদিন আগেকার একটা ঘটনা।

ইয়ান মিকাণ্ডার তখন এলাহাবাদের জেলা-শাসক; শুকদেব শর্মার দায়িত্ব একটা মহকুমার মধ্যে সীমাবদ্ধ। মিকাণ্ডার পরিদর্শনে এসেছে। সরকারী বিশ্রাম-ভবনে দু'দিনের আস্তানা গেড়েছে। তার দাপটে এস. ডি. ও. থেকে জমাদার পর্যন্ত অস্থির। কথায় কথায় মুখ-খারাপ করছে, ধমক দিচ্ছে, চেঁচিয়ে উঠছে যে-কাউকে লক্ষ্য করে। এমনি এক সময়ে তার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন মহকুমা শহরের একমাত্র কলেজের প্রিন্সিপাল, বয়োবৃদ্ধ, সকলের সম্মানিত হরিপ্রসাদ উপাধ্যায়। শুকদেব শর্মাকে তো প্রায় চব্বিশ ঘণ্টাই ছায়ার মতো অনুসরণ করতে হত মিকাণ্ডার সাহেবকে। তাই শুকদেব উপস্থিত।

উপাধ্যায় মশাই চিরজীবন ছাত্র পড়িয়ে শহরের সবাইকার সম্মানিত। পলিত কেশ, গৌরবর্ণ তাঁর চেহারা, ষাটের উর্ধ্বেও একেবারে সোজা মেরুদণ্ড। যৌবনে গান্ধীর মন্ত্রে দীক্ষা নিয়েছিলেন, জেলে গেছেন তিন-চার বার, অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা ছাড়া জীবনে কিছু জানেন না। বিয়ে করেন নি, সন্ন্যাসীর জীবন। যে-কলেজের তিনি অধ্যক্ষ, তার স্থাপনা হয়েছিল ১৯২১ সালের অসহযোগের সময়, জাতীয়-প্রচেষ্টায়। অর্থের অভাবে তার স্বাস্থ্য এখন ক্ষুণ্ণ, প্রসার ব্যাহত। গভর্নিং-বডি বছরখানেক আগে সরকারী সাহায্য চেয়ে আবেদন করেছিলেন; শুকদেব শর্মার পূর্বসূরী সুপারিশ করে গেছেন। নিজে ব্যাপারটা বুঝতে চায় ইয়ান মিকাণ্ডার। তাই উপাধ্যায় মশাইকে ডেকে পাঠিয়েছে।

যে ঘরটাকে মিকাণ্ডারের দপ্তরে পরিণত করা হয়েছে তার মাঝখানকার টেবিলের ওপর খানিকটা ঝুঁকে বসে আছে মিকাণ্ডার। আরও রয়েছেন তিন-চারজন দেশী রায়বাহাদুর, যাঁরা এসেছেন সাহেবকে সম্মান জানাতে। একপাশে বসে আছেন শুকদেব শর্মা। মিকাণ্ডার ইতিমধ্যে রায়বাহাদুরদের কাছ থেকে জেনে নিয়েছে উপাধ্যায়ের কলেজ কী ভীষণ তৎপরতার সঙ্গে স্বদেশী তৈরি করছে—অর্থাৎ তার প্রত্যেকটি কথায় রায়বাহাদুররা স্মিত ও সোৎসাহ সায় দিয়ে গেছেন।

ঘণ্টাখানেক উপাধ্যায়কে বাইরে অপেক্ষা করিয়ে মিকাওয়ার শেষ পর্যন্ত তাঁকে ডেকে পাঠাল। উপাধ্যায় ঘরে ঢুকে হাত তুলে বললেন, 'নমস্তে' মিকাওয়ার কোন জবাব না দিয়ে দেখেই চলল একখানা অকেজো কাগজ, বসতে পর্যন্ত বলতে ভুলে গেল। একটু দাঁড়িয়ে থেকে উপাধ্যায় নিজেই একটা চেয়ার টেনে বসলেন। বললেন, কথাবার্তা বলতে গেলে বসে বলাই ভালো তাই নিজেই বসছি।

নীল চোখ তুলে কঠিন দৃষ্টি হানল মিকাওয়ার। তারপর ছুঁড়ল প্রথম তীর: আপনি স্বদেশী কলেজের অধ্যক্ষ?

আমি কে তা জেনেই তো আমায় ডেকে পাঠিয়েছেন। মৃদু স্বরে উত্তর দিলেন উপাধ্যায়।

তা বটে। আপনার কথা শুনে বুঝতে পারছি আপনার পরিচয় আমি ঠিক পেয়েছি।

আমার পরিচয়ের কথা উঠছে না, মিঃ মিকাওয়ার। নিজের জন্যে কিছু আমি চাইতে আসি নি। আমি এসেছি আমার কলেজের জন্যে।

কলেজ? হেসে উঠল মিকাওয়ার: কলেজ কোথায়? ওটা তো গ্যাণ্ডীর চেলা তৈরি করবার কারখানা। আর তার জন্যে অর্থসাহায্য করবে সরকার!

মহাত্মা গান্ধীর সত্যিকারের শিষ্য তৈরি করতে পারলে জীবনকে আমি ধন্য মনে করতাম সাহেব। তাছাড়া ওটা কারখানা নয়, বিদ্যায়তন।

বিদ্যায়তন? একে আপনি বিদ্যায়তন বলেন? এই যে অসহযোগের নামে গুণ্ডামিটা হয়ে গেল তাতে আপনার ছাত্ররা যোগ দেয় নি?

দিয়েছে। তবে তারা গুণ্ডামি করে নি। দেশের স্বাধীনতার ডাকে সাড়া দিয়েছে।

ডাঃ উপাধ্যায়! ফেটে পড়ল মিকাওয়ার: আমি সব সইতে পারি, কিন্তু ঐ গুণ্ডামিকে স্বাধীনতা-সংগ্রাম বলা সইতে পারি নে। আপনারা স্বাধীনতার কিছু জানেন না। আপনারা জানেন না, আমরা আরও বহু, বহুদিন এদেশে আছি। আমরা এদেশটাকে সভ্যতার পথে অনেকখানি এনেছি, কিন্তু স্বাধীনতার যোগ্য হতে আপনাদের আরও অনেক, অনেক বছর লাগবে। হয়তো এ-শতাব্দীর পরে এদেশ স্বাধীনতার যোগ্য হতে পারবে। আপনারা দু'-চারজন যা-ই করুন আমরা জানি এদেশের জনসাধারণ আমাদের চায় এবং আমরা ছিলাম, আমরা আছি, আমরা থাকবো।

এই সেই ইয়ান মিকাণ্ডার। 'আমরা আছি, আমরা থাকবো।' পনের বছর আগে সদর্পে ঘোষণা করেছিল ইয়ান মিকাণ্ডার। উপাধ্যায়কে সে সাহায্য দেয় নি। আরও অনেক বড় বড় কথা বলে ভাগিয়ে দিয়েছিল। যুক্তপ্রদেশের পলিটিক্যাল সেক্রেটারী হবার পরে ডাক পড়ে তার বড়লাটের দপ্তরে। 'যোগ্যতা'র সঙ্গে নানা গুরুত্বপূর্ণ পদে পাঁচ বছর কাজ করেছে ইয়ান মিকাণ্ডার। কোনদিন একমুহূর্তের জন্যেও ভাবে নি, আমরা নেই, আমরা চলে গেছি। ইংলণ্ডে শ্রমিক মন্ত্রিসভা গঠন হতেই প্রমাদ গণেছিল। তারপর পার্লামেণ্টারী ডেলিগেশন থেকে আজ পর্যন্ত কেমন একটা ভীষণ দুঃস্বপ্নের মধ্য দিয়ে কেটেছে দিনের পর দিন। আজ মধ্যরাত্রিতে ভারত-সাম্রাজ্যের শবদাহ প্রত্যক্ষ করে কনট প্লেসের 'বার'-এ পানপ্রার্থী তৃষ্ণাকাতর সেই 'আমরা আছি' ইয়ান মিকাণ্ডার।

শুকদেব শর্মা ইয়ান মিকাণ্ডারের এতোটা কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন যে, মিকাণ্ডারকে বলতেই হল, হ্যালো শর্মা!

হ্যালো মিকাণ্ডার!—'মিঃ' সম্মানটা কেমন যেন জিভে ফসকে গেল।

মিকাণ্ডার ইংরেজ, তাই সেটা নজর করল না। বলল, কী চাই তোমার? হুইস্কি?

শুকদেব শর্মা বললেন, ধন্যবাদ।

দু'জন দু'গ্লাস থেকে পান করলেন।

কোথেকে এলে? প্রশ্ন করল মিকাণ্ডার।

তুমি যেখান থেকে।

তুমি তো এখন এ্যাডিশনাল সেক্রেটারী?

হুঁ। তুমি এখনো এখানে?

আসছে হপ্তায় যাবো।

কোথায়?

আগে করাচীতে। তারপর হোম।

করাচীতে কেন?

পাকিস্তান সরকার কিছু এ্যাডভাইস চাইছে।

তাহলে পাকিস্তান সরকারের কাজ নিলে?

নো, নো, নো ফিয়র্স! আমি যাচ্ছি হোম। তবে মিঃ জিন্না নিজে বলে গেছেন তাঁকে ক'দিনের জন্যে একটু সাহায্য করতে। তাই ওপথ হয়ে যাবো।

কেমন শুনলে নেহেরুর বক্তৃতা ?

হি স্পোক্‌স্‌ ওয়েল্‌ !

পাশের থেকে একজন বলল, ইজিয়র সেড্‌ দ্যান্‌ ডান্‌।

শুকদেব শর্মা একবার তাকালেন লোকটার দিকে। ইংরেজ, মুখটা চেনা-চেনা, হবতো কোথাও দেখে থাকবেন। তাঁর মুখ থেকে বেরিয়ে গেল, ইট্‌স গুড টু গো হোয়াইল দ গোয়িং ইজ গুড, মিকাণ্ডার !

ফিরবার পথে শুকদেব শর্মার ভয়ানক হাসি পেল। তিনি নিজেও স্বদেশী হয়ে গেছেন !

সুলোচনা স্বামীকে নিয়ে ভয় পেয়েছিলেন, কেমন একটা আতঙ্ক তাঁর চেতনার চারপাশে পাক খেয়ে বেড়াত। তিনি বুঝতে পারছিলেন, শুকদেব বদলে যাচ্ছেন। বদলে যাচ্ছেন, ক্ষমতার সার্থকতার উত্তাপে।

ইংরেজ আমলেও শুকদেবের প্রতাপ ছিল অনেক, কিন্তু তার মাপকাঠি ছিল দেশীয় মানুষ। সাধারণ ভারতীয়দের চেয়ে অনেক বড় করে আই. সি. এস.-দের লালন করেছিলেন ইংরেজ সরকার। কিন্তু এক জাতের লোক দেশে ছিলই যাদের কাছে শুকদেবরা মাথা নিচু করে থাকতেন। সে হচ্ছে ইংরেজ। শত চেষ্টা করেও ইংরেজের সমান হওয়া যেত না। ইংরেজ সুকৌশলে নিজেকে উচ্চাসনে কায়েম রাখত। তোমার পদ, বেতন, বিদ্যা, চেহারা যতই উম্‌দা হোক না কেন, তুমি সর্বক্ষণ বুঝে নিতে, তারা তোমার ওপরে। তুমি সব সময় সচেতনভাবে তাদের সমান হবার চেষ্টা করতে, কখনোই যেন হয়ে উঠতে পারতে না। তোমার জেলায় তুমি যতই দোদণ্ডপ্রতাপ হও না কেন, ইংরেজ এস. ডি. ও-র ওপর মাতব্বরি করতে তোমাকে দশবার ভাবতে হত। ইংরেজ-শাসিত মহকুমায় পরিদর্শনে গেলে তুমি বুঝতে পারবে যে তুমি জেলা-শাসক হলেও লোকের নজর ঐ শ্বেত-প্রভুর দিকে। আদব-কায়দায়, আহারে-বিহারে, পঠনে-পাঠনে, কথাবার্তায় নিয়ত তোমার লক্ষ্য থাকত কী করে আরও সাহেব হতে পারো।

এখন সে অসাম্য আর নেই। ইংরেজ গেছে, এখন তুমিই সব। তোমার ওপর আছেন মন্ত্রীরা, কিন্তু তুমি জানো, তুমি ছাড়া তাঁদের চলে না। এমন অনেক মন্ত্রী আছেন, বাইরে তুমি তাঁদের সামনে অধীনতায় গদ্‌গদ, কিন্তু

অন্তরে শ্রদ্ধা করার কারণ খুঁজে পাও না। তুমি স্যাহেব, তাঁরা ধুতিচুরস্ত স্বদেশী। তুমি অক্সফোর্ড, কেম্ব্রিজে পড়েছ, তাঁরা পড়েন নি। তাঁরা তোমার মতো আধুনিক নন, তোমার মতো কালচার্ড নন। তুমি অনেক ভালো ইংরেজি বলো, অনেক ভালো ইংরেজি লেখো। তাঁরা আদর্শবাদী, তুমি একনিষ্ঠ বাস্তবধর্মী কর্মবীর। তাঁরা শুধু নীতি সাজিয়ে দেন, তুমি তাকে বাস্তবে রূপ দাও। তুমি আইন জানো, শাসন জানো, সবকিছু জানো। তাঁরা তোমাদের ওপর এত বড় একটা প্রাচীন শ্লথগতি দেশকে তাড়াতাড়ি নতুন করে গড়ে তোলবার দায়িত্ব ছেড়ে দিয়েছেন। তুমিই এ-মহারথের সারথি। তুমি পৌঁছে গেছ তোমার গৌরবের শিখরে, এবার তোমার চেয়ে বড় তোমার কাছে আর কিছু নেই।

আদর্শবাদ নিয়েও মন্ত্রীরা যে কী করুণভাবে মানুষ, তা তুমি জেনে গেছ। তুমি জেনে গেছ মন্ত্রী দিগম্বর ওঝা স্যার ফ্রান্সিস হোয়াইট নন। তিনি দিগম্বর ওঝা। তিনি তোমার ভাষায় কথা বলেন, তোমার মতোই ভাবেন। তিনি সারাদিন পান চিবোন, যাকে তুমি চিরদিন অসভ্যতা মনে করে এসেছ। তিনি মদ পান করেন না। শাসনযন্ত্রের জটিল বহুগ্রন্থি-রহস্য তিনি জানেন না, বোঝেন না ; সব বিষয়েই তোমার ওপর তাঁকে নির্ভর করতে হয়। তুমি তাঁকে একেবারে চিনে নিয়েছ। তুমি জানো কীসে তিনি খুশী হবেন, কতটুকু তাঁর এখুনি চাই, কতখানি তাঁর অনেক পরে হলেও চলবে। পার্লামেণ্টে তাঁর বক্তৃতার খসড়া তুমি করে দাও, কোন্ প্রশ্নের জবাবে তিনি কী বলবেন তাও সাজিয়ে দাও তুমি। তোমার নিচে হাজার হাজার মানুষ কাজ করে। তারা তোমাকে আকাশে তুলে রাখে। যেমন, মন্ত্রীদের স্তাবকতায় আকাশে তুলে রাখো তুমি ও তোমরা। তুমি যেমন মন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলতে প্রতি বাক্যে একবার 'স্যার' বলো, তোমার সঙ্গে কথা বলতে তারা তেমনি দু'বার 'স্যার' বলে। তুমি হাসলে তারা হাসবেই, তুমি রাগলে তাদের বুক কেঁপে উঠবে। তোমার বিস্তীর্ণ 'সাম্রাজ্যে' একমাত্র তুমিই সিদ্ধান্তের অধিকারী—তুমি আর তোমার ওপরের মানুষ। নিচের লোকদের প্রতি তোমার আস্থা নেই, বিশ্বাস নেই, শ্রদ্ধা নেই। তোমার সাম্রাজ্যের ঘরে ঘরে লক্ষ লক্ষ হলদে, শাদা, বাদামি কাগজের ফাইল জমে আছে। তার মধ্যে আটকে আছে কোটি কোটি মানুষের ভাগ্য। ব্যক্তির, সমষ্টির, জাতির। সে-ভাগ্য কতদিন আটকে থাকবে তার বিচারক তুমি। লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি টাকা খরচের ভার তোমার ওপর,

'যে-টাকা তুমি রোজগার করো না, অসংখ্য নির্দিষ্ট পথে সংখ্যাহীন মানুষের কাছ থেকে যে-টাকা প্রতি বছর জমা হয় রাজকোষে। তুমি, সেই বৃটিশ আমলের অনুগত সেবক তুমি, স্বাধীনতার জন্যে কোন কিছু তোমাকে করতে হয় নি, বরং ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় তার পথরোধই তুমি করেছিলে ; আজ স্বাধীনতা সর্বাগ্রে তোমারই জন্যে, তোমারই হাতে।

মন্ত্রীরা পার্টির লোক। আজ আছেন, কাল নেই। তুমি চিরন্তন। মন্ত্রীদের জবাবদিহি করতে হয় পার্টির কাছে, পার্লামেণ্টে, দেশের কাছে। তোমার জবাবদিহি শুধু ফাইলে। পাঁচ বছরে একবার মন্ত্রীদের নির্বাচিত হবার জন্যে দেশবাসীর কাছে ভোটের ঝুলি নিয়ে হাত পাততে হয়। তুমি নিজের আসনে, নিজের আধিপত্যে সুপ্রতিষ্ঠিত।

এ হচ্ছে সেই পরিবর্তন যা সুলোচনা শুকদেবের মধ্যে লক্ষ্য করেছিলেন এবং করে আতঙ্কিত হয়েছিলেন। অনেক ক্ষমতা, অনেক প্রভুত্ব, অনেক সার্থকতা মানুষটাকে কেমন যেন কর্কশ, কঠিন করে দিয়েছে, কেমন যেন একটু মাতাল করে তুলেছে। সে যে নিজের যোগ্যতায় সুপ্রতিষ্ঠিত, এই সন্ত-সজাগ চেতনা তার অন্যান্য অনুভূতিগুলিকে কেমন যেন ভোঁতা করে এনেছে। অতীতে স্বামীর মধ্যে, সবকিছু সত্ত্বেও, একটা শান্ত মোলায়েম সত্তা ছিল, যা সুলোচনার বড় মিষ্টি লাগত। তার প্রকাশ ছিল স্ত্রীকে আদর করায়, সপ্তাহ-শেষে স্ত্রী-ছেলেমেয়েদের নিয়ে পিকনিকে যাওয়ায়, অবসরমতো বাগানে ফুলগাছগুলির পরিচর্যায়। এখন সেই মোলায়েম সত্তাটি যেন নিঃশেষ হয়ে গেছে। শুধু এসেছে কাজের পর কাজের ভিড়, ক্ষমতার পর ক্ষমতার মাদকতা। কী অমানুষিক কর্মক্ষমতার সন্ধান পেয়েছেন শুকদেব শর্মা! সকালবেলা প্লেনে করে বোম্বাই গিয়ে সারাদিন কনফারেন্স, আলোচনা ইত্যাদিতে কাটিয়ে, ওরই মধ্যে দুটো সম্মানভোজের আমন্ত্রণ রক্ষা করে, রাতের প্লেনে দিল্লী ফিরে এসে ঠিক দশটা বাজতে নিজের দপ্তরে হাজির হন ; এটাই যেন নিয়ম, ব্যতিক্রম নয়। সকাল ন'টায় গাড়ি বাড়ির ফটক ছাড়ে, আর ফেরে সন্ধ্যা সাতটায় বা তারও পরে—আবার খাওয়ার পরে ঘণ্টা দুয়েক কাজে বসেন শুকদেব। যতক্ষণ বাড়িতে থাকেন, টেলিফোন বিশ্রাম পায় না। অথচ শুকদেবের ক্লান্তি নেই। তিনি উপভোগ করেন তাঁর এই শিখর-ছোঁওয়া প্রতিপত্তি। অন্য কোন দিকে আর যেন তাঁর নজর নেই।

শুকদেব যে দেশপ্রেমিক তাতে কোন সন্দেহ নেই। দেশ-গড়ার নেশায় মাতাল না হলে তিনি এই অমানুষিক পরিশ্রম সানন্দে স্বীকার করতেন না। শুকদেবের দেশপ্রেমে কোন ফাঁকি নেই। এ তো গান্ধীটুপিওয়ালাদের দেশ-প্রেম নয়, মাঝে মাঝে বলেন শুকদেব। সে-দেশপ্রেমের অন্তরে সার ছিল না, শুধু হাওয়া। হুজুগের মাতলামিতে যারা জেল খেটেছে, পুলিশের মার খেয়েছে, যাদের গলায় হুজুগে-পাগল স্বল্পবুদ্ধি জনতা গাঁদাফুলের মালা পরিয়েছে, আজ তাদের চেহারাটা একটু দেখো না! কেমন সুন্দর নেওয়াপাতি ভুঁড়ি, পায়ে কেমন চকচকে জুতো, গায়ে খদ্দরের ধবধবে আচকান। তারা কেমন দশপথে দশ পয়সা গুছিয়ে নেওয়ার সবটুকু ফন্দি শিখে নিয়েছে। কেমন তারা দিনরাত ঘোরাঘুরি করে পারমিট আর লাইসেন্সের জন্যে, কেমন তারা দশটা ব্যবসার আঁটঘাট জেনে নিয়েছে! আইন কী করে ফাঁকি দিতে হয়, কী করে বেনামিতে জমি কেনা যায়, ইনকাম ট্যাক্স না দেবার কতগুলো রাস্তা আছে, সব তাদের মুখস্থ। আর আমার? আমি ওদের মতো জেলে যাই নি বা পুলিশের লাঠি খাই নি। কিন্তু স্বাধীন ভারত গডবার সময় নেতারা ডাকলেন কাকে? ওদের, না আমাদের? ডাকলেন আমাদের। কেন ডাকলেন? ডাকলেন এজন্যে যে আমাদের বিদ্যা আছে, কর্মশক্তি আছে, বাস্তববুদ্ধি আছে, নিঃস্বার্থ কাজের ক্ষমতা আছে। আমাদের পূর্বসূরীরা যদি ইংরেজের সাম্রাজ্য গড়তে পেরে থাকেন, আমরা সমাজতান্ত্রিক ভারত গড়তে পারবো না কেন? আমি দিনরাত তো শুধু নতুন ভারতের নেশায় মেতে আছি। প্রত্যেক মাসে আমি পাই-গুনতি ইনকাম ট্যাক্স দিই, আমার টি. এ. বিলে একটাকা বেশি দাবি করি নে; আমি পারমিট চাই নে, লাইসেন্স চাই নে। মন্ত্রীরা আত্মীয় পোষণ করতে পারেন। কিন্তু আমি করি নে।

সুলোচনা জানেন, রাজকাজে কোনরকমের ভেজাল মেশান না তাঁর স্বামী। কোন অন্যায় নিজে করেন না, অন্যে করলে, নিতান্ত নিরুপায় না হলে, ভয়ংকর চটে যান। তবু তিনি নিঃসন্দেহ নেশাগ্রস্ত। সবার থেকে যেন অনেক উঁচুতে নিজেকে তুলে ধরেছেন, এমনকি সুলোচনার কাছ থেকেও। এক-আধটু পান চিরদিনই করতেন। আজকাল তার পরিমাণ বেড়ে গেছে। পার্টি—লাঞ্চ, টি, ক্যকটেল, ডিনার—লেগেই আছে; তার অনেকগুলোতেই সুলোচনা যেতে চান না। তাঁর নিজের কর্মক্ষেত্রও বেড়ে গেছে গত কয়েক বছরে অনেক। নানা কাজে ডাক পড়ে, নানা কাজে এগিয়ে যেতে হয়।

দিল্লী এখন একটা আন্তর্জাতিক রাজধানী। পৃথিবীর নানা দেশের সঙ্গে ভারতের মৈত্রী। কয়েকটা 'মৈত্রী সংঘে'র সঙ্গে সুলোচনা নিজেই সংযুক্ত। এসবের চাহিদা কম নয় তাঁর সময়ের ওপর। তারপর বছরে বছরে আন্তর্জাতিক সম্মিলনী লেগেই আছে। প্রতিনিধিদের সুখ-সুবিধার ব্যবস্থায় হাত লাগাতে হয়। পার্টি আছে, সম্বর্ধনা আছে। দশটা সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ব্যাপারে ডাক পড়ে। নাচ, গান, নাটক সবটাতেই যেতে হয়। না গেলে রেহাই নেই। চার-পাঁচটার তো তিনি হয় প্রেসিডেণ্ট, নয় ভাইস-প্রেসিডেণ্ট। একটা গার্ল-স্কুলের সেক্রেটারী। তাছাড়া, কালের পরিবর্তনে নতুন কর্তব্যের আহ্বান আসে। সমাজকল্যাণ এখন একটা অত্যন্ত বড কর্তব্য। আর এ-কাজ যদি সুলোচনারা না করেন তবে কে করবে? তাই সপ্তাহে একদিন বস্তিতে গিয়ে হাঁ-করা নোংরা মেয়েগুলোকে শিখিয়ে আসতে হয় কেমন করে বস্তিবাসী হয়েও পরিচ্ছন্ন থাকা যায়। বছরে অন্তত একটা 'ফেট' করতে হয় অন্ধ বালক বালিকা বিদ্যালয়ের সাহায্যে। রেডক্রস দিবসে কাগজে-জড়ানো ফুটো কৌটো আর ব্যাগ-ভর্তি ফ্ল্যাগ নিয়ে ঘুরে বেড়াতে হয় টাকা আদায়ে: সেবার রাষ্ট্রপতির কাছে ফ্ল্যাগ বিক্রি করতে পেরে কাগজে কাগজে কেমন সুন্দর ছবি বেরিয়েছিল।

এমনি করে স্বাধীন ভারতের রাজধানী-সমাজে তাঁর নিজেরও একটা কর্মব্যস্ত গণ্ডী গড়ে উঠেছে। তারপর আছে সংসার। এর ভার সম্পূর্ণ তাঁর হাতে। অনেক ঠাট বজায় রাখতে হয়; আয় তো আর অসীম নয়। লোকে ভাবে কতই যেন কী! সুলোচনা জানেন কীভাবে তাঁকে সবকিছু সামলে রাখতে হয়। জিনিসপত্রের দাম বেড়েই চলেছে। জীবনযাত্রার মানও বাড়ছে। বাবুর্চি, বেয়ারা, মালী, ড্রাইভার: এতেই কি আজকাল কম খরচ? তারপর ছেলেমেয়ের পড়া, সে এক রাজসিক ব্যাপার। মাসে দু'তিনটে ডিনার দিতেই হয়। দেশী মানুষদের সঙ্গে সমান তাল রেখে আজকাল আসে বিদেশী মানুষ, তাদের খাওয়াতে মাসের শেষে ব্যাঙ্কে ওভারড্রাফ্‌ট হয়ে যায়! শুকদেবের পানীয়ের বিলই তো কত বেড়ে গেছে! সংসারের ওপরে আছে কন্যা শীলা। সে এখন বড হয়েছে, তার ওপর নজর রাখতে হয়। কার সঙ্গে মেশে, কোন্ প্রভাবে পড়ে তার ঠিক কী? রমেশকে নিয়ে বিশেষ ভাবনা নেই: তার সব-টুকুই আই. সি. এস.-সন্তান! সে সবার সঙ্গে মেশে না, কথা বলে কম: নেশার মধ্যে সিনেমা আর আমেরিকান থ্রিলর। ও-ছেলের ভবিষ্যৎ নিয়ে

ভাবনা নেই। কিন্তু শীলা কেমন যেন চঞ্চল, অস্থির, বেখাপ্পা। স্কুলে কলেজে তার বন্ধুরা খ-শ্রেণীর, সে-শ্রেণীর সঙ্গে সুলোচনার সামাজিক পরিচয় নেই। সে ভাব করবে অধ্যাপক, কেরানী আর ছোট অফিসারদের মেয়ের সঙ্গে, যাবে তাদের বাড়ি, টেনে নিয়ে আসবে তাদের নিজের বাড়িতে। সে পড়বে বড বড সিরিয়স নভেল, যা মানসিক স্বাস্থ্যের পক্ষে ভালো নয়। রমেশ রক্‌-এ্যান-রোলো রেকর্ড বাজালে শীলা যাবে রেগে। তার জন্যে চাই পালুসকর, শুভলক্ষ্মী, দিলীপ রায়, হেমন্তকুমার। টাগোর পড়বে বলে এক সহপাঠিনীর কাছে সপ্তাহে একদিন সে যায় বাংলা শিখতে। তবু মাঝে মাঝে জিমখানায় টেনিস খেলতে যায়, আভিজাত্যের এটুকুই সে বজায় রেখেছে। একদিন সঙ্গে করে নিয়ে এল এক পারশিয়ান ছোকরাকে; কী লাল-টুকটুকে চেহারা, সুলোচনা নিজেই বিস্মিত হয়েছিলেন। ভারত সরকারের খরচে দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ে নাকি ডক্টরেটের থিসিস্‌ লিখছে একটা খটমট বিষয়ে! তার সঙ্গে ভাব করার কী দরকার শীলার! সে বোধ হয় খেয়ালই করে নি যে পারস্যের লোকেরা মুসলমান, আর মুসলমান হলেই তো হিন্দু মেয়ের ওপর ভয়ংকর লোভ! বাধ্য হয়ে সেদিন তাকে আপ্যায়ন করতে হল সুলোচনার, কিন্তু দু'দিন পরে যখন সে আবার ফোন করল, গলার স্বরে ও কথাবার্তার ভঙ্গিতে তিনি স্পষ্ট বুঝিয়ে দিলেন যে শীলার খবরে তার কোন প্রয়োজন নেই। বেচারা আমতা-আমতা করে টেলিফোন রেখে দিল। কিন্তু মা হয়ে তিনিই বা কী করেন? মিশতে চায়, মিশুক। ভালো ছেলের কি অভাব আছে, নাকি তাঁর খুব একটা বাছ-বিচার করবেন! বিদেশীদের একটু-আধটু জানতে চাও তো মেশো ইংরেজ বা জার্মান দেলেদের সঙ্গে। তা নয়—কোথাকার কোন্‌ ইরানী, মিশরী, বর্মী ছেলেদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করবে। কবে না জানি কোন্‌ নিগ্রোকে ধরে বাড়ি এনে হাজির করে!

নিজের সমাজ আর সংসার সুলোচনাকে যেন স্বামীর কাছ থেকে দূরে সরিয়ে দিয়েছে। তিনি আছেন তাঁর রাজকাজ নিয়ে, সুলোচনা তাঁর নিজের সমাজসেবা আর সংসার নিয়ে। তার মানে এই নয় যে তাঁদের ভাব নেই। কিন্তু কেমন যেন একটা প্রাচীর গড়ে উঠেছে স্বামী আর স্ত্রীর মাঝখানে। এটা কি শুকদেবের চরম সার্থকতার প্রাচীর, না বয়সের? শুকদেব পঞ্চাশের কাছাকাছি পৌঁছেছেন বলেই কি সুলোচনাকে তাঁর আগের মতো প্রয়োজন নেই? না, তিনি এমন একটা-কিছুর সন্ধান পেয়েছেন, যা তাঁকে গ্রাস করে

নিয়েছে! চল্লিশে দাঁড়িয়ে সুলোচনা জানেন তাঁর দেহ আর তেমন চাইতে পারে না, দিতেও পারে না। কাঠামো তাঁর ঠিক আছে, কিন্তু স্তরে স্তরে অনেক সযত্নরক্ষিত রেখার মাঝে মাঝে কেমন একটা জড়তা জমে উঠছে। সুলোচনা জানেন তিনি এখনো সুন্দরী, যৌবন এখনো তাঁর দেহে সঞ্চিত। যে-সম্পদে এতদিন তিনি শুকদেবের প্রেয়সী, তা এখনো অটুট সাজানো রয়েছে। প্রতিদিন তিনি তার সস্নেহ পরিচর্যা করেন। তাঁর বক্ষে, বাহুতে, নিতম্বে, পেটে মেদের আক্রমণ হয় নি। কাঁচুলি না পরলেও তিনি যুবতী। তাঁর একটা দাঁতের এখনো ব্যারাম হয় নি, চোখের সেই ঘন-কালো হয় নি একটুও ফিকে। কিন্তু তিনি এও জানেন যে আরনেস্ট লংফেলো তাঁর রূপে মজতে পারে, কিন্তু যে-মানুষটা দুই যুগেরও বেশি তাঁব দেহকে জেনে এসেছে অমৃত-মন্থনে তার পুবাতন উৎসাহ আব তেমন নেই।

এটা যদি স্ত্রীলোকমাত্রেই অনীহার পরিচয় হত, সুলোচনা ভয় পেতেন না। শুকদেব, তিনি জানেন, একনারীনিষ্ঠ নন। যে-জমিদারবংশে তাঁর জন্ম তার সামন্ততান্ত্রিক আভিজাত্যের অন্যতম নিদর্শন ছিল পুরুষের বহুনারী সম্ভোগ। শুকদেব আধুনিক, উচ্চশিক্ষিত, সুসভ্য। তাই পুরাতন প্রথায় তিনি রক্ষিতা, নাচওয়ালী, বারবণিতার প্রভাবে পড়েন নি। কিন্তু তাঁব জীবনে নারী এসেছে, তিনি তাদের অস্বীকাব করেন নি। আবার, স্বীকারও করেন নি। অনেকটা নেহাত খেয়ালে, কখনো নতুনের নেশায়, কখনো বা দেহের ক্ষুধায় অন্য নারীকে শয্যাসঙ্গিনী করেছেন। কিন্তু তারা একজনও তাঁর মনে কোন স্বীকৃতি পায় নি। সেখানে একাধিপত্য করে এসেছেন সুলোচনা, সে সম্মানে কোনদিন তিনি বঞ্চিত হন নি। বার বার স্বামীর কর্মজীবনে তাঁর প্রয়োজন হয়েছে; বুদ্ধি দিতে, তৎপরতা দিতে, এমনকি নেতৃত্ব দিতেও। তিনি জেনেছেন, স্বামী শুধু তাঁর রূপেই তৃপ্ত নন, তাব বুদ্ধিতে ও কর্মশক্তিতেও তুষ্ট।

বুদ্ধি ও কর্মশক্তি সুলোচনার সবটুকুই আছে, রূপও স্তিমিত হয় নি। কিন্তু শুকদেবের বোধ হয় প্রয়োজন ফুরিয়েছে। আর হয়তো তিনি মনে করেন না, তাঁর জীবনে নতুন কোন সংকট আসবে যখন সুলোচনাকে সর্বাগ্রে প্রয়োজন। এবার তিনি যেন শিখরে পৌঁছে গেছেন, আর তাঁকে আরোহণে সাহায্য করবার জন্যে সুলোচনার ডাক পড়বে না। এখানেই সুলোচনার ভয়। দু'-একটা ব্যাপারে স্বামীকে দু'-একবার পরামর্শ

দিতে গিয়ে তিনি এই কঠিন, নির্দয়, নিরেট সত্যের সন্ধান পেয়ে আঁতকে উঠেছেন।

প্রথম ঘটনাটা ঘটেছিল, যে-সময়ের কথা বলছি, তার বছর খানেক আগে। উত্তরপ্রদেশের একজন প্রখ্যাত নাট্যকার শুকদেবের সঙ্গে সাক্ষাৎপ্রার্থী হয়ে বাড়িতে এসেছিলেন। বৃদ্ধ ভদ্রলোক, জীবন থেকে অবকাশ নিতে-নিতেও নাটক থেকে নিতে পারেন নি। সারাজীবন স্বপ্ন দেখেছেন একটি জাতীয় নাট্যশালা খুলবেন। ভরসা করেছিলেন দেশ স্বাধীন হলে তাঁর এই আজীবন স্বপ্নের সার্থকতার জন্যে সরকার তাঁকে আহ্বান জানাবেন। ব্যর্থ প্রতীক্ষায় বহু বছর কেটে গেল। প্রথমে হয়েছিল তীব্র অভিমান। তারপর অভিমানের পরিণতি বেদনায়। এখন নিজেকে বুঝিয়েছেন হয়তো নানা গুরুতর সমস্যায় ব্যস্ত থাকায় রাজপুরুষদের তাঁর কথা মনে হয় নি—তাই নিজেই রাজধানীতে এসেছেন একবার চেষ্টা করে দেখতে। শুকদেবের শ্বশুর তাঁর বন্ধু ছিলেন, সেই সূত্রে একদা শুকদেবের সঙ্গে সামান্য পরিচয় হয়েছিল। তাই দিল্লীর অকূল সমুদ্রে একমাত্র শুকদেব-সম্বল হয়ে তিনি সোজা হোটেল থেকে চলে এসেছেন শুকদেবের গৃহে।

শুকেদেব এটা পছন্দ করেন নি। কোন বিষয়ের তদ্বিরে কেউ তাঁর সঙ্গে বাড়িতে এসে দেখা করে এটা তাঁর ইচ্ছাবিরুদ্ধ।

চায়ের টেবিলে বেয়ারা এসে কার্ড দিতেই তিনি চটে গিয়েছিলেন। সুলোচনার দিকে তাকিয়ে বললেন, তুমি আসতে বলেছ?

কাকে?

কার্ডখানা এগিয়ে দিলেন শুকদেব স্ত্রীর দিকে। নাম দেখেই সুলোচনা ব্যস্ত হলেন। তাঁর বাবার বন্ধু। নামী লোক। একদা এই নাট্যকারের নাটক দেখবার জন্যে এলাহাবাদের মানুষ অস্থির হয়ে উঠত।

না, আমি আসতে বলি নি।

সুলোচনা উঠলেন।

কোথায় যাচ্ছ?

ওঁকে এনে বৈঠকখানায় বসাচ্ছি। তুমি এসো।

আমার সময় হবে না এখন।

তার মানে? অবাক্ হলেন সুলোচনা।

তার মানে তুমি জানো। আমি জানি উনি কী চান। আর তুমি জানো বাড়ি এসে তদ্বির করা আমি পছন্দ করি নে।

সুলোচনা স্তম্ভিত হলেন। একটু চুপ করে ধীরে ধীরে বললেন, উনি সাধারণ লোক নন। গুণী লোক।

তা হয়তো একদিন ছিলেন।

ছিঃ, অমনি করে বলো না। তোমার মনে নেই—

আমার সব মনে আছে। কিন্তু উনি যেই হোন, বাড়িতে আমার সঙ্গে দেখা হবে না। তুমি ওঁকে বলো, যেন বারোটা পঁচিশ মিনিটে আপিসে আসেন।

তুমি তো কালই গোবর্ধনপ্রসাদ ডুবের সঙ্গে বাড়িতে দেখা করলে। সে কি কোন তদ্বিরে আসে নি?

এবার শুকদেবের ধৈর্যচ্যুতি হল।

আঃ সুলোচনা, তোমার বুদ্ধির যেন কী হয়েছে। গোবর্ধনপ্রসাদ কার চিঠি নিয়ে এসেছিল তোমার জানা আছে?

আছে।

সুলোচনা চলে গেলেন। পিতৃবন্ধুর অনেক খাতির তিনি করলেন। সত্যির সঙ্গে মিথ্যে মিশিয়ে বললেন, শুকদেবের হাতে বড় কাজ, তিনি যেন দপ্তরে যান, ঠিক বারোটা পঁচিশে, শুকদেব সাধ্যমতো সাহায্য নিশ্চয় করবেন।

সামান্য ব্যাপার। তবু অসামান্য। শুকদেব কড়া লোক সন্দেহ নেই। বাড়িতে উমেদারদের আসাটা তিনি অত্যন্ত অপছন্দ করেন। কিন্তু তবু লোক আসে এবং যারা আসে তাদের অনেকের সঙ্গেই শুকদেব দেখা করেন। কারণ না করে তাঁর উপায় নেই। যারা আসে এবং যাদের সঙ্গে তিনি দেখা করেন তারা কোন্ জাতের লোক সুলোচনা তাও জানেন। মানুষ হিসেবে আজকের অবমানিত আগন্তুক তাদের অনেক ওপরে। অথচ যেহেতু তিনি কারো পত্রবাহক নন, যেহেতু কোন উঁচুপদের মানুষের সঙ্গে তাঁর খাতির নেই, তাই তাঁর শুকদেব-দর্শন হল না।

রাত্রিতে স্বামীকে জিজ্ঞেস করলেন, উনি এসেছিলেন?

কার কথা বলছো?

সকালে যাঁর সঙ্গে তুমি দেখা করলে না।

না। আসেন নি।

আসবেন না আমি জানতাম।

.শুকদেব মুখ তুলে তাকালেন। সুলোচনা কোন কথা বললেন না।

সুলোচনা যে-বস্তিতে সপ্তাহে একদিন সমাজকল্যাণ ব্রতের সাধনা করেন সেখানে দেখতে পান কচি একটি ম্লানমুখ মেয়েকে, নাম তার কমলা। পাঞ্জাবী মেয়ে, লালচে চুল কোনমতে রোগা রোগা আঙুল বাড়িয়ে পিঠ ছুঁয়েছে; রং শ্যামলা-শাদা, দেহের মধ্যে আকর্ষণীয় যা-কিছু হচ্ছে একজোড়া বড় বড় চোখ, তার মধ্যে অনেকখানি ক্লান্তির সঙ্গে খানিকটা কমনীয়তা। রোগা মেয়ে, সালোয়ার-কামিজ-উড়নি পরে কাজ করতে আসে বস্তিতে, সমাজকল্যাণের বৃহৎ আহ্বানে নয়, নেহাৎ চাকরির জৈব প্রয়োজনে। বস্তির মেয়েদের জন-স্বাস্থ্যে প্রথম পাঠ দেওয়া তার কাজ: কলেরার প্রকোপ হলে জল ফুটিয়ে খাবে, ইঁদারার জল খেয়ো না, বসন্তের প্রাদুর্ভাবে তাড়াতাড়ি টিকা নাও, এ-ধরনের প্রচার। সুলোচনা দেখতে পান মেয়েটি এক ঘর থেকে অন্য ঘরে যায়, স্ত্রীলোকদের সঙ্গে হেসে কথা বলে, কেমন একটা মিতালি হয়ে গেছে তার সঙ্গে বস্তিবাসীদের। সুলোচনার দিকে যে-লোকগুলি হাঁ করে তাকিয়ে থাকে, তাঁর কথা শুনতে গিয়ে কেমন অবাক্ হয়ে দেখে তাঁর দেহ, তাঁর শাড়ি আর গহনা—অবশ্য তিনি খুব সাধারণভাবে ওদের কাছে যান—আর সুলোচনার মনে হয় তাঁর একটা কথাও ওরা শুনছে না, তারা এই কমলাকে কেমন আপনার বলে মেনে নিয়েছে, যেন সে তাদেরই একজন।

একদিন এই মেয়েটি কুণ্ঠিত সম্ভ্রমে সুলোচনার একপাশে এসে দাঁড়াল; সুলোচনা চোখ তুলতে, নমস্কার করল।

কিছু বলবে আমাকে? প্রশ্ন করলেন সুলোচনা।

যদি অনুমতি করেন, জবাব দিল কমলা।

তার কাহিনী শুনলেন সুলোচনা। বাপ ছিল সরকারী দপ্তরে কেরানী। আড়াই বছর আগে, অবসর নেবার মুখে, হঠাৎ মারা গেছে। সংসার এখন কমলার ওপর। ছোট ছোট চারিটি ভাই-বোন, বিধবা মা। থাকে একখানা ঘরে, সেটা বস্তিরই সামিল। সম্বল এই চাকরি, যার মাসিক মূল্য নব্বই টাকা।

সরকারী নিয়মে তাঁদের কিছু পারিবারিক পেন্সন পাওয়ার কথা পাঁচ বছর।

সে-ব্যাপারটা এখনো ঝুলছে। চিঠিপত্র অনেক লিখেছে কমলা, অনেক ফর্ম সই করেছে; কিন্তু এখনো ফলাফল জানা যায় নি। প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের টাকা অবশ্যি পেয়েছিল বাপ মারা যাওয়ার দেড় বছর পর, সেটা দেনা শোধ করতে গেছে। গ্র্যাচুইটির এখনো সাক্ষাৎ নেই।

এই আড়াই বছর ফ্যামিলি পেন্সন পাও নি?

আজ্ঞে না।

তা, আমি কী করতে পারি?

আপনার স্বামী, মিঃ শর্মা একবার বলে দিলেই হয়। তাঁর দপ্তরে বাবা কাজ করতেন।

প্রয়োজনীয় বিবরণ টুকে নিলেন সুলোচনা। তাঁর মন দয়ার্দ্র হল। বললেন, আর দেরি হবে না। শিগ্‌গিরই পেয়ে যাবে।

আপনার কৃপা—, নমস্তে করে বিদায় নিল কমলা।

স্বামীর কাছে কথাটা তুললেন সুলোচনা, একটু উষ্ণতার সঙ্গে। ফ্যামিলি পেন্সন মানে হঠাৎ-মৃত কর্মচারীর পথে-নামা পরিবারকে আসন্ন সর্বনাশ থেকে বাঁচানো। যদি আড়াই বছর কেটে যায় এই করুণা-বারি পৌঁছে দিতে, তাহলে এর আসল উদ্দেশ্যই তো ব্যর্থ।

একটা ফাইল পড়তে পড়তে শুনলেন শুকদেব। বললেন, নিশ্চয়ই কোন গোলমাল আছে।

লোকটা মরে গেছে এতে তো কোন গোলমাল নেই! তার পরিবারের অবস্থা যে চরম দুর্গতির মুখে, তাতেও কোন গোলমাল নেই। যারা এসব ব্যাপার নিয়ে কাজ করে তাদের একটু মানবিকতা থাকা উচিত।

মানবিকতা দিয়ে শাসন চলে না। চলে নিয়মকানুন দিয়ে।

ঠোঁটে সিগারেট চেপে জবাব দিলেন শুকদেব।

নিয়মকানুন তো মানুষের তৈরি, আর মানুষেরই জন্যে তৈরি।

কিন্তু তা সব মানুষেরই ওপরে।

সব মানুষের ওপরে যে নয় তা তুমিও জানো, আমিও জানি।

একটু রাগ হল সুলোচনার।

এখন কথা হচ্ছে তুমি এটা করবে কিনা।

আঃ সুলোচনা! গরম হয়ে উঠলেন শুকদেব। তুমিও কি শেষে বামপন্থী

হয়ে উঠলে? আমার সময় কোথায় এসব ছোটখাটো ব্যাপার মনে রাখবার বা এসব নিয়ে মাথা ঘামাবার?

ছোট তো তোমার কাছে। কিন্তু ভেবে দেখো তো ঐ অনাথ পরিবারটির কথা।

বাপ রে বাপ, তুমি যে ভীষণ বক্তৃতা শুরু করলে। আমি এত বড় বড় ব্যাপারে ডুবে থাকি। আমার মনেই থাকবে না এসব সামান্য কথা।

আমি তোমাকে ফোন করে মনে করিয়ে দেব।

আচ্ছা, আচ্ছা। এখন কাজ করতে দাও।

শুকদেবকে দিয়ে কাজটা হাসিল করিয়েছিলেন সুলোচনা একমাসের মধ্যে। কৃতজ্ঞতায় গলে-যাওয়া কমলার মুখ দেখে তৃপ্তি পেয়েছিলেন। কিন্তু স্বামীকে নিয়ে ভাবনা হল সুলোচনার। শুকদেব কেমন যেন কঠিন হয়ে গেছেন। কেমন যেন অনেক উঁচুতে উঠে গেছেন, মানুষের, সাধারণ মানুষের, ধরা-ছোঁয়ার বাইরে। অথচ অতীতে তাঁর একটা সুন্দর প্রাণময়তা ছিল। নিজ কর্তব্যে কঠিন ছিলেন, কিন্তু মানুষের দুঃখ বুঝতেন। মনে আছে সুলোচনার, আগ্রায় যখন শুকদেব জেলা-ম্যাজিস্ট্রেট, তখন অনেকটা এই ধরনের—কি এর চেয়েও সাধারণ—ব্যাপারে সুলোচনাকে স্বামীর কাছে দাঁড়াতে হয়েছিল। সুলোচনা শুনতে পেয়েছিলেন, শুকদেবের দপ্তরের হেড ক্লার্ক বিনা অপরাধে একটি সাধারণ গরীব কেরানীকে চাকরি থেকে সরিয়ে নিজের লোক ঢোকাবার উদ্যোগ করেছে। কথাটা সুলোচনাকে বলেছিলেন জমিদার জগন্নাথপ্রসাদ নিগমের মেয়ে—সুলোচনার সহপাঠী। শুনে শুকদেব কিছু বলেন নি, কিন্তু পরের দিন দপ্তরে গিয়ে ব্যাপারটা অনুসন্ধান করেছিলেন। হেড ক্লার্কের মতলব ধরা পড়েছিল আর সেজন্যে লোকটাকে শুকদেব সহজে ছেড়ে দেন নি। তখন শুকদেবের হৃদয়ে দরদ ছিল।

বলেছিলেন সুলোচনাকে ঃ—সহায়কে—মনে তোমার সেই কেরানীকে—ডেকে পাঠিয়েছিলাম। বেচারা ভয়েই অস্থির, কথা বলবে কী? তবু যেটুকু বুঝলাম, ওর ওপর খুব একটা অন্যায় হতে যাচ্ছিল। হেড ক্লার্ক ভেবেছিল, ডি. এম. বড় বড় কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকেন, এসব ছোট ব্যাপারে মন দেবার সময় পাবেন না। বুঝলে সুলোচনা, ইট ইজ্ দ' স্মল থিংজ্স্ দ্যাট ম্যাটার ইন লাইফ।

সে-শুকদেব আর নেই। তিনি এখন বড়র পেছনে, বড়র মধ্যে; ছোট

জিনিসে আর মন নেই তাঁর। এখানেই স্থলোচনার ভয়। অনেক বড আদর্শ, বড নীতি, বড পরিকল্পনা, বড কথার মধ্যে জীবনের যা ছোট, যা একান্ত সাধারণ, যা নিয়ে মানুষ আর তার সমাজ আর তার দেশ, যা নিয়ে মানুষ সকাল থেকে রাত অবধি ব্যস্ত, পরিব্যাপ্ত, অবলুপ্ত, সেই ক্ষুদ্র, সাধারণ, সামান্য, ছোট যেন হারিয়ে যেতে বসেছে।

সলোমন কুচিয়োর আগে আরও একজন বিদেশী অতিথি রাজপথে শুকদেব-গৃহে স্থান পেয়েছিল। বিদেশী নয়, বিদেশিনী। বিদগ্ধ রমণী; তাই শুকদেবাকে সে খানিকটা দগ্ধে দিয়েছিল। স্থলোচনা তার কথা ভোলেন নি। শুকদেব তার কথা মনে করতে চান না।

সে এল, জ্বালাল, চলে গেল। কিন্তু অনেকখানি জ্বালা রেখে গেল।

চার

সন্ধ্যেটা বড বিষণ্ণ লাগছিল পিটার কাবাকুর। মাঝে মাঝে এমনি লাগে। মনে হয়, আমি কে, আমি কী, আমি কেন? কোথাকার আমি, এসেছি কোথায়? এসেছি কেন? কিছু কি পেয়েছি? কিছু কি কখনো পাবো?

মনে পড়ে নিজের গ্রাম ও দেশের কথা। গভীর অন্ধকারের মধ্যে তার জন্ম, সে অন্ধকার প্রধানত প্রকৃতির। বনে-জঙ্গলে আফ্রিকা কালো, তার মানুষের দেহের মতো কালো। কিনিয়ার যে গ্রামে পিটারের জন্ম, সেখানকার অন্ধকার শুধু প্রকৃতির নয়, শুধু মানুষের চামডার নয়, মানুষের মনেরও। বহুদিনের অন্ধকার সংস্কারের রাজত্ব এখনো দুর্বার। এই আলোহীন সংস্কারের বিরুদ্ধে পিটার বিদ্রোহ করেছিল। নাইরবিতে এসে তার চোখের অন্ধকার কিছুটা কেটে গেল। সে বুঝতে পারল বর্তমান জগতের সভ্যতার আলোকে উত্তীর্ণ হতে হলে কোন নিগ্রো সমাজকেই আর উপজাতি থাকলে চলবে না। জাতি হতে হবে।

অথচ জন্ম থেকেই উপজাতি-চেতনা পিটারকে গ্রাস করে রয়েছে। সে জানে, যতই সে দেখুক, বুঝুক, শিখুক আর জানুক, এই উপজাতি-সংস্কারের কঠিন বন্ধন থেকে তার মুক্তি নেই। গিকুয়ু সমাজ তাকে নানা দিক থেকে বেঁধে

রেখেছে। এ-সমাজের যে তিনটে স্তর—'স্বারি', তার নিজের রক্ত-সম্বন্ধী পরিবার, 'মোহেরেগা', তার গোষ্ঠি, এবং 'রুকা' তার সমবয়সী সংঘ—এর প্রত্যেকটির সঙ্গে তার অটুট বন্ধন। যে পরিবারে সে জন্মেছে তার সেই 'স্বারি'—সংখ্যায় কি তা-ই কম? বাপ বিয়ে করেছিল চারবার, চার স্ত্রী তাকে সন্তান দিয়েছে আঠারো; পিটাররা দশ ভাই, আট বোন; আট বোনের দু'জন বিবাহিত, তাদের সন্তান ইতিমধ্যে বাইশ; ছ' ভাই-এর সন্তান পনেরো। এদের সবার সঙ্গে পিটারের রক্তের যোগ; তারপর আছে তার কাকা-পিসি-মামা-মাসির দল। এসব নিয়ে তার 'স্বারি', যাদের প্রতি তার কর্তব্য প্রথম ও প্রধান, যাদের বাদ দিয়ে তার জীবন অসম্ভব। এর পরে তার 'মোহেরেগা'—এক পদবীর সবাইকে নিয়ে যা তৈরি, যারা সবাই কোনকালের একপুরুষের বংশধর। তারপর তার 'রুকা'—কয়েকখানা গ্রামে তিনশো চারশো সমবয়সীর সঙ্গে এই 'রুকা'য় সে আবদ্ধ। প্রাচীন প্রথা অনুসারে তাদের সবাইকে একসঙ্গে একদিন একমুহূর্তে 'ছুন্নৎ' করা হয়েছিল। এই 'রুকা'-ভাইদের প্রতি পিটারের কর্তব্য কম নয়। স্বারি, মোহেরেগা আর রুকার দাবি মিটিয়ে তবে না বৃহত্তর সমাজের দাবি, দেশের দাবি! পিটারের বাবা মোয়গাই কাবাকু গ্রামের নেতৃস্থানীয়দের অন্যতম! গৃহে সে সর্বেসর্বা, পিটারের সমাজে তাই নিয়ম। বাবার সঙ্গে পিটার ও তার ভাইবোনদের সব সময় সবিনয়ে নিচু গলায় কথা বলতে হত। মোয়গাই-এর বিরাট বাড়ি, পঞ্চাশটি ভেড়া। চার স্ত্রীর জন্যে চারটে আলাদা ঘর, তাদের প্রত্যেকের নিজস্ব সংসার, যৌথ পরিবারের সীমানার মধ্যেই। পিটার জননী ওয়ানজিরো রাশভারি জোয়ান স্ত্রীলোক, দৈহিক মেহনতে সমস্ত গ্রামে একক। বাপও প্রথমা স্ত্রীকে সমীহ করে চলত। ওয়ানজিরোর মজবুত কালো দেহ কঠোর শ্রমে কঠিন; ফসল ঘরে তোলার পরিশ্রমে সে-দেহে ঘামের প্রবাহ পিটারের আজও মনে পড়ে। অনেক বয়স পর্যন্ত শক্ত, সুবদ্ধ দেহ ছিল ওয়ানজিরোর, ছুটোছুটি করে কাজ করার সময়ে তার বড় বড় মজবুত স্তনদুটির ওঠানামা পিটার ভুলতে পারে না। বাপ এসে যখন বসত ওয়ানজিরোর ঘরের দাওয়ায়, পিটারের মা হাতের কাজ রেখে তার সামনে এসে দাঁড়াত, আর তার কৃষ্ণ, শ্রমকঠিন, মজবুত দেহের দিকে তাকিয়ে মোয়গাই-এর চোখে প্রশংসার আলো ঝিকমিক করত। পিটারের মায়তো (মা) সম্মান করে স্বামীকে ডাকত: মথুরী ওয়াকোয়া—আমার গুরু, আমার স্বামী। পিটার-জনক পান্টা সম্ভাষণ করত: মুতুমিয়া ওয়াকোয়া—আমার

রমণী। পিটার আর দুই ভাই এক বোন এক মায়ের সন্তান, এক গর্ভে তাদের সৃষ্টি, এক বুকের দুধ খেয়ে তারা মানুষ। তারা ইহজীবনে অচ্ছেদ্য।

মোয়গাই কারাকুর বেশ-কিছু জমি ছিল, তাই পাঁচখানা গ্রামে সে ছিল 'মোরামাতি'। এই মোরামাতি কথাটার মানে শুধু জমিদার নয়, সমাজে একজন অভিভাবক। বড় ছেলে পিটার, তাই একদিন সেও হবে মোরামাতি। বাপের কাছে গিকুয়ু জমি-ব্যবস্থার সবকিছু ছোটবেলায় তাকে শিখতে হয়েছে: সে জানে তার সমাজে জমির তাৎপর্য কী। তাদের জমির মালিক তার বাবা, বাবার পরে সব ভাইদের মধ্যে তা ভাগ হবে, কিন্তু আসলে জমি হচ্ছে সমস্ত গ্রামবাসীর, বিপদে, আপদে, দুর্ভিক্ষে উৎপন্ন শস্যে সমস্ত গ্রামের সমান অধিকার। জমির মালিক আলাদা হলেও ক্ষেতের কাজে গিকুয়ুরা সবাই একসঙ্গে এগিয়ে আসে, একত্র জমি চাষ করে, ফসল কাটে, কীট-পতঙ্গ দুশমনের শায়েস্তা করে। পিটার আজ অনেক দূরে সরে এসেছে, কিন্তু কিনিযার সেই কালো জমি তাকে সর্বক্ষণ আকর্ষণ করে। তাঁকে মনে করিয়ে দেয়, তুমি একা নও, তুমি অনেকের। তুমি সাধারণ মানুষ নও, তুমি মোরামাতি, তোমার মতো অনেক মানুষের তুমি অভিভাবক। বিধাতা তোমাকে নেতৃত্ব দিয়েছেন, মানুষের ওপর, মাটির ওপর।

শিশুকাল থেকে পিটার যে শিক্ষা পেয়ে এসেছে তার মধ্যে বহুর বিকাশ। মায়তো তাকে শৈশবে ছড়ার মধ্যে দিয়ে গিকুয়ু উপজাতির সারা ইতিহাস মুখস্থ করিয়েছিল। একটু বড় হতে গ্রামের প্রধানরা তাকে তীর-ধনুক-বর্শা-তলোয়ারে যোদ্ধা তৈরি করেছিলেন, নাচে, গানে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছিল যে তার জীবন সমাজের জন্যে। যখন সে প্রথম পাঠশালায় যেতে শুরু করে তখনো বাবা তাকে সে-কথাই বলেছিলেন, আর সেই একই কথা সে শুনেছিল গুরুমশায়ের কাছে। 'ছুন্নৎ' উৎসবে তিন-চারশো ছেলের সঙ্গে যেদিন তার 'নবজন্ম' হল সেদিনকার গানে-গানেও একই তাদের মনে খোদাই করে দেওয়া হয়েছিল।

পিটারের জীবনে প্রথম বিপ্লব বারো বছর বয়সে। গম্ভীর প্রকৃতির এই ছেলেটাকে নিয়ে মোয়গাই একটু ভাবিত হত। কথা বলে কম, ভাবে বেশি। পড়াশুনায় গভীর আগ্রহ। পাঠশালা থেকে গিকুয়ু বিদ্যালয়ে গেল পিটার, তার মেধা শিক্ষকদের প্রশংসা পেল। কিন্তু পিটারের মন 'অন্যত্র ধাবিত হয়েছে।

তার ইচ্ছে মিশনারি স্কুলে পড়বে। ইংরেজি শিখবে। সোজা গিয়ে মৃদুস্বরে পিতার কাছে ইচ্ছা নিবেদন করল।

মোয়গাই প্রথম ভয়ানক আপত্তি তুলল। মিশনারিরা নিগ্রোদের শত্রু, সারা আফ্রিকার দুশমন। তারা শ্বেত শাসকদের অগ্রদূত। কিনিয়ার নিগ্রোসমাজকে ভেঙে দেওয়া তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য। ওদের স্কুলে পড়লে পিটার নিজের সমাজ, সংস্কার, ধর্ম সবকিছুর প্রতি আস্থা হারাবে। বাবার উপরে কথা বলা অভাবনীয়, তাই নিঃশব্দে পিটার ফিরে গেল। পরদিন দেখা গেল গিকুয়ু বিদ্যালয়ে না গিয়ে সে সোজা হাজির হয়েছে মিশনারি স্কুলে।

বাপ বেদম প্রহার করল। কিন্তু সেদিন সন্ধ্যায় বয়োজ্যেষ্ঠদের সভায় পিটারের ভাগ্য বদলাল। সে-সময়টা উনিশশো ত্রিশের কাছাকাছি। জেমো কেনিয়াটার নেতৃত্বে কিনিয়ার নিগ্রোসমাজে নব-জাগরণের সূচনা হয়েছে। কেনিয়াটা তাঁর পত্রিকায় বলছেন, নিগ্রোদের সর্বাগ্রে শিক্ষিত হতে হবে। অজ্ঞানের অন্ধকার দূর করতে হবে। ইংরেজি না শিখলে বর্তমান জগতের সভ্যতার সন্ধান পাবে না নিগ্রোসমাজ। কেনিয়াটার বাণী গিকুয়ু গ্রামেও চাঞ্চল্য এনেছে। পিটার কাবাকুর গ্রাম তাদের অন্যতম। বয়োজ্যেষ্ঠদের আসর থেকে মোয়গাই উপদেশ পেল, পিটার যাক মিশনারি স্কুলে। তবে, সাবধান, সে যেন নিজের মূল থেকে ছিন্ন না হয়ে পড়ে। মিশনারি স্কুল থেকে পিটার উত্তীর্ণ হল। এবার তার দৃষ্টি গ্রামছাড়া ঐ অজানা পথে, যার পরিণতি রাজধানী নাইরবি। আরও পড়তে হবে। আরও জানতে হবে।

মোয়গাই-এর একেবারে ইচ্ছে ছিল না যে পিটার শহরে যায়। শহরকে সে আজীবন ভয় ও ঘৃণা করে এসেছে। তার ধারণা, ওখানে নিগ্রোর কপালে শুধু লাঞ্ছনা, অপমান, ব্যর্থতা আর আত্মবিস্মৃতি। কিন্তু পিটার নাছোড়বান্দা। সে যাবেই। গেলও। মোয়গাই এবার চাইল শহরগামী পুত্রের বিয়েটা হয়ে থাক। তাতে গ্রামে তার শিকড় মজবুত হবে।

কিন্তু এখানেও পিটার রাজি হল না। তার আপত্তিতে সবাই বিস্মিত হল। গিকুয়ু সমাজে ছেলেরা যৌবনের প্রারম্ভে বিয়ে করে। নারী হচ্ছে ভূমি, তাকে চাষ করে সন্তান উৎপন্ন করতে হবে, যত বেশি সম্ভব। পুরুষ যদি পূর্বাহ্ণে তৎপর না হয়, এই সীমিত উর্বর ভূমি থেকে কতটুকু পুরস্কার সে আদায় করতে পারবে? অনেক সন্তান জন্মালে, কয়েকটা বাঁচবে। শিশু-লোভী দেবদেবতাদের চাহিদা আছে, ভূত-প্রেতের অত্যাচার আছে, এসব থেকে

বাঁচিয়ে তবে তো কয়েকটি সন্তান বাখা যাবে মা-বাপের কোলে, সমাজের কল্যাণে।

গিকুয়ু সমাজে প্রথম বযস থেকে ছেলেমেয়েদেব অবাধ স্বাধীনতা একত্র মেশবাব, ঘনিষ্ঠ পবিচিত হবার। মনে-মনে নয়, দেহে-দেহেও। প্রত্যেক গ্রামে ছেলেমেযেদের আনন্দ-বিহারেব জন্যে একটি নির্দিষ্ট কুটির আছে। এখানে একবযসী সবাই এসে একত্রিত হয়। সবাই নানারকম খাবার নিয়ে আসে, একসঙ্গে বসে আহার কবে। তাবপর নাচ, গান, খেলা, সবাই নাচবে সবাব সঙ্গে, কোন সুন্দবী মেয়ে বা সুন্দব ছেলে নিজেব মনেব খুশিকে একচেটিয়া করে নেবে না। নাচেব পব শুরু হবে সেই আদর-আদর খেলা, মিশনাবিবা যাকে ভীষণ ব্যভিচাব নাম দিয়ে পৃথিবীর দববারে গিকুয়ুকে বর্বব প্রতিপন্ন করেছে। গিকুয়ু ভাষাব এ খেলাব নাম 'ঙ্গেওযেকো'। খেলা শুরু হবার কানুন আছে। নাচ গানেব পব ছেলেমেয়েবা একসঙ্গে বসে হাসি-গল্প কববে। হঠাৎ একটু নাটকায় ভঙ্গিতে একজন ঘোষণা কববে, এবাব আমাদে 'ঙ্গেওয়েকো'। সমবেত উল্লাসে এ ঘোষণার সমর্থন হবে। সাথী বাছাই কববে মেযেবা, কিন্তু স্বার্থপবের মতো নয়। যে মেয়ে তার পছন্দের ছেলেকেই শুধু বাছবে তাকে সবাই বলবে স্বার্থপব। এব চেযে বড গালি গিকুয়ু সমাজে নেই।

কুটিবে ছোট ছোট অনেকগুলি ঘর। প্রত্যেক ঘবে একখানা মাদুর-ঢাকা চৌকি। এই চৌকিতে এক একটি ছেলেমেয়ে খেলবে সেই তাদেব আদব-আদব খেলা। ছেলেটি সম্পূর্ণ নিরাবরণ, মেয়েটি কোমব পযন্ত নগ্ন। তার একটি চামডাব নিম্নবাস থাকবে অক্ষুণ্ন। বুকে-বুক-লাগা পাশাপাশি শুয়ে তারা খেলবে আদর-আদর খেলা। খেলতে খেলতে দুজনেই ঘুমিয়ে পডবে।

মিশনাবিরা প্রচাব কবেছে বর্বব গিকুয়ু সমাজে ছেলেবেলা থেকে ব্যভিচার অনুমোদিত। অথচ পিটাব জানে, 'ঙ্গেওয়েকো'ব পবিণতি যৌবনসম্ভোগে নয়। নিজেও সে অনেকবাব এ-খেলায় যোগ দিয়েছে, অথচ কোন মেয়েব সঙ্গে যৌন সম্পর্ক তো দূরের কথা, তাব মনে বং লাগাতেও কেউ পাবে নি। মনে রং ধবে নি, তাই কাপড রাঙাতে পিটাব বাজি হল না। তাব অন্তরে তখন কী এক অজানা, অচেনা সমুদ্রের ঝড। হৃদয়েব গভীরে কী অপূর্ব শিহরণ। জীবন তাকে ডাকছে, গ্রাম ছেড়ে অনেক, অনেক দূরে, নাইরবি শহবে। তাব মনে কেবল বেজে চলেছে, এখানে নয়, এখানে নয়, অন্য কোন-খানে। তরুণ বুকে তার প্রশ্নেব পব প্রশ্ন, সাগব-লহব-মালা।

বাপকে হতাশ করে, মাকে কাঁদিয়ে, গ্রামবাসীকে বিস্মিত করে পিটার গ্রাম ছাড়ল; যেদিন সে নাইরবি পৌছল সেদিনই আরেকটা বিরাট ঘটনা ঘটল। নাম তার দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ।

নাইরবি এসে পিটার টের পেল নিগ্রো-জন্মের কী জ্বালা! গ্রামে নিজের সমাজে শ্বেত-সম্পর্কের বাইরে, সংস্কারের ঘেরটানা জীবনে নিগ্রো অনেকখানি নিরাপদ। মিশনারি স্কুলের আবহাওয়ায় নিগ্রোর প্রতি করুণা আছে, ঘৃণা নেই। য়ুরোপের শাদা মানুষ তার উপজাতি-জীবনের সহস্র অন্ধকারকে সযত্নে বাঁচিয়ে রেখেছে। কেড়ে নিয়েছে তার উর্বর জমি, বঞ্চিত করেছে তাকে শিক্ষা, সভ্যতা, মনুষ্যত্বের উজ্জ্বল দাবিদাওয়া থেকে; কিন্তু গভীর মমতায় লালন করে রেখেছে তার অরণ্য-আদিমতা, যাতে দুনিয়ার দরবারে সহজে ঘোষণা করতে পারে নিগ্রো বর্বর, নিগ্রো মনুষ্যেতর। গ্রামের উপ-জাতিজীবনের নিঃসার গৌরবেই নিগ্রো মন এখনো পরিতুষ্ট; সে জানেও না যে পৃথিবীর আদালতে তার অনুপস্থিতিতেই বিদেশী প্রতিপক্ষ তার মানবিক অধিকারের বিরুদ্ধে ডিক্রিজারি করে নিয়েছে।

নাইরবি শহরে নেই গ্রামের কৃষ্ণ বিচ্ছিন্নতা। এখানে শ্বেতমানুষের ক্ষমতার সিংহাসন। পূর্ব-আফ্রিকার কালো দেহে লোহার বেড়ি বসাতে একদিন শাদা মানুষগুলো যেখানে হঠাৎ থেমে গিয়েছিল সেখানে গড়ে উঠেছে নাইরবি। শাদা মানুষের শহর হলে কী হবে, দোকান-পাট, খুচরো ব্যবসা সব ভারতীয়দের হাতে, আর দেহের শ্রম যোগায় কিনিয়ার কালো মানুষ। শাদা মানুষ শাসন করে, শহরের বাইরের রক্ষিত জঙ্গলে সিংহ শিকার করে। সারাফিতে বসে মদ খায়, নাইট-ক্লাবে নগ্নপ্রায় নারীর নৃত্য দেখে, একে অন্যের স্ত্রীকে নিয়ে বিছানায় শোয়। তামাটে মানুষ দোকান চালায়, আপিসে নানান ধরনের কুশলী কাজ করে; আদালতে তারা উকিল ব্যারিষ্টার, বিদ্যায়তনে শিক্ষক; তারা ডাক্তার, এনজিনিয়র; শাসনে তারা এখনো ভাগ পায় নি, তবে পাবে। শাদা মানুষ তাদের দোকানে জিনিস কেনে, আপিসে চাকরি দেয়; কিন্তু বাড়িতে ডাকে না, হোটেলে ঢুকতে দেয় না, সিনেমায় তাদের আসন আলাদা। সবার নিচে কালো মানুষ; আফ্রিকার আপন সন্তান। তারা গাড়ির চালক, বাড়ির চাকর, দপ্তরের চাপরাশি; তারা রাস্তায় ঝাড়ু লাগায়, নর্দমা সাফ করে, খনিতে কাজ করে, জমিতে চাষ করে। নাইরবিতে এসে পিটার প্রথম বুঝল, মানুষ বলে তার

স্বীকৃতি নেই। বোঝার সঙ্গে সঙ্গে একটা ভয়ানক জ্বালা তার সর্বাঙ্গ পুড়িয়ে দিতে লাগল। আমার দেশ, আমার জন্মভূমি, আমার জননী—অথচ আমি কেউ নই? এ বিধান কার? কত দিনের? আটমাইল দূরে তার স্বজাতির গ্রামে পিটার গিয়ে হাজির হল। শহরের কাছাকাছি বলেই এখানে সে দেখতে গেল একটা চাপা উত্তেজনা, অনুচ্চারিত জিজ্ঞাসা। সমবয়সী অনেক নিগ্রোর মনে সেই একই ব্যথা-জর্জর প্রশ্ন। সেই একই রক্তক্ষরা অপমানের মূক অনুভূতি। পিটার দেখতে পেল এসব গিকুয়ু রিজার্ভ তার নিজের বহুদূর গ্রাম থেকে একেবারে আলাদা। শহরের বাতাস এখানে অশান্তির বীজ ছড়িয়ে দিয়েছে, এখানে নেই সেই নিশ্চিত সন্তানের নিশ্ছিদ্র রাজত্ব। মানুষ বোবা ব্যথায় একে অন্যের দিকে তাকায় এখানে; কোন নিগূঢ় যন্ত্রণার ভাষা খোঁজে।

পিটার এসেছিল বিদ্যার সন্ধানে। দেখল বিদ্যালয়ের দ্বার কালো মানুষের কাছে রুদ্ধ। গিকুয়ু রিজার্ভে জোমো কেনিয়াটার উদ্যোগে বিদ্যালয় বসেছে, কিন্তু সেখানে তার কিছু শেখবার নেই। গ্রামের লোকেরা বলল, পিটার, তুমি শিক্ষিত, তুমি আমাদের শেখাও। পিটারের আত্মা চিৎকার করে উঠল: আমি শিক্ষিত নই, আমি একেবারে অজ্ঞ। আগে আমাকে জানতে দাও, বুঝতে দাও, শিখতে দাও। তারপর…

অর্থের অভাবে কাজের সন্ধানে নামতে হল। কয়েকটা কাজের সন্ধান জুটল। ভাঙাচোরা ইংরেজি বলতে পারার যোগ্যতা সাহায্য করল। এক সাহেব বাড়িতে চাকরের পদ দিতে রাজি হলেন। একটা সারাফিতে বাসন-ধোওয়ার কাজ পাওয়া গেল। একটা ভারতীয় দোকানে সহায়কের স্থানও জুটে গেল। পিটার ভাবল, কোন্‌টা নেবো। সম্মানের দিক থেকে ভারতীয় দোকানটা শ্রেয় মনে হল, কিন্তু কে যেন তার অন্তর থেকে বলে উঠল, পিটার, আগে বুঝে নাও, জেনে নাও, কোথায়, কতদূর, কতখানি ব্যথা তোমার জাতিকে বিদ্ধ করেছে। সে-ব্যথার সবটুকু যদি তুমি না বোঝো, তাহলে তোমার শিক্ষা পূর্ণ হবে না।

পিটার এক শ্বেতাঙ্গের বাড়িতে চাকর হয়ে কর্মজীবন শুরু করল।

নাইরবি শব্দের প্রকৃত অর্থ মিষ্টি-জল। মানুষের জন্যে নয়, গৃহপালিত পশুর জন্যে। উর্বর কিনিয়ার মাটিতে ইংরেজ তৈরি করেছে সারা আফ্রিকায় তার সবচেয়ে মূল্যবান উপনিবেশ। সেই ইংরেজকে ভালো করে

জানতে হবে পিটার কাবাকুর। শত্রুকে না জানলে তার সঙ্গে সে লড়বে কী করে?'

যে ইংরেজ তাকে ভৃত্যের সম্মান দিল তার নাম আলেক অ্যাসবি। একটা ব্যাঙ্কের মাঝারি অফিসার। বয়স চল্লিশ মাত্র ছাড়িয়েছে—শীর্ণ দেহ, গাল দুটো ভেঙে চোয়ালের হাড় বেরিয়ে এসেছে, নীল চোখ দুটো গর্তের মধ্যে ঢোকানো। টিকোলা নাক, চাপা, কুঞ্চিত কপাল। সরু করে ছাঁটা গোঁফের নিচে দুটি কামুক ঠোঁট, চিবুকটা আশ্চর্যরকম মোলায়েম। চোখের ওপর গুচ্ছ গুচ্ছ ভ্রূ। বাহু ও হাতে রোদে-পোড়া শাদা চামড়ার গায়ে মোটা মোটা নীল শিরার প্রবাহ। আলেক অ্যাসবি ইংলণ্ডের শ্রমিক পরিবারে জন্মেছিল একটি কুমারী মেয়ের গর্ভে। তার বাপ সেই মেয়েকে কোনদিন বিবাহ করে নি। আলেকের যখন পাঁচ বছর বয়স, তখন তার মার বিয়ে হয়েছিল যে-মানুষটার সঙ্গে সে রোজ মাতাল হয়ে গভীর রাতে বাড়ি ফিরে তার মাকে ধরে মারত, জুয়ায় উড়িয়ে দিত রোজগারের অর্ধেক, এবং প্রায়ই অন্য স্ত্রীলোকদের বাড়িতে রাত কাটাত। কিন্তু এই পাঁচ বছরের ছেলেটার প্রতি তার কেমন একটা অদ্ভুত মায়া ছিল। তারই উৎসাহে আলেক পারিস স্কুলে ভর্তি হল, সেখান থেকে গেল কয়লার খনির মজুরদের জন্যে তৈরি উচ্চ বিদ্যালয়ে। ম্যাট্রিকুলেশান পাশ করার পর একদিন সে লণ্ডনের পথে রওনা হল। সেখানে সামান্য একটা কাজ জুটিয়ে রাতে ব্যাঙ্কিং পড়ল। কেরানীর চাকরি পেল একটা ব্যাঙ্কে। উচ্চাশার তাপে একদিন উন্নততর পদে চলে এসেছিল কিনিয়ায়। কিন্তু যতটা আশা করেছিল, জীবন তাকে ততখানি দেয় নি। ভেবেছিল পাঁচ-দশ বছরেই ব্যাঙ্কের ম্যানেজার হবে, লাখ-দু'লাখ টাকার মালিক হবে। মাঝারি একটা স্তরে পৌঁছে তার অগ্রগতি কেন যেন থেমে গেছে। অবশ্য এর জন্যে দায়ী সে নিজেই। অথবা, তার স্ত্রী রোজ।

রোজকে আলেক অ্যাসবি বিয়ে করেছে নাইরবিতে। সুন্দরী মেয়ে রোজ, যেমন মুখশ্রী, তেমনি দেহের গড়ন। কিংসলে রোজের তৃতীয়া কন্যা, যে কিংসলে রোজ নাইরবির রাজপথের মাথায় নাইট ক্লাবে পিয়ানো বাজায়। ওখানেই রোজ গান করত, আর দেহকে প্রায় অনাবৃত করে কাবারেতে নাচত। প্রথমে গান গাইত স্টেজের ওপর দাঁড়িয়ে। তারপর সব পুরুষের সব বাসনা-জমা দেহের ওপর মসৃণ সিল্ক জড়িয়ে শুরু হত তার নাচ। নাচতে নাচতে রেশমী আবরণ এক সময় দেহ থেকে সরে যেত। তখন শুধু তার দুটি বুকে

স্বীকৃতি নেই। বোঝার সঙ্গে সঙ্গে একটা ভয়ানক জ্বালা তার সর্বাঙ্গ পুড়িয়ে দিতে লাগল। আমার দেশ, আমার জন্মভূমি, আমার জননী—অথচ আমি কেউ নই? এ বিধান কার? কত দিনের? আটমাইল দূরে তার স্বজাতির গ্রামে পিটার গিয়ে হাজির হল। শহরের কাছাকাছি বলেই এখানে সে দেখতে গেল একটা চাপা উত্তেজনা, অনুচ্চারিত জিজ্ঞাসা। সমবয়সী অনেক নিগ্রোর মনে সেই একই ব্যথা-জর্জর প্রশ্ন। সেই একই রক্তক্ষরা অপমানের মূক অনুভূতি। পিটার দেখতে পেল এসব গিকুয়ু রিজার্ভ তার নিজের বহুদূর গ্রাম থেকে একেবারে আলাদা। শহরের বাতাস এখানে অশান্তির বীজ ছড়িয়ে দিয়েছে, এখানে নেই সেই নিশ্চিত সন্তানের নিশ্ছিদ্র রাজত্ব। মানুষ বোবা ব্যথায় একে অন্যের দিকে তাকায় এখানে; কোন নিগূঢ় যন্ত্রণার ভাষা খোঁজে।

পিটার এসেছিল বিদ্যার সন্ধানে। দেখল বিদ্যালয়ের দ্বার কালো মানুষের কাছে রুদ্ধ। গিকুয়ু রিজার্ভে জোমো কেনিয়াটার উদ্যোগে বিদ্যালয় বসেছে, কিন্তু সেখানে তার কিছু শেখবার নেই। গ্রামের লোকেরা বলল, পিটার, তুমি শিক্ষিত, তুমি আমাদের শেখাও। পিটারের আত্মা চিৎকার করে উঠল: আমি শিক্ষিত নই, আমি একেবারে অজ্ঞ। আগে আমাকে জানতে দাও, বুঝতে দাও, শিখতে দাও। তারপর···

অর্থের অভাবে কাজের সন্ধানে নামতে হল। কয়েকটা কাজের সন্ধান জুটল। ভাঙাচোরা ইংরেজি বলতে পারার যোগ্যতা সাহায্য করল। এক সাহেব বাড়িতে চাকরের পদ দিতে রাজি হলেন। একটা সারাফিতে বাসন-ধোওয়ার কাজ পাওয়া গেল। একটা ভারতীয় দোকানে সহায়কের স্থানও জুটে গেল। পিটার ভাবল, কোন্‌টা নেবো। সম্মানের দিক থেকে ভারতীয় দোকানটা শ্রেয় মনে হল, কিন্তু কে যেন তার অন্তর থেকে বলে উঠল, পিটার, আগে বুঝে নাও, জেনে নাও, কোথায়, কতদূর, কতখানি ব্যথা তোমার জাতিকে বিদ্ধ করেছে। সে-ব্যথার সবটুকু যদি তুমি না বোঝো, তাহলে তোমার শিক্ষা পূর্ণ হবে না।

পিটার এক শ্বেতাঙ্গের বাড়িতে চাকর হয়ে কর্মজীবন শুরু করল।

নাইরবি শব্দের প্রকৃত অর্থ মিষ্টি-জল। মানুষের জন্যে নয়, গৃহপালিত পশুর জন্যে। উর্বর কিনিয়ার মাটিতে ইংরেজ তৈরি করেছে সারা আফ্রিকায় তার সবচেয়ে মূল্যবান উপনিবেশ। সেই ইংরেজকে ভালো করে

জানতে হবে পিটার কাবাকুর। শত্রুকে না জানলে তার সঙ্গে সে লড়বে কী করে?

যে ইংরেজ তাকে ভৃত্যের সম্মান দিল তার নাম আলেক অ্যাসবি। একটা ব্যাঙ্কের মাঝারি অফিসার। বয়স চল্লিশ মাত্র ছাড়িয়েছে—শীর্ণ দেহ, গাল দুটো ভেঙে চোয়ালের হাড় বেরিয়ে এসেছে, নীল চোখ দুটো গর্তের মধ্যে ঢোকানো। টিকোলা নাক, চাপা, কুঞ্চিত কপাল। সরু করে ছাঁটা গোঁফের নিচে দুটি কামুক ঠোঁট, চিবুকটা আশ্চর্যরকম মোলায়েম। চোখের ওপর গুচ্ছ গুচ্ছ ভ্রূ। বাঁহু ও হাতে রোদে-পোড়া শাদা চামড়ার গায়ে মোটা মোটা নীল শিরার প্রবাহ। আলেক অ্যাসবি ইংলণ্ডের শ্রমিক পরিবারে জন্মেছিল একটি কুমারী মেয়ের গর্ভে। তার বাপ সেই মেয়েকে কোনদিন বিবাহ করে নি। আলেকের যখন পাঁচ বছর বয়স, তখন তার মার বিয়ে হয়েছিল যে-মানুষটার সঙ্গে সে রোজ মাতাল হয়ে গভীর রাতে বাড়ি ফিরে তার মাকে ধরে মারত, জুয়ায় উড়িয়ে দিত রোজগারের অর্ধেক, এবং প্রায়ই অন্য স্ত্রীলোকদের বাড়িতে রাত কাটাত। কিন্তু এই পাঁচ বছরের ছেলেটার প্রতি তার কেমন একটা অদ্ভুত মায়া ছিল। তারই উৎসাহে আলেক পারিস স্কুলে ভর্তি হল, সেখান থেকে গেল কয়লার খনির মজুরদের জন্যে তৈরি উচ্চ বিদ্যালয়ে। ম্যাট্রিকুলেশান পাশ করার পর একদিন সে লণ্ডনের পথে রওনা হল। সেখানে সামান্য একটা কাজ জুটিয়ে রাতে ব্যাঙ্কিং পড়ল। কেরানীর চাকরি পেল একটা ব্যাঙ্কে। উচ্চাশার তাপে একদিন উন্নততর পদে চলে এসেছিল কিনিয়ায়। কিন্তু যতটা আশা করেছিল, জীবন তাকে ততখানি দেয় নি। ভেবেছিল পাঁচ-দশ বছরেই ব্যাঙ্কের ম্যানেজার হবে, লাখ-দু'লাখ টাকার মালিক হবে। মাঝারি একটা স্তরে পৌঁছে তার অগ্রগতি কেন যেন থেমে গেছে। অবশ্য এর জন্যে দায়ী সে নিজেই। অথবা, তার স্ত্রী রোজ।

রোজকে আলেক অ্যাসবি বিয়ে করেছে নাইরবিতে। সুন্দরী মেয়ে রোজ, যেমন মুখশ্রী, তেমনি দেহের গড়ন। কিংসলে রোজের তৃতীয়া কন্যা, যে কিংসলে রোজ নাইরবির রাজপথের মাথায় নাইট ক্লাবে পিয়ানো বাজায়। ওখানেই রোজ গান করত, আর দেহকে প্রায় অনাবৃত করে কাবারেতে নাচত। প্রথমে গান গাইত স্টেটের ওপর দাঁড়িয়ে। তারপর সব পুরুষের সব বাসনা-জমা দেহের ওপর মসৃণ সিল্ক জড়িয়ে শুরু হত তার নাচ। নাচতে নাচতে রেশমী আবরণ এক সময় দেহ থেকে সরে যেত। তখন শুধু তার দুটি বুকে

আধো-ঢাকা কাঁচুলি, আর কোমরের নিচে নিতান্ত সংক্ষিপ্ত আবরণ। নাচের তালে তালে নাচত তার সুপুষ্ট স্তন; প্রশস্ত ভাবী নিতম্ব। স্টেজ থেকে নেমে এসে টেবিলে টেবিলে ঘুরে ঘুরে নাচত রোজ কিংসলে। নাইরবি শহরের সে ছিল রাত-কি-রাণী।

এই রোজ কিংসলের সঙ্গে আলেক অ্যাসবির কীভাবে বিয়ে হল সেটা শহরের অন্যতম নিরুত্তর প্রশ্ন। অ্যাসবি প্রতি রাতে 'লায়ন' নাইট ক্লাবে হাজির হত, উপহার পাঠাত ঘন ঘন: 'টু দ ষ্টার অব নাইরবি—টু দ ব্রাইটেষ্ট রোজ।' একদিন সবাই দেখল তাদের এনগেজমেন্টের বিজ্ঞাপন নাইরবি টাইম্‌স্‌-এ একমাস পরে মহা-সমারোহে তারা স্বামী-স্ত্রী হল।

নিতান্ত অকাব্যিক অর্থে এই রোজের চোখেই লেখা ছিল অ্যাসবির সর্বনাশ। 'লায়ন' থেকে সে কিছুতেই রোজকে ছাড়িয়ে আনতে পারল না। বিয়ের আগে এ-বিষয়ে সে কোন কথা তোলে নি। বিয়ের পরে রোজকে বাধা দিতে গিয়ে দেয়ালে ঠোক্কর খেল। সপ্তাহে চার রাত রোজ নিয়মিত কাবারে নাচ দেখায়, আর বহু-জন-তৃষিত তার দেহ একটা বিরাট আগুনের শিখার মত আলেক অ্যাসবির সর্বাঙ্গ দহন করে। দিনরাত এই গভীর জ্বালা থেকে তার নিস্তার নেই। উপহারের স্তূপ বহন করে রোজ গভীর রাতে বাড়ি ফেরে—সমস্ত রাত নিজের আলাদা ঘরে অ্যাসবি বিনিদ্র যন্ত্রণায় জ্বলে। বিয়ের পরেও রোজ তার পেশাই শুধু বজায় রাখে নি, তার বন্ধু ও স্তাবকরাও সমানে অ্যাসবির বাসগৃহ 'প্যারাডাইস'-এ ভিড় জমায়। নাইরবির শ্বেতসমাজে নীতির বেড়া খুব হালকা; রোজের জীবন-বেদ সেদিক থেকে বিরল নয়। বরং অ্যাসবির এই জ্বালাময়ী ঈর্ষাই আশ্চর্যের। সে-জ্বালা মেটাতে সে অত্যধিক পান করে, তাতে দহন বাড়ে, কমে না। কাজকর্মে তার মন নেই, কথাবার্তায়, ব্যবহারে এমন একটা কবোষ্ণ কর্কশতা, যার জন্যে শ্বেতাঙ্গসমাজেও সে আর সহনীয় নয়।

আলেক অ্যাসবির বাড়ির দরজায় দাঁড়িয়ে পিটার প্রস্তরফলকে দেখতে পেল: 'প্যারাডাইস'। ছোট একটা পাহাড়ের ওপর সুন্দর ভিলা টাইপের বাড়ি, বাগানে সুদৃশ্য গাছ-পালা-ফুলের সুসজ্জিত আসর। গেট থেকে বাড়ি অবধি লাল সুরকির রাস্তা চলে গেছে।

দরজায় দাঁড়িয়ে পিটার নিজের মনেই উচ্চারণ করল: প্যা-রা-ডা-ই-স!

হঠাৎ পাঁচিলের আরেক দিক থেকে কর্কশ স্বরে কে যোগ দিল: লস্ট।

চমকিত পিটার তাকিয়ে দেখল একটা আরাম-কেদারায় অর্ধ-শায়িত তার মনিব। সামনে গোল বেতের টেবিলে মদের বোতল। সোডার বোতল। গ্লাসের অর্ধেকটায় তরল পানীয়। পিটার মাথা নিচু করে অভিবাদন জানাল।

কে? চোখ তুলে তাকাল আলেক অ্যাসবি। ও, পিটার? পিটার দি নিগার? আমার নবতম ভৃত্য?

পিটার আবার সেলাম করল।

কাম ইন, কাম ইন—ঘোৎ ঘোৎ করে বলল অ্যাসবি। কাম ইনটু প্যারাডাইস লস্ট।

জীবনে এই প্রথম শ্বেতাঙ্গ-সংস্পর্শ পিটার কাবাকুর জীবনে অন্যতম বিরাট ঘটনা। অ্যাসবি হয়তো পুরোপুরি কলোনিয়াল সাহেব হতে পারত যদি না রোজ নামক একটা প্রকাণ্ড ফাঁক ও ফাঁকি জমা হয়ে উঠত তার জীবনে; যদি শ্বেতাঙ্গসমাজের অলস-বিলাস ও অন্ধ আত্মতুষ্টির মধ্যে পূর্ণ খোরাক পেয়ে সন্তুষ্ট হত তার মন। অ্যাসবির উৎপত্তি ইংলণ্ডের একটা কারখানা বা শহরের শ্রমিক অঞ্চলে। অবৈধ লালসায়। শুধু মায়ের বিবাহিত স্বামীর অনুকম্পায় তার জীবন তৈরি, আর নিজের উচ্চাশায়। এই উচ্চাশার তাড়নায় স্বদেশ ত্যাগ করে সাম্রাজ্যের অজ্ঞাত ভূমিতে ভাগ্য নির্মাণ করতে একদিন সে বেরিয়ে পড়েছিল। আফ্রিকা কী বা কাদের এ প্রশ্ন তার মনে কোনদিন ওঠে নি। কালো কুৎসিত মানুষগুলোকে ইংরেজ সভ্যতার আস্বাদ দিয়েছে, মানুষ করে তোলবার অসম্ভব দায়িত্ব নিয়েছে, এটুকুই সে জানত ও বুঝত। বহু নাইট ক্লাব, সুরা ও সহজলভ্য শ্বেতাঙ্গ রমণীর দেহ নিয়ে কিনিয়ায় জীবন পেতে বসবার প্রথম কয়েক বছর তার মনে আফ্রিকার ভবিষ্যৎ নিয়ে কোন সন্দেহের ছায়া পড়ে নি। কিন্তু 'লায়ন'-এর রোজ কিংসলের প্রেমে পড়ে, তাকে বিয়ে করেও নিজের করে না পেয়ে তার জীবনটা তচনচ হয়ে যাবার পরে মাঝে মাঝে একটা প্রশ্ন তার মনের গভীর অন্ধকারে মাথা তুলেই হারিয়ে যেত। মাঝে মাঝে মনে হত নিজের অস্তিত্বের মতো সমগ্র শ্বেতাঙ্গ-জীবনটাই আফ্রিকার বুকে মস্ত একটা ফাঁকির ওপর দাঁড়িয়ে রয়েছে। বাইরেকার জৌলুসের অভাব নেই। ভেতরটা একেবারে নিঃসার।

আলেক অ্যাসবির গৃহস্থালিতে পিটার কাবাকুর স্থান যতই অপাংক্তেয় হোক না কেন, গায়ের চামড়া আর নিগ্রো-জন্ম তাকে যতই নিচু করে রাখুক না কেন, কিছুদিনের মধ্যে ভৃত্য ও মনিবের মধ্যে কেমন একটা সহানুভূতির

সম্পর্ক গড়ে উঠল। পিটার দেখতে পেল আলেক ও রোজের মধ্যে ব্যবধান দুস্তর; রোজ থাকে তার বিলাস-ব্যসন নিয়ে, আর আলেকের একমাত্র বন্ধু সুরা। 'লায়নে' যেদিন নাচতে হয়, রোজ ফিরে আসে গভীর রাতে; তখন আলেক মদের নেশায় বিকৃত নিদ্রায় অচেতন। নাচ থেকে ছুটির সন্ধ্যেয় জড়ো হয় বন্ধুবাহিনী, তাদের সঙ্গে অনেক সময় রোজ বেরিয়ে যায়, আর আলেক বাগানে বসে গ্লাসের পর গ্লাস পান করে চলে। কখনো দুজনে মিলে কোন সান্ধ্য বা নৈশ পার্টিতে যায়, যেখানে স্বামী-স্ত্রী একসঙ্গে না গেলেই নয়। কখনো বা দুজনে একসঙ্গে বসে ব্রেকফাষ্ট করে। দু'চারটে কথাবার্তা হয়। কখনো কখনো পিটার মধ্যরাতে শুনতে পায় আলেক রোজের শয়নকক্ষের দরজা ধাক্কা দিচ্ছে, আর বলছে, 'রোজ, রোজ, দরজা খোলো'—তার কর্কশ কামুক স্বর মদের বিষে সর্পিল। কোন কোন রাতে দুজনের প্রচণ্ড বচসা তার কানে আসে, কুৎসিত গালি, নোংরা কলহ, কদর্য অভিযোগ। আবার ক্বচিৎ কোনদিন সকালে ঘর সাফ করতে এসে পিটারের চোখে পড়ে আলেক ও রোজ একই বিছানায় শুয়ে আছে। জীবনের একটা দুর্বোধ্য হিসেবনিকেশ আছে, যেখানে সবটাই একেবারে শূন্য নয়।

রোজ অ্যাসবি, পিটারের গৃহকর্ত্রী, প্রথম প্রথম পিটারকে যেন দেখতেই পেত না। সকাল থেকে রাত অবধি পিটার নিঃশব্দে কাজ করে যাচ্ছে, বার বার রোজ তাকে ডেকে ফরমাস করছে; পুরোনো অভ্যেস: বাড়িতে চার-পাঁচটা নিগ্রো ভৃত্য আছে, তাদের মধ্যে পিটার একজন। পিটার নামটাই তার মনে আসত না, ডাকত, 'এই ছোকরা!' পিটারের কাজ প্রধানত মনিবের সেবা করা; জুতো থেকে বমিও সাফ করা। কিন্তু তার চকচকে কালো দেহে এমন একটা ব্যক্তিত্বের আভাস ছিল, চালচলনে নীরব আনুগত্যের সঙ্গে এমন একটা সহজ সম্মানবোধ, যা চাকরদের মধ্যে তাকে একটু আলাদা করে রাখত। কিছুদিন পরে রোজের নজরেও এই আলাদাটুকু ধরা পড়ল এবং তার নিজস্ব প্রয়োজনে পিটারের তলব বেড়ে গেল। বন্ধুরা এলে তাদের দেখাশোনা করতে রোজ পিটারের সাহায্য নিত, বলত, এই নিগ্রো ছোঁড়া তবু প্রেসেণ্টেবল্—বাকিগুলো একেবারে বর্বর। রোজের ব্যক্তিগত কাজের জন্যে একটা নিগ্রো স্ত্রীলোক ছিল; সে তার জামা-কাপড়ের তদারক করে, প্রসাধনে সাহায্য। পিটারকে রোজ ব্যবহার করতে লাগল তার নানারকম গোপন দৌত্যে: বন্ধুদের কাছে বার্তা পাঠান, ডাকঘর থেকে চিঠি নিয়ে আসা। আস্তে আস্তে পিটার নামটা

রোজের চেতনায় বসে গেল। 'ইউ, নিগার বয়' না বলে, রোজও বলতে লাগল, 'ইউ, পিটার!'

একদিন সন্ধ্যেয় রোজ গেছে 'লায়নে'। আলেক দপ্তর থেকে ফিরে কিছুক্ষণ শূন্যমনে ঘরে বসে দু'-একখানা চিঠি পড়েছে, একটা ম্যাগাজিনে চোখ বুলিয়েছে, সকালবেলার সংবাদপত্রখানা নাড়াচাড়া করেছে। পিটার দু'চারবার আশেপাশে ঘুরে গেছে, আদেশের প্রতীক্ষায়। দূর থেকে লক্ষ্য করেছে মনিবের মতিগতি।

আলেক টাই খুলে ফেলতেই পিটার সামনে এসে দাঁড়াল হ্যাংগার নিয়ে। টাই, কোট সাজিয়ে রাখল সযত্নে ওয়ার্ড্রোবে। তারপর সবিনয়ে প্রশ্ন করল, সান্ধ্য-পোষাক বার করবো তো হুজুর?

কেন? সান্ধ্য-পোষাক কেন? বিস্মিত বিরক্তিতে প্রশ্ন করল তার মনিব।

মাননীয় মিঃ রাসেলের বাড়িতে আপনার ককটেল পার্টি আছে।

হায় ঈশ্বর! কঁকিয়ে উঠল অ্যাসবি: ককটেল অ্যাট্ রাসেল্‌স্? নিস্তার নেই, নিস্তার নেই।

পিটার চুপ করে মাটির দিকে তাকিয়ে রইল।

যাবার ইচ্ছে নেই, পিটার।

পিটার দাঁড়িয়ে রইল।

আই সী! বলল অ্যাসবি: তুমি ভাবছ, আমাকে যেতেই হবে? বোধ হয় ঠিকই ভাবছ। যেতেই হবে, পিটার। পোষাক বার করো।

পিটার প্রস্থানের উপক্রম করতে আলেক ডাকল।

পিটার!

হুজুর।

এসব পার্টিতে কী হয় তুমি জানো?

পিটার নীরব।

হয় অনেক কিছু। শুধু একটা খবর তোমাকে দিচ্ছি। ডিনার পার্টিতে খাওয়া শেষ হলে আমরা বাথরুমে যাই নে। বাইরে বেরিয়ে এসে অন্ধকারে উঁচু দেওয়ালের সামনে লাইন বেঁধে দাঁড়িয়ে যাই। প্যান্টের বোতাম খুলে একসঙ্গে বলে উঠি—'টু আফ্রিকা!'

পিটারের মাংসপেশী হঠাৎ শক্ত হয়ে উঠল। তার চোখ উঠল চকচক করে।

আর অ্যাসবি তার কর্কশ গলায় হোহো করে হেসে উঠল।

টু আফ্রিকা! টু আফ্রিকা! হ্যাট্‌স্ হাউ উই টোষ্ট ব্লাডি আফ্রিকা! কিন্তু পিটার, তুমি ধরা পড়ে গেছো। ইউ আর ফাউণ্ড আউট। তোমাকে এখন আমার পুলিশে দেওয়া উচিত।

পিটার অবাক্ হয়ে তাকিয়ে রইল মনিবের দিকে।

আমি তোমার চোখের ঝিলিক দেখেছি, ইউ ব্লাডি নিগার বয়, আমি তোমার মাংশপেশীর আকস্মিক কুঞ্চন লক্ষ্য করেছি! তুমি ধরা পড়ে গেছো।

এবার পিটার মুখ খুলল। অসহ বেদনা তার চোখে পুঞ্জিত হয়ে উঠেছে। এখন আর তার মনে কোন রাগ নেই। শুধু ব্যথা। ধীরে ধীরে সে বলল, আফ্রিকা আমার দেশ।

অ্যাসবি যেন চমকে উঠল। হাত বাড়িয়ে সামনের টেবিল থেকে মদের বোতল নিয়ে গ্লাসে ঢেলে একটা 'ড্রাই' গ্রহণ করল। তারপর বলল: ও নো, নো ফিয়র্স! কে বললে আফ্রিকা তোমার দেশ? আফ্রিকা আমাদের—আফ্রিকা য়ুরোপের। শোনো নি সেই ঘোষণা: য়ুরোপের সীমানা আফ্রিকা পর্যন্ত?

পিটারের চোখে চোখ পড়ল অ্যাসবির। দু'-জোড়া চোখেই জমা বেদনা। আলেক যেন নিজের নীল চোখের ছায়া দেখতে পেল পিটারের কালো চোখের মণিতে। তার মন বলে উঠল, আমারও নেই, ওরও নেই। ওর দেশ নেই, আমার ঘর নেই। মনটা টনটন করে উঠল। হাতটা শক্ত হয়ে গেল। ঠাস করে একটা চড় বসিয়ে দিল আলেক অ্যাসবি পিটারের গালে। বোমা-ফাটা গলায় চেঁচিয়ে উঠল, গেট্ অ্যাওয়ে, ইউ ব্লাডি ডগ! এ ডগ হ্যাজ নো কান্ট্রি। গো এণ্ড গেট মাই ক্লোদ্‌স্।

মহাযুদ্ধ কিনিয়ায় চাঞ্চল্য এনেছে। ইংরেজ কিনিয়াকে বিরাট সামরিক ঘাঁটিতে পরিণত করতে লেগে গেছে। প্রতি সপ্তাহে আসছে সৈন্য, রণসম্ভার। সৈন্য আসছে ইংলণ্ড থেকে, মধ্যপ্রাচ্য থেকে, ভারত থেকে। অনেক নিগ্রো নতুন চাকরি পাচ্ছে, ভারতীয় দোকানগুলো জমজমাট। নিগ্রো মেয়েদের কালো দেহের দাম পর্যন্ত হঠাৎ বেড়ে গেছে। আর বেড়ে গেছে নিগ্রো মনের অপমান, দহন।

নিগ্রোরাও একেবাঁরে অচঞ্চল থাকে নি। জোমো কেনিয়াটা তাঁর রাজনৈতিক

দল গঠন করতে শুরু করেছেন। সংখ্যায় কম হলেও, আগুনে-জ্বলা কয়েকটি নিগ্রো তাঁর শিষ্যত্ব নিয়েছে। গোপনে এরা প্রচার করছে কেনিয়াটার বাণী। গিকুয়ু নিগ্রোকে সচেতন করে তোলার কাজ আরম্ভ হয়েছে। নাইরবির মাইল আটেক দূরে গিকুয়ু পল্লীতে রাত্রির অন্ধকারে মাঝে মাঝে গোপন সভা বসে। অন্ধকারের সঙ্গে মিশ খেয়ে বসে যায় মানুষের সারি। শুধু ধবধবে শাদা আবরণ তারার আলোয় ফ্যাকাসে দেখায়। মানুষগুলি বসে থাকে চুপ করে, যেন আধ-ঘুম তাদের দেহে। একজন—কে কোথা থেকে এসেছে জানে শুধু দু-চারজন—বলে যায় একটানা ভাষায় কিনিয়ার কথা। কিনিয়ার স্বাধীনতার কথা নয়, জমির কথা। প্রত্যেক নিগ্রোর কাছে এটাই সবচেয়ে বড় কথা। তার জীবনের প্রধান সমস্যা, জমি নেই। উর্বর সোনা-ফলানো জমির প্রায় সবটা শ্বেতাঙ্গ বাসিন্দাদের দখলে : চার হাজার ইংরেজ ভোগ করছে ষোলো হাজার বর্গমাইল চাষের জমি। নিগ্রো যা পেয়েছে সে-ভূমি অতিশয় দীন, প্রকৃতির স্নেহ-বঞ্চিত। পাঁচ লক্ষ গিকুয়ুর ভাগ্যে মাত্র দু'হাজার বর্গমাইল নিকৃষ্ট জমি; অন্যান্য উপজাতিগুলির অবস্থাও তাই। কিনিয়ার উপজাতিগুলির মধ্যে গিকুয়ুই সংখ্যায় প্রধান, অন্যান্য বিষয়েও অপেক্ষাকৃত অগ্রসর।

জমির সমস্যা, অতএব, প্রত্যেক গিকুয়ুর সমস্যা।

জমিজাত অসন্তোষ কিনিয়ার নিগ্রো-হৃদয় বোবা বেদনায় ভরে দিয়েছে। দু'-চারজন আদর্শবাদী এই মূক অসন্তোষকে সংগ্রামের বর্ণমালা শেখাতে শুরু করেছে। তারা কিনিয়ার মুক্তিপথেব প্রথম পথিক। পথের শেষ কোথায় তারা জানে না, কী তার চেহারা, তাও না। শুধু জানে, জমির মধ্যে এই পথ, জমি-সংগ্রামেই কিনিয়ার মুক্তি-সংগ্রামের আরম্ভ।

রাতের অন্ধকারে আট মাইল পথ হেঁটে দু'-চারবার পিটার নাইরবির উপকণ্ঠে গিকুয়ু পল্লীর নৈশ সভায় গিয়ে হাজির হয়েছে। সন্ধান পেয়েছিল আচমকা। যাচ্ছিল মনিবের কাপড় নিয়ে ধোপার দোকানে। নিগ্রো চাকর, সামনের দরজা দিয়ে প্রবেশের অধিকার নেই। দোকানের পেছনে ছোট্ট খিড়কি, সেখানে লাইন লাগিয়ে অপেক্ষা করতে হবে। তাই করছিল, হঠাৎ একজন তার হাতে একটা কাগজ গুঁজে দিয়ে চুপি চুপি বলল, 'পরে পোড়ো'। পিটার মুঠোর মধ্যে চেপে রইল কাগজখানা। দোকানের কাজ সেরে বিলের সঙ্গে কাগজখানাও পকেটে রাখল। কেন যেন তার মনে হল, ওর মধ্যে রয়েছে একটা গোপন উত্তাপ। বাড়িতে এসে নিজের ছোট্ট ঘরখানায় গিয়ে বাতি জ্বেলে কাগজটা

পড়ল। সবটা বুঝতে পারল না। শুধু এইটুকু জানল, আট মাইল দূরে একটি গিকুয়ু গ্রামে রাতের অন্ধকারে তারই মতো আরও অনেক নিগ্রো একত্রিত হয় গোপনে। উদ্দেশ্য কিনিয়ায় নিগ্রোদের সম্মান প্রতিষ্ঠিত করা। আগামী সভা বসছে তিনদিন পর রাত বারোটায়। "যদি কিনিয়াকে জাগাতে চাও তবে নিজে জাগো। গভীর রাতে প্রভাতের সন্ধানে এসো।"

অস্থির উত্তেজনা তিনদিন বুকে চেপে তৃতীয় রাতে অ্যাসবির মদ-বেহুঁশ দেহটাকে বিছানায় শুইয়ে পিটার বড় বড় পা ফেলে যখন নির্দিষ্ট স্থানে হাজির হল তখন সভা শুরু হয়ে গেছে। সভা বসেছে একটি কুটিরের সংলগ্ন উঠোনে। গোটা চল্লিশ নিগ্রো বসেছে যে-মানুষটার চারদিকে ভিড় করে, সে একটানা স্বরে বলে যাচ্ছে, সবাই নিঃশব্দে শুনছে। পিটার এক কোণে বসে পড়ল। গায়ে ঘাম ঝরছে, নিঃশ্বাস পড়ছে জোরে জোরে, তবু মন দিয়ে লোকটির কথা শুনতে চেষ্টা করল। সে বলছে জমির কথা। কীভাবে বিদেশী প্রবঞ্চনা ও অত্যাচারে নিগ্রোর সবটুকু ভালো জমি কেড়ে নিয়েছে, তার ইতিহাস।

আমাদের দুর্দিনের কথা আমাদের পূর্বপুরুষরা জানতেন, লোকটা বলে যাচ্ছিল। তোমরা মোগোর নাম সবাই জানো। দেবতা মোগো, আমাদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পূর্বপুরুষ। ভূত-ভবিষ্যৎ সব তিনি জানতেন। একদিন হঠাৎ কাঁপতে কাঁপতে মোগো অজ্ঞান হয়ে গেলেন। তাঁর অচেতন দেহকে নিয়ে আমাদের সমাজপতিরা কিনিয়া পাহাড়ের একটা চূড়োয় উঠল। সেখানে মোগো তাঁর জ্ঞান ফিরে পেলেন। তখন তাঁর কণ্ঠ থেকে উচ্চারিত হল দারুণ ভবিষ্যৎ-বাণী! তিনি বলেলন, গিকুয়ু, তোমাদের সর্বনাশ আসছে। সমুদ্র থেকে শাদা ব্যাং-এর চামড়া নিয়ে একদল মানুষ তোমাদের দেশে আসবে, লোহার সাপে জাহাজ বোঝাই করে। হাতে তাদের থাকবে একরকম লাঠি যার মুখ দিয়ে আগুন বেরোবে। সেই লোহার সাপ তোমাদের দেশকে মরণ-আলিঙ্গনে জড়িয়ে ধরবে, তোমরা বাধা দিলে অগ্নিবর্ষী লাঠিগুলি তোমাদের ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দেবে।

সবাই ভয়বিহ্বল কণ্ঠে প্রশ্ন করল: আমরা কী করবো?

মোগো জবাব দিলেন, তোমরা বাধা দিতে যেয়ো না। তোমাদের তীর-ধনুক-বর্শা দুশমনদের আগুন-ছড়ানো লাঠির কাছে সহজেই পরাস্ত হবে। শুধু তোমরা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।

লোকটি বলে চলল: একদিন এই নিদারুণ ভবিষ্যৎ-বাণী সত্য হল। সে বেশি দিনের কথা নয়। মাত্র পঞ্চাশ বছরের কথা। সমুদ্র থেকে উঠে এল শাদা

মানুষ। নিয়ে এল লোহার সাপ, রেললাইন। আর আগুন-ছড়ানো লাঠি, বন্দুক। লক্ষ্য তাদের উগাণ্ডা বা লেক ভিক্টোরিয়া। পথে এই দুর্ভাগা কিনিয়া। গিকুয়ুর দেশ। সরল সহজ গিকুয়ু ভাবল, ওরা পথিক, ভবঘুরে। স্বভাবসিদ্ধ অতিথি-বাৎসল্যে গিকুয়ু ওদের আহার দিল, পানীয় দিল, তাঁবু ফেলবার জমি দিল। আজ যেখানে তাঁবু বসল, কাল সেখানে তৈরি হল দুর্গ। যে জমি বিশ্রামের জন্য দিল, তা আর গিকুয়ু ফিরে পেল না। শাদা মানুষ নিয়ে এল রেল-লাইন, বন্দুক আর কামান। আর নিয়ে এল মহামারী, দুর্ভিক্ষ। চুরি করে নিল আমাদের স্বাধীনতা। আমাদের বোঝাল, আমরা বর্বর, অসভ্য, অমানুষ। বলল, তোমাদের সভ্যতা দেবো, মানুষ বানাবো। এই হল আমাদের অধীনতার ইতিহাস।

পিটারের বুকে কেমন একটা অসহ্য ব্যথা ঢেউ খেয়ে উঠল। তাকিয়ে দেখল, অন্ধকারে মিশ খেয়ে চল্লিশটা দেহ নিথর নিস্পন্দ। শুধু একটা ডুমুর গাছে পাতা নড়ছে মৃদু বাতাসে। অসংখ্য পোকার চিৎকারে কম্পিত একটানা ব্যাকুল আর্তনাদ।

লোকটি বলছে, শুধু কিনিয়ার নয়। সমস্ত আফ্রিকার এই একই ইতিহাস। শাদা মানুষ হাজার হাজার মাইল জমি আর লক্ষ লক্ষ মানুষের ওপর কর্তৃত্ব বিস্তার করেছে শুধু প্রবঞ্চনা আর অত্যাচার দিয়ে। আজ কিনিয়া ও মধ্য-আফ্রিকায় সে তার নিজের বাসভূমি তৈরি করতে চাইছে। এখানে আমাদের ভাগ্যে থাকবে চির-দাসত্ব। এ-দাসত্বের অবসান একদিন আমাদের করতেই হবে। ভবিষ্যৎ আমাদের, এদেশ আমাদের, ওদের নয়। এ-জমি আমাদের। আমরা অনেক, ওরা সামান্য। কিন্তু তবু ওদের শক্তি প্রচুর, আমরা দুর্বল। আগে আমাদের সঞ্চয় করতে হবে শক্তি। তার জন্যে চাই সংগঠন। আমাদের একত্র হতে হবে, একজোট হতে হবে। প্রত্যেক গিকুয়ু গ্রামে আমাদের সংগঠন চাই। এমন হাজার হাজার মানুষ চাই যারা কিনিয়ার মুক্তি-জীবনের ব্রত করে নেবে। অর্থ চাই। কোন্ পথে কেমন করে আমরা চলব তা ঠিক করতে হবে। হিংসার পথে আমরা এখন যেতে পারব না। ওদের হাতে ভয়ংকর মারণাস্ত্র, আমাদের হাত নিঃস্ব। কিন্তু জমির দাবি করতে হিংসার প্রয়োজন নেই। ওরা আমাদের সব উর্বর জমি কেড়ে নিয়েছে। এই জমি আমাদের পেতে হবে। নইলে আমাদের পেটে অন্ন জুটবে না, আমরা গ্রাম ছেড়ে সবাই খনির মজুর হয়ে যাবো। জমির দাবি জানাতে গেলে

চাই সংগঠন। সেই সংগঠনের আহ্বান এসেছে জোমো কেনিয়াটার কাছ থেকে…

লোকটির বলা এক সময় থামল। থামল থমথমে নৈঃশব্দ্যে। কারও মুখে কোন কথা নেই। পিটার ভাবল, সবাই কি আমার মতো বুকের কাঁপুনি চেপে বসে আছে? তারপর, সেই ভীষণ ভারী নীরবতা ভেঙে বেরিয়ে এল একজনের ভয়ানক কর্কশ গলা, তার পেছনে আরও অনেকের কণ্ঠস্বর। অনেক প্রশ্ন, যেন তীরের পর তীর, বিদ্ধ করল আগন্তুক-বক্তাকে। একটানা নিরুত্তেজিত স্বরে সে জবাব দিয়ে গেল। পিটার শুধু বুঝল, এই গিকুয়ু গ্রামে সংগঠনের গোড়া-পত্তন অনেকদিন আগেই হয়েছে, এখন চলছে শক্তি-সংগ্রহ।

সভা শেষ হল। পিটার এবার উঠবে। ফিরে যেতে হবে আট মাইল। তবে একা নয়। শহর থেকে আরও কয়েকজন এসেছে। ফিরবে একসঙ্গে। অবশ্য তাও নিরাপদ নয়। রাস্তায় পুলিশ আটকাবে। গ্রাহ্য একটা কৈফিয়ত দিতে হবে। রাত্রি-বিচরণের স্বাধীনতা নিগ্রোর নেই। সুবিধে হল এটা উৎসবের সময়। গিকুয়ু পল্লীতে এখন নাচগান-যাত্রা লেগেই থাকে। শহর থেকে দেখতে আসাটা অক্ষমনীয় অপরাধ নয়। এ-ধরনের কথাবার্তাই পিটার বলছিল অন্য দু'চারজন লোকের সঙ্গে; এমন সময় একটি লোক এসে তাকে বলল, তুমি ঐ ঘরে একবার এস।

ডান দিকে ছোট্ট একখানা কুটিরে পিটারকে সে নিয়ে গেল। সেখানে প্রথমেই চোখ পড়ল পিটারের সেই লোকটির ওপর যে এতক্ষণ সভার মানুষ-গুলিকে কিনিয়ার সমস্যা শোনাচ্ছিল। চওড়া মানুষটার মাথা একেবারে কামানো, গাল-ভরা খচখচে দাড়ি, চোখ দুটো গভীর। আর নজর পড়ল একটি মেয়ের ওপর। ছোট্ট একটা কাঠের টেবিলের ওপর ঝুঁকে একখানা খাতায় সে নাম লিখছিল। পিটার তাকিয়ে দেখল মেয়েটি সুশ্রী, বয়স ষোলোর বেশি হবে না, মাথার সামনের অর্ধেক যত্ন করে কামিয়েছে, আর তারপর কোঁকড়া চুলে বেঁধেছে লম্বা বহুধারা বিনুনি; বুকের ওপর আঁট করে বাঁধা বস্ত্র, কাঁধ ও বাহু অনাবৃত। চওড়া কপালের নিচে চোখ দুটি মোলায়েম কালো, কানে পরেছে ভারী গহনা। গায়ের চামড়া মসৃণ, দেহ মজবুত, অথচ মুখখানি কোমল।

অভিবাদনের পর সেই লোকটি পিটারকে জিজ্ঞেস করল: তোমার নাম?

পিটার কাবাকু।

গ্রাম ?

পিটার গ্রামের নাম বলল। সে দেখতে পেল মেয়েটি লিখে যাচ্ছে।

তুমি আমাদের সভায় এই প্রথম এলে ?

হ্যাঁ।

আবার আসবে ?

আসতে পারি।

কী কাজ কর ?

পিটার জবাব দিল।

মনিব কেমন ?

মনিব যেমন হয়ে থাকে।

আচ্ছা। তোমাকে সভার খবর দেওয়া হবে। এতদূরে আসবার দরকার হবে না তোমার। শহরেই আমাদের সভা হয়।

এখানে আসতেও আমার কষ্ট নেই। বলল পিটার। মেয়েটি পেছন ফিরে তাকিয়ে দেখল।

কিছু চাঁদা দেবে ?

সঙ্গে যা আছে, সামান্য।

তাই দাও।

পিটার পকেট থেকে সামান্য কিছু অর্থ বার করে হাত বাড়াল।

লোকটি বলল : এটাও জমা করে নাও, ওয়াচিরা।

মেয়েটি পিটারের হাত থেকে অর্থ নেবার সময় দুজনের চোখ দুজনকে দেখল।

পিটার অভিবাদন করে ঘর থেকে বেরিয়ে এল। লণ্ঠনের আলো দরজা অবধি নিয়ে এল ওয়াচিরা।

বিদায় নেবার সময় পিটার তাকে বলল : থা-আ-আ-ই। তোমার শান্তি হোক।

তার নিজের মন ছিল অশান্ত।

মেয়েটি মৃদু হেসে জবাব দিল, থা-আ-আ-ই। আবার এসো।

যুদ্ধের গতির সঙ্গে সঙ্গে কিনিয়ার আবহাওয়া গেল বদলে। মধ্যপ্রাচ্যে ইংরেজের অবস্থা সঙীন হওয়ায় কিনিয়ার সামরিক গুরুত্ব বেড়ে গেল। তৈরি হতে লাগল বড় বড় বিমানঘাঁটি। আরও সৈন্য এল, আরও জাহাজ, আরও

বিমানপোত, যুদ্ধের উপকরণ। অর্থ ছড়িয়ে পড়ল কিনিয়ার পথে-ঘাটে। যে-নিগ্রো দশটাকার মুখ দেখে নি, তার হাতে এল একশো টাকা। যা ইংরেজ কোনদিন চায় নি, তাই এবার বাধ্য হয়ে চাইতে হল। নিগ্রো কাজ পেল বিমানঘাঁটি নির্মাণে, সামরিক গাড়ি চালনায়, এবং আরও অনেক কুশলী পেশায়। নিগ্রোকে ডাকা হল সৈন্যবিভাগে স্থান নিতে। হাতে প্রচুর পয়সা পেয়ে নিগ্রোর পুরোনো গ্রাম্য জীবন-শৃঙ্খলা অনেকখানি আলগা হয়ে গেল। তার উৎপন্ন শস্য সৈন্যদের খাদ্য যোগায়, আর গ্রামে গ্রামে দেখা দেয় নিদারুণ খাদ্যাভাব। ছাউনির আশেপাশে নিগ্রো পল্লীতে স্ত্রী-দেহের লোভে রোজ রাতে বিদেশী সৈন্যের হানা। অনেক পরিবার গ্রাম ছেড়ে চলে গেল। যারা রইল তাদের জীবনধারায় এক ভয়ংকর নতুন যুগের অগ্নিদাহ এসে লাগল।

পিটারদের নৈশ সভায় এসব সমস্যার আলোচনা হত, কিন্তু যুদ্ধের হিড়িকে হঠাৎ পয়সা-পাওয়া নিগ্রোকে নিয়ে ভূমি-আন্দোলন যে অসম্ভব তা সবাই বুঝে নিয়েছিল। অথচ সামরিক প্রস্তুতি নিগ্রো-গ্রামে অসন্তোষের আগুন জ্বালাবার রসদ যুগিয়ে যাচ্ছে, এটাও পিটাররা জানত। ওয়াচিরার বাড়ি ছাড়া নাইরবি শহরেও মাঝে মাঝে সভায় যেত। একটা প্রশ্ন তার প্রায়ই মনে হত: সংগ্রামের সময় তো ঘনিয়ে এসেছে, কিন্তু আমরা কি তৈরি? নিজের ভেতরে তাকিয়ে নিজেকে একেবারে অপ্রস্তুত মনে হত। আমার শিক্ষা নেই, জ্ঞান নেই, বুদ্ধি নেই। আমার যেটুকু-বা আছে অধিকাংশ নিগ্রোর তাও নেই। তাদের শুধু আছে পুঞ্জীভূত অপমান, জ্বালা। এই বারুদ-স্তূপে একটু আগুন লাগলেই যে ভয়ানক দাবানল জ্বলে উঠবে তাতে পুড়বো আমরাই। ওরা পুড়বে না। ওরা সংগঠিত, শক্তিমান। আমরা বিভক্ত, দুর্বল। আমরা কি ওদের অস্ত্রে ওদের কাবু করতে পারব? বিকল্প অস্ত্র, অন্য পথ কি আছে?

এ প্রশ্নের জবাব পিটার নিজের মধ্যে খুঁজে পেল না। অন্যকে জিজ্ঞাসা করার সাহসও তার হল না। এমন সময় দুটো ঘটনা ঘটল যাতে পিটার কাবাকুর জীবন কেমন যেন অন্য-মোড় হয়ে গেল।

আলেক অ্যাসবি হঠাৎ মনস্থির করে বসল সে যুদ্ধে যাবে। সাধারণত তার শ্রেণীর মানুষরা যুদ্ধযোগ এড়াতে নানা কৌশল প্রয়োগ করে থাকে। হঠাৎ তাদের দেহে দেখা দেয় জটিল ব্যাধি, যা যুদ্ধক্ষেত্রের পক্ষে ভয়ানক আপত্তিকর। কিন্তু অ্যাসবি ওসবের ধার দিয়ে গেল না। সোজা দরখাস্ত

পাঠাল রিক্রুটমেণ্ট অফিসারের কাছে। স্বাস্থ্য-পরীক্ষার তলব এলে হাজির হল ডাক্তারদের সামনে। উত্তীর্ণ হয়ে কমিশন পেয়ে তারপর খবরটা নিতান্ত তাচ্ছিল্যের সঙ্গে নিবেদন করল পত্নী রোজের কাছে এক প্রভাতী অবসরে। যুদ্ধের বাজারে রোজের দেহ-জৌলুসের চাহিদা এমন বেড়ে গিয়েছিল যে সে এই সংবাদে পুলকিত হল। আলেককে আদর করে চুমো দিয়ে বলল, তুমি সত্যই স্বদেশপ্রেমিক।

পিটার অ্যাসবির যাত্রার আয়োজন সম্পূর্ণ করল। লোকটার ওপর তার মায়া হয়েছিল, তাই বোধ হয় সে বুঝতে পেরেছিল কোন পলাতকী ইচ্ছার তাড়নায় অ্যাসবি রণাঙ্গনের মাদকতা খুঁজছে। যাবার ঘণ্টাখানেক আগে অ্যাসবি তার শোবার ঘরে পিটারকে ডেকে পাঠাল। পিটার হাজির হতে সে বলল, তোমার নতুন কোন কাজ জুটেছে?

পিটার জানাল, জোটে নি।

তোমার জন্যে একটা সার্টিফিকেট লিখে রেখেছি, এতে তোমার সুবিধে হবে।

পিটার কাগজখানা নিয়ে সেলাম জানাল।

একটু থেমে অ্যাসবি বলল, ঐ কোণের পুরোনো জামা-কাপড়গুলি আমার, তুমি নিয়ো। তোমার গায়ে একটু বড় হবে। দর্জিকে দিয়ে ছোট করিয়ে নেবে। আর এই নাও, তোমার বকশিশ।

পিটার হাত পেতে গ্রহণ করল মনিবের দান। তার চোখ তখন জলে ভরে এসেছে।

সেই চোখের জল দেখে আলেক অ্যাসবি কেমন যেন বিহ্বল হয়ে গেল। কোনদিন কোন বিদায়ের ক্ষণে কেউ তার জন্যে একফোঁটা চোখের জল ফেলে নি। ছোট বয়সে মাকে ছেড়ে লণ্ডনে যাবার দিন মার চোখ একটুও ভিজে উঠেছিল বলে তার মনে পড়ে না। লণ্ডন থেকে নাইরবি আসার সময় কেউ তাকে অশ্রুভেজা চোখে বিদায় দেয় নি। আজ সুরার মাদকতার চেয়েও উগ্র মদের সন্ধানে মৃত্যুর দাবানলে সে ঝাঁপিয়ে পড়তে যাচ্ছে। তার স্ত্রী উপস্থিত থেকে বিদায় দেবার প্রয়োজন অনুভব করে নি। তার এই একটানা শূন্য জীবনে প্রথম চোখের জল পড়ল একটা নিগ্রো ছেলের যাকে সে 'কুকুর' বলে গালি দিয়েছে প্রতিদিন, যার গালে তার আঙুলের তীক্ষ্ণ ছাপ বার বার কেটে বসেছে।

এগিয়ে এসে পিটারের কাঁধে হাত রেখে আলেক অ্যাসবি প্রথমবার তার সঙ্গে মানুষের সম্মানে কথা বলল: পিটার, তুমি আমার অনেক সেবা করেছ। আমার মনে থাকবে।

পিটার এবার একেবারে কেঁদে ফেলল।

শোন, পিটার, তোমাকে একটা কথা বলি। তুমি চাকরের কাজ নিয়েছ, কিন্তু আমি জানি তুমি চাকর নও। তোমার মনে অন্য আকাঙ্ক্ষা। সে আকাঙ্ক্ষা কী আমি জানি না। কিন্তু আমি দেখছি তুমি চাকর হয়ে জীবন কাটাবার জন্যে জন্মাও নি।

পিটার সোজা তাকাল মনিবের চোখে। দেখল, সেই কোটরগত নীল চোখ দুটি গভীর বেদনায় ভরা।

তুমি যাই চাও, অ্যাসবি পিটারকে বলল, তোমাকে আদায় করে নিতে হবে। আমরা তোমাদের হাতে কিছুই তুলে দেবো না। আর, আদায় করতে হলে তোমাকে তার যোগ্য হতে হবে। তুমি এবার যোগ্য পথ খোঁজ। আমি বলি, তুমিও যুদ্ধে এস। অনেক শিখবে। অনেক দেখবে। যদি বেঁচে থাক আর বকে না যাও, তোমার জীবনে অপূর্ব সুযোগ আসবে। বিদেশে গিয়ে পড়তে পারবে, জানতে পারবে।

পিটার এবার প্রথম কথা বলল: এ যুদ্ধে আমাদের লাভ?

অন্যসময় হলে পিটারও এ প্রশ্ন করত না, অ্যাসবিও শুনেই খেপে লাল হত। আজ সময় অন্য, সে-আলেক অ্যাসবিও নেই, নেই সে-পিটার কাবাকু।

লাভ অনেক। তোমাকে একটা কথা বলছি, পিটার। আমি যুদ্ধে যাচ্ছি—মরতে। আফ্রিকার কাছে আমার আজ বিদায়। যুদ্ধে গেলে তুমি লড়াই শিখবে। সেটা তোমার লাভ, কিনিয়ার লাভ। যুদ্ধের পর সরকার তোমায় সাহায্য করতে পারে লেখাপড়া শেখবার। দেশ-বিদেশ দেখবে। তোমার বুদ্ধি বাড়বে, বিচার করবার ক্ষমতা বাড়বে। তুমি ভেবে দেখ। যতটা চিবোতে পারবে না, ততটা কামড় দিও না।

আলেক অ্যাসবি চলে গেলেও রোজ পিটারকে ছাড়ল না। চাকরি রইল, কিন্তু মন তখন তার একেবারে বদলে গেছে। দিনরাত সে জীবন-থেকে-পলাতক মনিবের কথা ভাবে। এবং ক্রমেই তার শেষ উপদেশের যাথার্থ্য সম্বন্ধে প্রত্যয় পিটারের দৃঢ় হয়ে ওঠে। একদিন সে স্থির করে ফেলল, আমিও

যুদ্ধে যাব। এই ক্ষুদ্র জীবনের কারাগার থেকে মুক্তি আমাকে পেতেই হবে। যুদ্ধ আনবে সেই মুক্তি। দেবে আমাকে বাঁচবার স্বাদ।

লাইন বেঁধে পিটার দাঁড়াল রিক্রুটমেণ্ট আপিসের ময়দানে। একটা সাহেব এসে পরীক্ষা করল লাইনের প্রত্যেককে। বুকে মারল একটা ঘুষি, কারুর বা পেটে। কাউকে জিজ্ঞেস করল দু'-একটা প্রশ্ন। একশো আটাশটা নিগ্রোর মধ্যে বাইশ জন নির্বাচিত হল। পিটার কাবাকু তার অন্যতম।

তলব পড়তে একমাস। এরই মধ্যে ঘটল দ্বিতীয় ঘটনা!

নাইরবি থেকে একদল শাদা সৈন্য রাতে স্ফূর্তির সন্ধানে হাজির হল সেই গিকুয়ু পল্লীতে যেখানে ওয়াচিরার কুটিরে নৈশ সভা বসত। গভীর অন্ধকারে হিংস্র শার্দুলের মতো বিদেশী সৈন্যগুলো ঘরে ঘরে ঢুকে মেয়েদের টেনে বার করল। তারপর যা শুরু হল কিনিয়ার সাম্প্রতিক জীবনে তা এই প্রথম। গ্রামের সব পুরুষ-রমণী একসঙ্গে বাধা দিল সৈন্যদের। তারা লড়ল বর্শা, লাঠি, বাসনপত্র, পাথর দিয়ে; সৈন্যরা চালাল পিস্তল। চারজন নিগ্রো মারা গেল। সৈন্যরাও আহত হল অনেকে। মারা গেল ওয়াচিরার বাবা ও বড ভাই। ওয়াচিরা ও আরও দশটি মেয়েকে সৈন্যেরা টেনে নিয়ে গেল। নাইরবির রাজপথে লুণ্ঠিত সেই দেহগুলি ফেলে সগৌরবে ফিরে এল শহরের ব্যারাকে।

এ-ঘটনায় নাইরবি ও আশেপাশের নিগ্রো-মনে উঠল দারুণ ঝড়। সরকার যা বিবৃতি দিল তাতে সত্যের নামলেশ নেই। চারটি নিগ্রোর প্রাণ যাওয়ায় এবং দশটি নিগ্রো মেয়ে ধর্ষিত হওয়ায় গিকুয়ু পল্লীর অপরাধ হল দারুণ। পুলিশ এসে আরও দশজনকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে গেল।

খবর পেয়ে পিটার ছুটে গেল ওয়াচিরার বাড়ি। যা দেখল তাতে তার সর্বাঙ্গ অবশ হয়ে গেল। শোকের, বিপদের গভীর কালো ছায়া পড়েছে পল্লীর বুকে, বিশেষ করে ওয়াচিরার কুটিরে। ধর্ষিতা ওয়াচিরা রক্তাক্ত দেহে অজ্ঞান হয়ে রাস্তার একধারে পড়েছিল, এখন কাঠের শক্ত বিছানায় শুয়ে আছে নিস্তেজ, ম্লান; লাঞ্ছনা ও শোকের পাথর-চাপা। পিটার ওয়াচিরার পাশে মাথা নিচু করে বসে রইল অনেকক্ষণ, একটা কথাও তার মুখে যোগাল না। বাপ-ভাই-এর দেহ কবর দেওয়া হয়ে গেছে, ওয়াচিরার মা কাঁদছে চিৎকার করে, ছোট ছোট তিনটে ভাই-বোন বোকার মতো ঘুরে বেড়াচ্ছে ঘরে-বাইরে। উঠে যাবার সময় ওয়াচিরা একবার তাকাল পিটারের চোখে, গাল বেয়ে তার

অশ্রু ঝরে পড়ছে। পিটার নীরবে ওয়াচিরার হাতখানা নিজের হাতে তুলে নিল। মৃদু সমব্যথার চাপ লাগিয়ে বার্তা পাঠাল বান্ধবীর হৃদয়ে। চোখ দুটো তার শুকনো, মনটা আশ্চর্যরকমের ভোঁতা।

দিন দশেকের মধ্যে ওয়াচিরা শয্যা ছাড়ল। পিটার রোজ একবার করে এসেছে। নীরবতা কেটে গেছে তাদের। মুখরতা আসে নি। কিন্তু কথা ফুটেছে।

পনেরো দিনের দিন পিটার ওয়াচিরাকে বিয়ে করতে চাইল। নিগ্রো মেয়ে, অবান্তর সংকোচ নেই। গিকুয়ু সমাজের নিয়ম হচ্ছে মন-রঙিন ছেলে সর্বাগ্রে নিজের ইচ্ছা নিবেদন করবে মনোবাসিতার কাছে। সেখানে গ্রাহ্য হলে পরে উর্ধ্বতন মহলে কথাবার্তা, হিসেবপত্র। ওয়াচিরা ইতিমধ্যে পিটারের সবকিছু জেনে নিয়েছে, তার আসন্ন যুদ্ধযাত্রা পর্যন্ত। পিটারের প্রস্তাব শুনে আরক্ত মুখ সে নিচু করে রাখল, তারপর মৃদুকণ্ঠে প্রশ্ন করল : আমার এ দুর্ভাগ্যের পরও তুমি আমাকে বিয়ে করতে চাইছ?

দুর্ভাগ্য তো তোমার নয়। দুর্ভাগ্য আফ্রিকার।

তুমি এ ব্যাপারটা ভুলতে পারবে?

ভুলবো কেন? কোনদিন যেন না ভুলি।

তুমি কি আমায় চাইছ আমার কেউ নেই বলে?

তোমাকে চাইছি তোমারই জন্যে। তবে এটুকু জেনো, তোমার বাবা-ভাই গেছে, কিন্তু সমস্ত গিকুয়ু তোমার আপন হয়েছে।

ওয়াচিরার গাল বেয়ে অশ্রু গড়াতে লাগল।

এবার পিটার প্রশ্ন করল : তোমার আপত্তি নেই তো?

না।

আমি তো দিন পনেরোর মধ্যে চলে যাব।

কবে আসবে?

যবে ছাড়া পাই।

ছুটি পাবে না?

তা হয়তো পাব।

আমি কোথায় থাকব?

আমার বাবা-মার কাছে।

তাঁরা আমায় নেবেন তো?

নেবেন।

বিয়ে করে ওয়াচিরাকে নিয়ে পিটার গ্রামে ফিরে গেল। চিঠিতে সব কথা সে বাবাকে জানিয়েছিল, বুড়ো মোয়গাই সাদরে ওয়াচিরাকে গ্রহণ করল। নববধূর শক্ত মজবুত দেহ তাকে খুশী করল, এ-দেহে উর্বরতা আছে, ভালো ফসল দেবে, মনে মনে বলল সে। ছেলেটা চলে যাচ্ছে যুদ্ধে, কবে সন্তান হবে কে জানে? কবে ঘরে আনবে আরও দুটো বৌ—কম করে আরও দুটো! পিটারের মুখের দিকে তাকিয়ে মোয়গাই কী যেন একটা খুঁজতে লাগল: সেই সেদিনের পিটার কোথায়? এ যেন অন্য কেউ! পিটার বড হয়েছে। পেশল, শক্ত তার দেহ, মুখে কেমন বিষণ্ন চিন্তার জমাট ছায়া! চোখের কোণে থমথমে দৃঢ়তা। ছেলেটাকে ছোটবেলা থেকে মোয়গাই কোনদিন পুরো বুঝতে পারে নি, আজ সে আরও দুর্বোধ্য, আরও রহস্যময়।

বিয়ের সংবাদ জানিয়ে সামরিক কর্তৃপক্ষকে নাইরবি থেকে পিটার চিঠি লিখেছিল, এবং একমাসের ছুটি চেয়েছিল। তার মঞ্জুর খবর এল গ্রামের বাড়িতে। ওয়াচিরা মহাখুশী। গায়ে-গতরে দিনরাত পরিশ্রম করে শ্বশুর-বাড়িতে সে নিজের মর্যাদা পাকা করে নিয়েছে। পিটারের জীবনটাকেও অর্থময় করে দিয়েছে সেবায়, সোহাগে, নিবেদনে। একদিনে রাতে পিটার তাকে বলল: তোমাকে একটা কাজ করতে হবে।

কী?

গ্রামের মেয়েদের নিয়ে স্কুল খুলতে হবে।

স্কুল!

হ্যাঁ। তা নইলে তুমিও যা শিখেছ সব ভুলে যাবে।

কিন্তু, তোমার বাবা রাজি হবেন কেন?

বাবাকে তুমি চেনো না। বাবা সবটাতেই প্রথম বেঁকে বসেন। কিন্তু বোঝাতে পারলে, বুঝতে রাজি আছেন। বাবাকে আমরা বুঝিয়েছি।

আমরা?

এখানে একটি ছোট সংগঠন করে গেলাম। বিশেষ কিছু নয়। এ-জায়গাটায় এখনো যুদ্ধের প্রভাব এসে পৌঁছয় নি। তবু দশ-বারোজন উৎসাহ নিয়ে এগিয়ে এসেছে। ভবিষ্যতে কাজ হবে।

স্কুল বসবে কোথায়?

এ-বাড়িতেই। মেয়েদের স্কুল, বিশেষ কেউ যে প্রথমে আসবে তা মনে হয়

না। তবু, যারা আসে তাদের নিয়েই শুরু করবে। বড়দের সভায় প্রস্তাবটা পাশ হয়ে গেছে। সুতরাং তোমার খুব একটা অসুবিধে হবে না।

পিটারের বিদায়-দিন ঘনিয়ে এল। গ্রামের সবার কাছে বিদায় নিয়ে সন্ধ্যেয় সে বাড়ি ফিরেছে। বাড়িতেও সবার কাছে বিদায় নিয়েছে। বাকি মায়তো, মোয়গাই আর ওয়াচিরা। রাতে ওয়াচিরাকে বুকে নিয়ে পিটার ভাবছে কতদিনের জন্যে সে ছেড়ে যাবে তার প্রিয়তমাকে! আমি যাচ্ছি। কোথায়—জানি নে। কেন, তাও জানি নে। শুধু জানি, আমি যাচ্ছি। সব ছেড়ে—আমার গ্রাম, আমার বাবা-মা, আমার স্ত্রী, আমার দেশ ফিরে আসবো তো? আসবো। আলেক অ্যাসবির মতো মরতে যাচ্ছি না। আমি যাচ্ছি বাঁচতে। কিন্তু বাঁচার মতো রসদ নিয়ে ফিরে আসবো তো? নাকি শূন্য হাতে, রিক্ত-হৃদয়ে...

কী ভাবছ? ওয়াচিরা জিজ্ঞেস করল।

অনেক-কিছু।

আমাকে বলো।

তোমাকে তো সব বলেছি!

আবার বলো।

বলবো। তার আগে তুমি একটা কথা বলো।

কী কথা?

তুমি সুখী হয়েছ?

আজ এই বিদায়ের সময় তোমাকে তা বলতে হবে?

হ্যাঁ।

আমি সার্থক হয়েছি।

তুমি 'মোহিকি' থাকবে কতদিন?

ওয়াচিরা লজ্জায় পিটারের বুকে মুখ লুকোয়।

বলো।

'মোহিকি' থাকবো না। তুমি ছুটি নিয়ে এসেই তোমার সন্তান দেখবে।

সত্যি? পিটার খুশিতে আটখানা হল।

ওয়াচিরা মাথা নেড়ে বলল, সত্যি।

হঠাৎ পিটারের মুখ কঠিন হয়ে উঠল।

একটা কথা বলতে হবে।

কী ?

নাইরবির সে-ঘটনার পর তুমি 'কোনোরা' হয়েছিলে ?

সারা দেহ, সমস্ত সত্তা জ্বলে গেল ওয়াচিরার। দাঁতে দাঁত চেপে বলল : না হলে আমি আত্মহত্যা করতাম।

মায়তো তার নগ্ন বুকে পিটারের মাথা টেনে নিল। কেঁদে কেঁদে বলল, আবার কবে আসবি, পিটার ?

শিগ্‌গিরই আসবো, 'মুম্বি'।

পিটার মাকে এই প্রথম 'মুম্বি' বলল। মুম্বি ছিল প্রথম গিকুয়ু নারী। সমস্ত গিকুয়ুর জননী।

বাবা বসেছিল বারান্দায়। বিষণ্ণ তার মুখ। হাতে বাঁশের নলচের হুঁকো।

বাবা !

মোয়গাই উঠে দাঁড়াল।

আমি যাচ্ছি।

মোয়গাই ছেলের মাথায় হাত রাখতে গিয়ে কেঁপে উঠল। জড়িয়ে ধরল পিটারকে।

সাবধানে থেকো।

হ্যাঁ, বাবা।

নিয়মিত 'ওহোরো' পাঠাবে।

পিটার সায় দিল।

মোয়গাই সারা গায়ে হাত বুলিয়ে বলল : থা-আ-আ-ই। তোমার শান্তি হোক।

ওয়াচিরা হাসল। চকচকে ঝকঝকে দাঁত। মুখে হাসি। চোখে জল।

বলল, 'থাকা', তুমি আমার 'থে'। হে সুন্দর, তুমি আমার বিশ্ব।

পিটার নিচু গলায় উচ্চারণ করল : তুমি আমার 'ওথামাকি', আমার 'ওটোংগা'। তুমি আমার রাজ্য, আমার লক্ষ্মী। আমি ফিরে আসবো তোমার 'উরুঙ্গারে ওয়া এন্নিওণ্ডো', তোমার নরম বুকের উত্তাপে।

নাইরবিতে শুরু হল পিটার কাবাকুর সৈনিক জীবন। পদাতিক বাহিনীর

রসদ-বিভাগে তার কাজ। তিন মাস শিক্ষানবিশ থাকবার পর প্রথম যাত্রার হুকুম এল। পিটার চলে গেল মিশরে। মিশর থেকে লিবিয়ায়। লিবিয়া থেকে ইরাকে। ইরাক থেকে ইতালি। মিত্রপক্ষ ইতালি দখল করার পর মিলল তার প্রথম তিন মাসের ছুটি। গ্রামে এসে দেখল ওয়াচিরার কোলে তার আত্মজ পুত্র। ওয়াচিরা মা হয়েছে। নতুন ওয়াচিরা। মোয়গাই পিতামহ। গ্রামের সমাজে তার সম্মান বেড়েছে। পিটার জনক। তারও পদোন্নতি হয়েছে। পিটার দেখল ওয়াচিরার স্কুল বেশ চলেছে, তার নিজের গ্রামেও অসন্তোষ ছড়িয়ে পড়েছে।

নাইরবি গিয়ে এ-অসন্তোষের ব্যাপক গভীরতার আন্দাজ পেয়ে তার মন শংকিত হল। মনে হল, সমস্ত গিকুয়ু সমাজের বুকে আগুন জ্বলছে। কর্তৃপক্ষ নিজের দাপটে অন্ধ, তাই এ-আগুনের খবর পায় নি। কবে যে দাবানল জ্বলে উঠবে সে-কথা ভেবে পিটারের বুক কাঁপল। কিনিয়া হিংসার জন্যে তৈরি। কিন্তু হিংসায় আমরা পারব কেন ওদের সঙ্গে? ওরা যে কত শক্তিশালী, পিটার তা দেখে এসেছে। আসন্ন পরাজয়কে ওরা জয়ের পথে নিয়ে যেতে বসেছে। আজ ইতালি পদানত। কিছুদিন পরে জার্মানিও হারবে। তখন এদের ক্ষমতা আরও বাড়বে। চার্চিল তো পরিষ্কার বলে দিয়েছে, সাম্রাজ্যের বিলোপসাধনের জন্যে আমি প্রধানমন্ত্রী হই নি। তাহলে? কীসের জোরে আমরা ওদের সঙ্গে লড়বো? অন্য কোন পথ কি আছে? কোন রাস্তা? হিংসার বাইরে, অস্ত্রের বাইরে? এমন কোন পথ, যাতে নিগ্রোর মুক্তি, তার বিনাশ নয়?

পিটারের ছেলের নাম রেখেছে তার পিতামহ।

এন্‌গাথা। উদার, মহান্ মানুষ।

এন্‌গাথা কাবাকু।

ডাকনাম এনডুমা। অন্ধকার।

কালো, মিশমিশে কালো, পিটপিটে চোখ, নরম থলথলে গাল দুটো, মাথায় একরাশ কোঁকড়া চুল। পিটার বাড়ি এসেছে পুরো দু'বছর পর। ছেলেটার এক বছর পেরিয়ে গেছে। আধো-আধো কথা বলে। ঘরে-বাইরে তার দৌরাত্ম্য। পিটারকে বলে, বাবা। ওয়াচিরাকে বলে, মা-তো। ওয়াচিরা মা হয়ে কেমন পাকা গৃহিণী হয়েছে। সবার সামনেই 'মুয়োমো্তো' বার করে ছেলেকে দুধ খাওয়ায়। সারাদিন তার একটুও বিশ্রাম নেই। পিটার রাতে

ছাড়া তাকে একা পায় না। কথায়-কথায় তাদের রাত ছোট হয়ে আসে।.

আমাকে তোমার ভালো লাগছে? প্রশ্ন করে ওয়াচিরা।

খুব।

অন্য-সবার মতোই?

অন্য-সবাই?

বিদেশে তো কত মেয়ে…

তাতে আমার কী?

তুমি যাও না তাদের কাছে?

এখনো তো যাই নি।

যাও নি? অবাক্ হয়ে জিজ্ঞেস করে ওয়াচিরা: একজনের কাছেও না?

না।

কেন?

তুমি আছ, তাই।

আমি তো অনেক দূরে।

তুমি খুব কাছে।

আমি বুড়ী হয়ে গেছি।

তুমি মা হয়েছো। তাতে তোমাকে আরও ভালো লাগছে।

দেখো, আমি আর 'মোহিকি' নই।

তুমি এবার 'মায়তো'।

এবার তুমি কী চাও।

এবার একটি মেয়ে চাই। সে হবে তোমার মতো। তার নাম হবে মাগেথা। শস্য। তোমার দেহ থেকে তুলে-আনা সোনার ফসল।

লড়াই থামবে কবে?

কে জানে।

কবে তুমি একেবারে চলে আসবে?

পিটার গম্ভীর হয়ে যায়।

কোনদিন আমি একেবারে চলে আসবো না, ওয়াচিরা। ভুলে যেও না, আমার আসল কাজ এখনো শুরু হয় নি। আমি এখন শুধু 'মোগেণ্ডি', পথিক।

পথের সন্ধান করতে হবে। যুদ্ধের শেষে আমার যাত্রা শুরু হবে। কোনদিন আমি একেবারে ফিরে আসবো না। কিনিয়ার মুক্তির আগে তা হবে-না।

বাপ ডেকে একদিন বলল, তোমার দ্বিতীয় বিবাহের ব্যবস্থা করি।

পিটার আস্তে উত্তর দিল, না।

না? না কেন?

ইচ্ছে নেই।

তুমি কি কোনদিন স্বাভাবিক হবে না? আমাদের সমাজে সবাই তিন-চারবার বিয়ে করে। একটা বৌ দিয়ে কী হয়? ক'টা সন্তান সে বিয়োতে পারে?

পিটার নীরব।

তুমি ওয়াচিরার কথা ভাবছো? তাকে আমি আগেই জিজ্ঞেস করেছি। কোন অমত নেই তার। সে হবে 'ন্নিয়াকিয়াম্বি' (প্রথম, প্রধান পত্নী)। কোন্ মেয়ে তা না হতে চায়?

পিটার কোনদিন বাবার সঙ্গে বেশি কথা বলে নি। তার সমাজে নীতি-বিরুদ্ধ সে-কাজ। মাটির দিকে তাকিয়েই আজ সে ক'টি কথা বলে ফেলল: বাবা, তোমার আরও সব ছেলেরা আছে। তারা তোমাকে নাতি-নাতনি দেবে। আমার জীবন আলাদা। আমি মোগেণ্ডি। আমার বোঝা আর বাড়াতে চাই নে।

মোয়গাই তার কথার একবর্ণও বুঝতে পারল না। কোনদিন সে পিটারকে ঠিকমত বোঝে নি। আজ একেবারে বুঝল না। শুধু এটুকু বুঝল, পিটার আর বিয়ে করবে না।

রওনা হবার আগের রাতে ওয়াচিরাকে পিটার জিজ্ঞেস করল: তোমার ন্নিয়াকিয়াম্বি হবার খুব সখ।

ওয়াচিরা চুপ করে চেয়ে রইল।

সে-সখ তোমার পূর্ণ হবে না।

ওয়াচিরা চোখ নামাল। বুকটা তার টনটন করে উঠল ভালোবাসায়।

ছুটি ফুরোলে পিটার গেল লিবিয়ায়। এখানে তার নতুন পরিচয় হল

আরব-আফ্রিকার সঙ্গে। য়ুরোপেরও অনেক আগে আরব এসেছিল আফ্রিকায়, ক্রীতদাসের সন্ধানে। বহুদিন য়ুরোপের মানুষ যা পারে নি, আরব তা অনায়াসে পেরেছিল : আফ্রিকার অনন্ত মরুবক্ষ অতিক্রম করে সে প্রবেশ করেছিল গভীর আরণ্যক আদিমতায়, শ্বেতাঙ্গদের মতো শুধু উপকূলচারী হয়ে থাকে নি। জাহাজ বোঝাই করে নিগ্রো ক্রীতদাস সে ছড়িয়ে দিয়েছিল পৃথিবীর বাজারে বাজারে ; সমস্ত মানুষের রক্তের সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছিল নিগ্রোর রক্ত। সে-রক্ত কালো নয়, লাল। আরবের পণ্য আফ্রিকার নিগ্রো বিক্রীত হল আমেরিকায়, চীনে, ভারতে, য়ুরোপের সব দেশে। পরে অবশ্য য়ুরোপীয় বণিকরাও এ-ব্যবসায় যোগ দিয়েছিল, আবার একদিন ইংরেজই এ-ব্যবসা বন্ধ করেছিল দৃঢ়তার সঙ্গে ; সাম্রাজ্য-সৌধের সে একটি মহান্, গর্বিত স্তম্ভ। আরব আফ্রিকাকে একেবারে কিছু দেয় নি তা নয়। ইসলাম সে সঙ্গে এনেছিল এবং ইসলাম আফ্রিকার বহু মানুষকে আজ জয় করে নিয়েছে। খ্রীষ্টান ধর্মের সে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী। নিগ্রো-রক্তের সঙ্গে নিজের রক্ত মিলিয়ে সমস্ত উত্তর আফ্রিকায় আরব বসতি বানিয়েছে। পিটার কাবাকুর মতো সেও পরাধীন। পিটারের ভাগ্যবিধাতা ইংরেজ, আরব-আফ্রিকার ফ্রান্স। লিবিয়ায় পিটার প্রথম ফরাসী-আফ্রিকার আস্বাদ পেল ; ইতালির কবলমুক্ত লিবিয়ায় তখন অনেক ফরাসী মানুষের উপস্থিতি। পিটারের আফ্রিকা-পরিচয় খানিকটা ব্যাপক হল।

যুদ্ধে নাম লিখিয়ে পিটার আলেক অ্যাসবিকে একখানা পত্র দিয়েছিল। তার মনে হয়েছিল, এটা কর্তব্য। উত্তর আশাও করে নি, পায়ও নি। নাইরবিতে রোজের কাছে অ্যাসবি কোথায় আছে জানতে পেরেছিল। রোজকে অ্যাসবি চিঠি দিত না, কিন্তু নিয়মিত অর্থ পাঠাত। যুদ্ধের বাজারে রোজ ব্যাপকভাবে পুরুষপ্রিয়া হয়ে উঠেছিল, রণক্ষেত্রে পলাতক স্বামীর জন্যে সময় তার ছিল না। পিটার ঠিকানা চাইতে, বলেছিল, ঠিকানা ? তবেই হয়েছে ! ওসব বিদঘুটে ঠিকানা আমার মনে থাকে না। রোসো, নোট বই-এ টোকা আছে, দিচ্ছি।…হ্যাঁ, পিটার, তুমি যখন চিঠি লিখবে মিঃ অ্যাসবিকে, আমার কথা বেশ সুন্দর করে লিখো। বুঝলে ? এই নাও ঠিকানা, আর এই তোমার বকশিশ।

অর্থাৎ ঘুষ ! যাতে অ্যাসবিকে রোজের কথা 'সুন্দর করে' লেখে। সর্বাঙ্গ জ্বলে গেলেও এ-ঘুষ হাত পেতে তাকে নিতে হল। শাদা মানুষের 'বকশিশ' প্রত্যাখ্যানের সাহস নিগ্রোর এখনো আসে নি।

লিবিয়ার রণক্ষেত্রে একদিন হঠাৎ পিটার কাবাকু আলেক অ্যাসবির চিঠি পেল। নিগ্রো সৈন্যদের জন্যে ব্যারাক আলাদা। ছোট্ট ছোট্ট খুপরিতে চারজন করে সৈন্যের আস্তানা। নির্জনতা দুষ্প্রাপ্য, ব্যক্তিগত আব্রুর প্রয়োজন সর্বদা অতৃপ্ত। পিটার অ্যাসবির চিঠি পড়ল রণক্ষেত্রেই: সেখানে পারস্পরিক মনোযোগের সুযোগ-সময় সীমিত। কুশ্রী হস্তাক্ষরে মোটা হরফে লেখা চিঠি, ঠিক মানুষটার চরিত্রের পরিচায়ক; পড়তে পড়তে জীবনে প্রথম ও অদ্বিতীয় মনিবের চেহারাটা পিটারের চোখের সামনে ফুটে উঠল।

পিটার, তুমি এই চিঠি পাবার আগেই আমি মরে গেছি। মরবো বলেই যুদ্ধে এসেছিলাম। তবু সাহস পেতে, সুযোগ পেতে, অনেকদিন কাটল। আজকের তারিখটা দেখে নিয়ো, কাল আমি মরবো। মরবার আগে শেষ কথা বলবার মতো মানুষের সন্ধান করতে গিয়ে একটা নিগ্রো ছোকরা ছাড়া আর কারুর খোঁজ পেলাম না। জীবনে অনেক সঞ্চয় করেছি, বুঝতে পারছি।

একদিন তুমি আমার চাকর ছিলে। আজ রণক্ষেত্রে তুবি আমার সাথী। এ-যুদ্ধটা নাকি সবার স্বাধীনতার জন্যে। আমার তো বটেই ঃ কাল আমি সম্পূর্ণ স্বাধীন হব। যদি বড় বড় মানুষের কথার কোন দাম থাকে, তোমাদের ভাগ্যও হয়তো মোড় ফিরবে, কয়েক বছরের মধ্যেই। আশা করি, তুমি মরবে না, বাঁচবে। বেঁচে থাকবার অর্থ খুঁজে পাবে।

যুদ্ধের পরে সুযোগ পাও তো ইংলণ্ডে যেয়ো। সেখানে ইংরেজের অন্য পরিচয় পাবে। সুযোগ পাও তো বিদ্যা বাড়িয়ো। আগামী দিনের আফ্রিকার সবচেয়ে প্রয়োজন হবে নব্যশিক্ষিত, নব্যদীক্ষিত মানুষের।

তুমিই একমাত্র মানুষ যে আমার সেবা করেছ। তার সামান্য প্রতিদান দিতে চাই। যদি কখনো দরকার মনে করো, যে ব্যাঙ্কের নাম নিচে লিখলাম ওখানে গেলে কিছু টাকা পাবে। তোমার নামে ব্যবস্থা করে গেলাম। ব্যাঙ্কটা লণ্ডনে।

লাইফ্ ইজ নট এ বেড অব রোজেস্. পিটার, নট্ ইভ্ন্ অব্ ওয়ান্ রোজ্। পিটার, জীবনটা অজস্র গোলাপের শয্যা নয়, একটি গোলাপেরও না।

আলেক অ্যাসবির দান পিটার আজও গ্রহণ করে নি। মনে হয়েছে, গ্রহণ এ-দানের অসম্মান। নিলেই তো সে নিঃশেষ! যতক্ষণ আছে, নিই নি, ততক্ষণ

তা অমর। পরিণত জীবনে ইংরেজ-শাসনের বিরুদ্ধে পুঞ্জীভূত নালিশের মধ্যেও পিটার অন্তরের গভীরে এই একটি ইংরেজ মানুষের প্রতি একটুকরো গভীর মমতা ও নিবিড় শ্রদ্ধার রোশনি দেখতে পেয়েছে।

লিবিয়া থেকে ফ্রান্স। ফরাসীর মাতৃভূমি পরদেশি বিজেতার কবল থেকে মুক্ত করে দেশসন্তানদের হাতে ফিরিয়ে দিতে যে অসংখ্য মানুষ জীবন দিয়েছে বা দিতে প্রস্তুত ছিল, আফ্রিকার শ্বেতাঙ্গঘৃণিত নিগ্রো যুবক পিটার কাবাকু তার একজন। আজ ফ্রান্স আফ্রিকার এক-তৃতীয়াংশকে পরাধীন করে রেখেছে, কিন্তু তার মুক্তির জন্যে কি সে পিটারের কাছে সামান্য ঋণও স্বীকার করবে না চরম হিসেব-নিকেশের দিনে?

ফরাসী-মুক্তির জন্যে পিটার প্রায় প্রাণ দিতে বসেছিল।

রণক্ষেত্র থেকে ভয়ংকর আঘাত পেয়ে হাসপাতালে স্থানান্তরিত হল পিটার কাবাকু। তিনদিন অজ্ঞান থাকার পর জীবন সে ফিরে পেল, কিন্তু বুকের পাঁজরার একখানা হাড় বিশ্ববাপী মৃত্যুযজ্ঞে আহুতি দিতে হল তাকে। সুস্থ হবার পর আর তাকে রণক্ষেত্রে যেতে হল না। যুদ্ধ-দেবতার কাছে তার প্রয়োজন নিশেঃষ হয়েছে। ছাড়পত্র পেয়ে পিটার চলে গেল ইংলণ্ডে।

লণ্ডনে পিটার নতুন জীবন পেল। কর্মের অভাব হল না, অর্থের প্রয়োজন মিটল। পিটার কাজ পেল যুদ্ধের মাল-সরবরাহের একটি প্রতিষ্ঠানে। কর্মান্তে অধ্যয়ন। অনেক রাত পর্যন্ত ক্লাস করে ইষ্ট এণ্ড-এ নিজের ছোট্ট ঘরখানায় ফিরে এসে রজনী অর্ধেক তার কেটে যেত পড়াশোনায়। যুদ্ধের লণ্ডনে ইংরেজ-চরিত্রের সুমহান পরিচয় সে পেল। নিরুত্তেজিত স্থির সাহসের সঙ্গে দিনরাত চরম বিপদের সঙ্গে সহবাস করছে সমস্ত জাতি, আর সেই অন্তিম আপদের দিনেও ব্যক্তির, সমাজের বর্গপরিমাণ স্বাধীনতাকেও সে সযত্নে বাঁচিয়ে রাখতে চেয়েছে। অথচ, পিটার অবাক্ হয়ে ভাবে, সারা পৃথিবী জুড়ে এই ইংরেজই পরাধীনতার শৃঙ্খল দিয়ে সাম্রাজ্য বুনে রেখেছে! সাধারণ ইংরেজ জানে না, জানতে চায়ও না, সাম্রাজ্যের কথা। যারা জানে, সেই নেতাদের ক্ষুদ্র গোষ্ঠি, সাম্রাজ্য-স্বর্গ হতে বিদায় নিতে আজও নারাজ।

লণ্ডনে পিটার প্রথম সাক্ষাৎ পেল জোমো কেনিয়াটার। বিরাট দেহ, পেশল চওড়া, কুচকুচে কালো। চোখ দুটো সারাক্ষণ কীসের অতৃপ্ত তৃষ্ণায় মধ্যাহ্নের বুক-ফাটা মাটির মত্নে তীক্ষ্ণ! জোমো কেনিয়াটা লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে

পড়ান, আর কয়েকজন নিগ্রো ও শ্বেতাঙ্গ নিয়ে আফ্রিকার স্বাধীনতা-সপক্ষে ইংলণ্ডে জনমত গঠন করেন। তাঁর কর্মীর অভাব; পিটার কর্মের অক্লান্ত সন্ধানী। পিটার লেগে গেল নতুন এক কাজের নেশায়। এতদিন আফ্রিকা নামক বিরাট একটা সত্তার সন্ধান সে পায় নি, এখন পেল। বুঝল, কিনিয়ার যে বেদনা, যে আর্ত অপমান, যে তীব্র লাঞ্ছনা, তা সমস্ত আফ্রিকার। যে-জ্বালা তার অন্তরে, তা সমস্ত নিগ্রোর বুকে। নতুন কাজে সর্বপ্রথম তার হাত মিলল আফ্রিকার অন্যান্য দেশের নিগ্রো কর্মীর হাতে—তারা এসেছে গোল্ড কোস্ট, নাইজিরিয়া, রোডেসিয়া, নায়াসাল্যাণ্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা এবং আরও অনেক দেশ থেকে। পিটার প্রথম জানল সংহতির স্পন্দন। অনেক হাত একত্র মেলানোর শক্তি। সবাই মিলে তারা পড়ল আফ্রিকার ইতিহাস। জানল তাদেরও অতীত ছিল। ছিল ঐতিহ্য। জানল কী ভয়ানক নৃশংসতা, ছল, চাতুরি ও কঠিন বৃহত্তর বলের জোরে য়ুরোপ অল্পদিনে দখল করে নিয়েছে একটা বিরাট মহাদেশ: ছায়াবৃতা আফ্রিকা। আরও জানল, আফ্রিকার মুক্তিযজ্ঞ শুরু হতে দেরি নেই। এ-যজ্ঞে আহুতি দেবে হাজার হাজার নিগ্রো নিজের ধন, প্রাণ, সর্বস্ব; কিন্তু তারাই শুধু নয়। নিগ্রোর মুক্তিযাত্রা মানব-সমাজের মুক্তি-মিছিলের অংশ। ইংলণ্ডে পিটারের চোখ খুলল, মন ও হৃদয় উন্মুক্ত হল। সে দেখল এমন ইংরেজও আছে যারা তার ব্যথায় সমব্যথী। আলেক অ্যাসবির রাজনীতি ছিল না; জীবননীতিতে চরম ব্যর্থতা একটা নিগ্রো ছেলের প্রতি তার মনকে সিক্ত করেছিল। কিন্তু এবার পিটার এমন ইংরেজের সন্ধান পেল যাঁরা রাজনীতি ও মানবনীতিতে তার নমস্য।

যুদ্ধ শেষ হলে জোমো কেনিয়াটার সঙ্গে পিটার কিনিয়ায় ফিরল। গ্রামে মাস-তিনেক কাটিয়ে নাইরবিতে ফিরে এসে তার প্রকৃত কর্মজীবন শুরু হল। কেনিয়াটার স্থাপিত পিপল্‌স্ কনভেনশন পার্টির অন্যতম উদ্যোক্তা নিযুক্ত হল পিটার কাবাকু। দল সংগঠনের জন্যে কিনিয়ার সর্বত্র তাকে ভ্রমণ করতে হল, গিকুয়ুর মতো অন্যান্য উপজাতির সঙ্গে তার পরিচয় ঘনিষ্ঠ হল। নাইরবি হল পিটারের বাসস্থান। বছর-দুয়েক পরে বাবার সম্মতি পেয়ে ওয়াচিরাকে নিয়ে এল শহরে। ওয়াচিরা তখন দ্বিতীয়বার জননী হয়েছে।

প্রথম সংগ্রাম ভূমি নিয়ে। জোমো কেনিয়াটা জানতেন জমিই হচ্ছে কিনিয়ার প্রধান সমস্যা। তাই জমি-বঞ্চিত জাতির ভূমি-দাবি নিয়ে তিনি তাঁর সংগ্রাম গড়ে তুলতে চেষ্টিত হলেন। কিন্তু প্রতিপক্ষ মহাবলবান;

কেনিয়াটা জানতেন এ-সংগ্রামে জয়ের আশা কম। নিগ্রোর মনে অসন্তোষের বহ্নি ; সহজেই সে উত্তেজিত, হিংস্র হয়ে ওঠে। প্রতিপক্ষ তাকে হিংসার দিকে ঠেলে দিয়ে হিংসার বদনামে পৃথিবীর কাছে হেয় করে কঠিন হাতে তার দাবিকে দমন করবার মতলব কষছে। অথচ, পিটার দেখতে পেল, কেনিয়াটা এ-বিপদ সম্বন্ধে সচেতন নন। তিনি চাইছেন সংগ্রাম। নিজে তিনি হিংসা চান না, কিন্তু হিংসার বাইরে অন্য পথ তাঁর জানা নেই।

এখানে পিটারের অন্তর প্রথম সংশয়িত হয়ে উঠল। হিংসায় তার আপত্তি নেই, কিন্তু দুর্বল, নিরস্ত্র, সরল, সহজে উত্তেজিত নিগ্রো হিংসায় কী করে পারবে দুর্ধর্ষ ইংরেজের সঙ্গে ? বিশ্বযুদ্ধে জয়ী ইংরেজ বিনা দ্বিধায় নিগ্রোর সে নিষ্ফল বিদ্রোহ বিচূর্ণ করবে। সংগঠন গড়ে ওঠবার আগেই এ-বিপদ বুকে নেওয়া পিটার কাবাকুর মন গ্রহণ করতে চাইল না। কেনিয়াটা অধৈর্য অস্থিরতার সঙ্গে সংগ্রাম চাইছেন ; তার নিশ্চিত ভয়াবহ পরিণাম ভেবে দেখছেন না। অনেক তর্ক হল, অনেক আলোচনা। পিটারের মন অন্য পথ খুঁজতে লাগল।

এমন সময় ঘটল সেই অভাবনীয় ঐতিহাসিক ঘটনা। সহসা ইংরেজের অস্তবিমুখ সাম্রাজ্য পূর্বাচলে অস্ত গেল। স্বাধীন হল ভারতবর্ষ, বর্মা, সিংহল। ভারতবর্ষ কেটে দু'খণ্ড হল, কিন্তু অস্ত্রোপচার করেই ইংরেজ বিদায় নিল। এ অসম্ভব ব্যাপার আফ্রিকার বুকে তুলল ঝড়। নিগ্রো ভাবল, এবার আমার দুঃখের রাত শেষ হবে। ইংরেজ ভাবল, ভারতবর্ষে যা হল, সে মূর্খতার পুনরাবৃত্তি আফ্রিকায় হতে দেব না। দুই প্রতিপক্ষ আরও দূরে সরে গেল অথবা সংঘর্ষের টানে নিকটবর্তী হল।

পিটার নিজেকে বলল, ভারত যে-পথে স্বাধীনতা পেল, সে-পথই নিশ্চয় আফ্রিকার পথ।

অন্তর থেকে প্রশ্ন হল, সে কোন্ পথ ?

পিটার স্বীকার করল, জানি নে।

বিতর্ক হল, আলোচনা হল। কিন্তু নতুন পথের সন্ধান মিলল না। কেউ বলল, ভারতের পথে আমরা চলব কী করে, আমাদের গান্ধী নেই, নেহেরু নেই। কেউ বলল, আমাদের অত সময় কোথায়—সেই পঞ্চাশ বছরের সুদীর্ঘ পথ ? কেউ বা বলল, ইংরেজের সঙ্গে অহিংসা করে ভারতবাসী নিজেদের মধ্যে পাশবিক হিংসায় লিপ্ত হতে বাধ্য হয়েছে। আবার কেউ ঘোষণা করল,

গান্ধীবাদ আসলে পুঁজিবাদী জমিদারদের পথ, জনতা-বিরোধী, সংগ্রাম-বিমুখ।

পিটারের মন সায় দিল না। একজন মানুষ অসীম এক সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়াল: সে কি সংগ্রাম-বিমুখ? ত্রিশ বছরে তেত্রিশ কোটি মানুষকে সে মুক্তি এনে দিল: সে কি জনতা-বিরোধী? অথচ কোথায় তার শক্তির উৎস? শুধু কি সে দাঁড়াল বিদেশী অত্যাচারীর বিরুদ্ধে? সে দাঁড়াল নিজের দেশের বীভৎস হিংস্রতার প্রতিরোধে, বার্ধক্য উপেক্ষা করে শ্মশানে প্রাণ ফিরিয়ে আনল, আর চরম দান দিয়ে গেল সমস্ত মানুষকে, সে তার মৃত্যুহীন প্রাণ। যীশুকে মানুষ সহ্য করতে পারে নি, নৃশংসভাবে হত্যা করেছিল। একেও মানুষ সহ্য করতে পারল না। ঘাতকের গুলি নিঃশেষ করে দিল ক্ষুদ্র, ক্ষীণ শরীরের ধুক্‌ধুক্ প্রাণ: শেষ করল বিশ্বজনের এক পরম ঐতিহ্য। পিটার জানত, কিনিয়ায় জ্বলবার দেরি নেই। মরতে তার দ্বিধা নেই, কিন্তু যে-আগুন সে নিজে জ্বালতে চায় না, তাতে পুড়ে মরতে অন্তরে সে সায় পেল না। মন বলল, নতুন পথের সন্ধান কর। এখানে নয়, অন্য কোনখানে।

এমন সময় কনভেনশন পার্টিতে প্রস্তাব উঠল, ভারতবর্ষে শুভেচ্ছা-জ্ঞাপক ও জনমত-সংগঠক একটি মিশন পাঠান হোক। পিটারের ভাগ্য প্রসন্ন হল। ভারত সরকারের একটা বৃত্তি সে পেয়ে গেল। কেনিয়াটা তার ওপর নতুন দায়িত্ব চাপালেন। অধ্যয়ন করার সঙ্গে ভারতের সঙ্গে কিনিয়ার স্বাধীনতা আন্দোলনের যোগাযোগ তাকে স্থাপন করতে হবে। পিটার এল ভারতবর্ষে। পথ ও পাথেয়র সন্ধানে।

কিছুদিনের মধ্যেই কিনিয়ায় আগুন জ্বলে উঠল। ইংরেজ তার নাম দিল, মাউ মাউ বিদ্রোহ। ভারতবর্ষে বসে পিটারের মন হায় হায় করে উঠল।

এ-আগুন একদিন নিভবে, পিটার তার দেবতার কাছে প্রশ্ন করল, কিন্তু সে কি শ্মশানের ভস্মে? শীতল জলে এর লেলিহান জিহ্বা শান্ত হবে না? মানুষের মনে সম্প্রীতি নিঃশেষে পুড়ে নিঃস্ব হয়ে যাবে? ইংরেজ আর নিগ্রো শেষে মুখোমুখি দাঁড়াবে অখণ্ড হিংসার দুই প্রান্তে?

পাঁচ

রবিবারের নয়াদিল্লীতে কর্মবিরতির আলস্য। সেদিন মহাধিকরণ বন্ধ, তাই সারা শহরটার কোন কাজ নেই। সকালবেলা সপ্তাহে ছ'দিন নতুন ও পুরোনো শহরের নানা কেন্দ্র থেকে ঊর্ধ্বশ্বাসে বহু পথে, যানে ছুটে এসে মানুষগুলি ঢোকে ভারত সরকারের বিরাট বপুর রন্ধ্রে রন্ধ্রে; সকাল গড়িয়ে দুপুর, দুপুর গলে বিকেল, বিকেল পচে সন্ধ্যে; উত্তীর্ণ সন্ধ্যেয় দৈনন্দিন জীবনের রোজ-নামচা শেষ করে এই মানুষগুলি আবার বহু পথে, বহু যানে ঘরে ফেরে। দপ্তর নিয়ে তাদের জীবন; দপ্তর তাদের জীবনবেদ।

বিবেক সোম ভারত সরকারের কর্মচারী নয়। তবু তার কর্ম ভারত সরকারের সঙ্গে। তাই দপ্তর ছুটি মানে তারও ছুটি। রবিবারের ব্যাপক আলস্য তাকেও আক্রমণ করে। সকালে বিছানা ছাড়তে ইচ্ছে করে না; খবরের কাগজ নিয়ে অনেকক্ষণ পড়া-না-পড়ার মাঝখানে মনটাকে স্থাণু করে রেখে দেয়; দাড়ি কামিয়ে স্নান করতে কিছুতেই গা ওঠে না। বাগানের সবুজ ঘাসে, তাজা শিশির-ভেজা ফুলের চটুল বর্ণে, ব্যস্তসমস্ত চড়ুই পাখির অক্লান্ত কর্মপটুতায় রবিবারটা কেমন যেন কী একটা খুঁজে বেড়ায়। অভ্যাস যতই বলে, ওঠো, দাড়ি কামাও, স্নান করো, ওরা ততই মিনতি করে, বসো না একটু আমাদের সঙ্গে, দেখো না আমরা কত মজা করি, কী সুন্দর আমাদের জীবন!

গেটের ওপর লোহার আর্কে দ্বিধাহীন মাধবী ফুটেছে। বুকের বসন ছিঁড়ে ফেলে দাঁড়িয়েছে এই প্রভাতখানি। প্রথম বসন্তের প্রভাত। বিবেক মুগ্ধ হয়ে তার অপূর্ব দেহলাস্য দেখছে: মনের মধ্যে শুধু দুটি কথা কূজন করছে, আজ ছুটি। আজ আর ছুটতে হবে না সেই-সব পেট-মোটা, মাংসল-ঘাড়, ডবল-চিবুক, কানের-পাশে-পাকা-চুল মহারথীদের কাছে যাঁরা দিনের পর দিন দেশ-শাসন নামক দুর্ধর্ষ কর্তব্য পালন করছেন। আজ হৃদয়ে ফাল্গুনী ঢেউ; বেড়া-ভাঙার সুস্থ বাসনা।

মাধবীর বুক থেকে মধুপান করছে কালো রঙের একটা ভীষণ চটপটে পাখি, এক ফুলের মধু শেষ করে উড়ে বসছে অন্য ফুলে। আকাশটা বিরাট নীল,

আর মাঝে মাঝে ক্ষীণ গতি পেঁজা-তুলো মেঘ। রং-বেরং-এর মৌশুমী ফুলে বাগানটাকে বড় রূপসী বিলাসিনী মনে হচ্ছে। এক ধারে গোল করে ছাঁটা দুটো বন-কমলা গাছ, পাশাপাশি, মাঝখানে এক চিলতে শ্যাম। এই বোধ হয় বুকের বসন-খোলা প্রভাত। নবীন বাসনায় চঞ্চল।

বিবেক দেখতে পেল সুরমা স্নান সেরে ফিকে পেঁয়াজি-রঙের তাঁতের শাড়ি গায়ে জড়িয়ে সাবান-কাচা জামা-কাপড় পেছনের বারান্দায় মেলে দিল। সুরমার রবিবার নেই। যে-দপ্তরে তার কাজ, সেখানে ছুটি নেই। তার জীবন সপ্তাহে সাতদিন এক সুরে বাঁধা। ভোর হতেই সে রোঁজ উঠবে। উঠে স্নান করবে। স্নান সেরে যাবে একান্ত-আপন তার পূজার ঘরে, সেখানে দেবতার কাছে তার রোজ দিন-শুরুর প্রার্থনা। তারপর চুল আঁচড়াবে, মৃদু একটু প্রসাধন করবে, দেহে আনবে সকালবেলার যুঁইফুলের সুবাস। নিজের হাতে দু' কাপ চা বানিয়ে, ট্রেতে বসিয়ে নিয়ে আসবে শোবার ঘরে। সেই চা পান করে বিবেকের শয্যাত্যাগ।

আজ সে জোর করে সুরমাকে কিছুক্ষণ বিছানায় ধরে রেখেছিল। কিন্তু অলস প্রথম প্রভাতে পৃথিবীর আক্রমণ বড তাড়াতাড়ি শুরু হয়ে যায়। নিঃশব্দ সৌন্দর্যের ছন্দ চূর্ণ করে গেটের মধ্যে ঢোকে কর্কশ সাইকেল। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে পৃথিবী তার অনন্ত কলরব, কোলাহল, কলহ নিয়ে মাথার কাছে জানালার পাশে এসে দাঁড়ায়। অথচ এই তীব্রস্বাদ খাদ্যের প্রতি এমনই বিকৃত লোভ যে প্রকৃতির সৌন্দর্য, প্রেয়সীর সঙ্গ ছাপিয়ে ওঠে প্রভাতী সংবাদপত্র। সংবাদ তো নয়; কুসংবাদ, দুঃসংবাদ। মানুষে মানুষে, দেশে দেশে ঝগড়ার সেই পুরোনো কাসুন্দি; স্বল্পবুদ্ধি নেতাদের অসীম আত্মপ্রেম; দুর্নীতি, দুরাচার, অন্যায় ও অত্যাচারের দিনলিপিঃ নারীধর্ষণ; অবৈধ প্রণয়; অকাল আত্মহত্যা; স্তম্ভের পর স্তম্ভ বাজে লেখার, বাজে কথার স্তূপ। তবু বাসি পচা জিনিসে যেমন মাছির ভিড, তেমনি এই দুর্গন্ধ সংবাদ-সম্ভারে মানুষের লোভ। শান্তি 'সংবাদ' নয়, যত 'সংবাদ' সব অশান্তি। মৈত্রী 'সংবাদ' নয়, যেন তা একান্ত অস্বাভাবিক ও অসম্ভব, তাই মৈত্রীর জন্যে অনর্থক এত চিৎকার। পৃথিবীর যে সংখ্যাহীন মানুষ নিজেদের দুঃখ-সুখ নিয়ে কাজ করে, দিন কাটায়, যারা রাজনীতির ঘোলা জলে রোজ মন নোংরা করে না, যারা নারীধর্ষণ করে না, ডাকাতি বা রাহাজানি করে না, তাদের মধ্যে কোন 'সংবাদ' নেই। অথচ সংবাদপত্র পরিবেশিত কলরব-কলহ-কলংকের তারাই গ্রাহক।

বিবেক সংবাদপত্রের শিরোনামাগুলির ওপর চোখ রাখল আর সুরমা নিঃশব্দে শয্যাত্যাগ করল। বিবেক পত্রিকা-পাঠ শেষ করে বারান্দার ডেক-কেদারায় গা এলিয়ে ঘুম-ভাঙা সকালের নগ্ন সৌন্দর্য দেখছে, আর সুরমা স্নান করেছে, সাঙ্গ করেছে প্রভাতী প্রার্থনা, মৃদু প্রসাধন; হালকা পেঁয়াজ-রঙের শাড়ির সঙ্গে নক্সা-ছাপা হলদে ব্লাউজ পরেছে, কপালে ছোট্ট সিঁদুরের টিপ, এককণা সিঁদুর অলক্ষ্যে তার চিবুকে আটকে আছে। সেই রক্তবিন্দুর দিকে সর্বাগ্রে নজর পড়ল সোমের, সুরমা যখন চা নিয়ে ঢুকল বারান্দায়, ট্রে স্থাপিত করল কাঠের ছোট্ট টেবিলে, বিনাবাক্যে চা তৈরিতে মন লাগাল।

বিবেক দৃষ্টিকে চূড়ান্ত উদাসীন, দূরমুখী করে আপন মনে আস্তে আস্তে গুনগুন করে উঠল: 'নির্জন নদীতীর' নেই, কিন্তু 'নির্মলবায় শান্ত উষা' আছে। তাই বলি, দেবী, তব সিঁথিমূলে লেখা, নব অরুণ সিঁদুররেখা, একাকী একটি বিন্দু যদিও চিবুকে দিতেছে দেখা।

সুরমা সরমে রঙিন হল। আঁচল তুলে চিবুক মুছল। তারপর চা-পাত্র এগিয়ে দিয়ে বলল, আজ তোমার হয়েছে কী বল তো?

ছুটিতে পেয়েছে। আজ র-বি-বা-র।

ছুটি তো ভারি! তোমার আবার ছুটি কী? আজ কটা ফ্যাকড়া বাধিয়ে রেখেছো মনে আছে?

থামো থামো। এখুনি সূর্যের প্রতাপ শুরু হবে। এমন সুন্দর সকালটা শেষ হবে। তারপর আরম্ভ হবে দিনের অবক্ষয়। এখন, হে রমণী, ক্ষণকাল আসি মোর পাশে, চিত্ত ভরি দিলে সেই রহস্য-আভাসে।

সুরমা হাসল। এই ক্ষণজীবী পাগলামিটুকু বিবেকের মধ্যে তার বড় ভালো লাগে। সে একে প্রশ্রয় দেয়। কিছুতেই ছন্দপতন করে না। ঈষৎ ভ্রূ বাঁকিয়ে জিজ্ঞেস করল, কোন্ রহস্য-আভাস?

দেখ সুরমা, নতুন একটা সিগারেট ধরিয়ে সোম বলল, আজ একটা দিনের মতো দিন। আজ, তোমার মনে আছে, সেই নিগ্রো ভদ্রলোক আসছেন রবিঠাকুরের কবিতা শোনবার জন্যে? সেই পিটার কাবাকু? তাই আমার মনে বড় খুশি। রবীন্দ্রনাথের কাব্যবাণী আমার মাধ্যমে প্রবেশ করবে আফ্রিকার গহন বনে, প্রাচীন অন্ধকারে। ব্যাপারটা একবার ভেবে দেখেছো, সুরমা?

যেমন মাধ্যম, তেমনি আধার, ব্যঙ্গ করল সুরমা।

হ্যাঁ, মাধ্যম নিয়ে ব্যঙ্গ করতে পার বটে। কিন্তু আধার নিয়ে ক'রো না।

ওরা বড় ক্ষুধার্ত। প্রাণে ওদের বড় জ্বালা। তাই রবীন্দ্রনাথের বাণী ওদের শান্তি দেবে।

সুরমা বলল, লোকটি মন্দ নয়। কিন্তু অদ্ভুত চেহারা বাবা!

কাবাকুকে তোমার কুৎসিত লাগে, সুরমা? তা লাগতে পারে। কুচকুচে কালো, থ্যাবড়া নাক, মোটা ঠোঁট, হলদে কুতকুতে চোখ। কিন্তু সুন্দরের কোন নির্দিষ্ট মাপকাঠি আছে, সুরমা? এই যে গৌরবর্ণের প্রতি আমাদের এত আকর্ষণ, এর পেছনে বহুকালের শ্বেতাঙ্গ-প্রভুত্বের ইতিহাস নেই? সেই কবে, কত হাজার বছর আগে, শ্বেতাঙ্গ আর্যরা এসে কৃষ্ণাঙ্গ দ্রাবিড়দের উত্তর-পশ্চিম ভারত থেকে বিতাড়িত করে নিজেদের রাজত্ব পাতল, আর সেই থেকে নতুন মনিবের গায়ের রং, আদব-কায়দা, সংস্কৃতি সব আমরা সর্বোত্তম বলে মনে করতে শিখলাম। কিন্তু আমি তোমাকে সত্যি বলছি, সুরমা, মাদুরার মীনাক্ষি-মন্দিরের সহস্রস্তম্ভ চতুরাস্র চত্বরে যেসব কালো পাথরের নারীমূর্তি আছে, দেহ-সৌষ্ঠবে, রেখা-মাধুর্যে তার তুলনা আমি কোথাও দেখতে পাই নে।

সুরমা চটুলতার সঙ্গে জবাব দিল, তা জানি। কিন্তু দ্রাবিড়ী সৌন্দর্যের সঙ্গে আফ্রিকার কদর্যতার তুলনা?

তুমি আফ্রিকাকে কুরূপ বলছো, সুরমা, এজন্যে যে তুমি প্রচলিত ভারতীয় দৃষ্টিতে এমন কতগুলি মানুষের দিকে তাকাচ্ছো যাদের দেহের অন্ধকার থেকে মনের অন্ধকার বেশি। অথচ, এমন দিন চিরদিন ছিল না। গ্রীক ঐতিহাসিক হেরোডোটাস ইথিওপিয়ার মেয়েদের পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দরীদের মধ্যে স্থান দিয়েছিলেন। শাদা-চামড়া সলোমন কৃষ্ণা সেবার রূপে আত্মবিস্মৃত হয়েছিলেন। আর আমাদের দেশেই দেখো না! কালিদাসের ব্যবস্থামতো প্রকৃত সুন্দরী হবে শ্যামা (যেমন তুমি, সুরমা); আর আমরা পুরুষপ্রধান কৃষ্ণের বর্ণ নির্বাচন করেছি নবদূর্বাদলশ্যাম (যেমন, আমি)। যে চিত্রাঙ্গদার রূপে অর্জুন ভুলেছিলেন সেই মণিপুরী মেয়ে নিশ্চয় নবদূর্বার চেয়েও ঘনশ্যাম ছিল। আর তোমাদের দ্রৌপদী? যিনি অমন পাঁচ-পাঁচটা প্রচণ্ড পুরুষের প্রেয়সী হতে পেরেছিলেন? তাঁরও তো প্রকৃত নাম ছিল কৃষ্ণা।

তুমি বুঝেও বুঝতে চাইছো না, সুরমা প্রতিবাদ জানাল, কালোটাই তো বড় কথা নয়। কালো আর সুন্দর পরস্পরবিরোধী নাও হতে পারে।

মানলাম। চা-পান শেষ করে বিবেক স্বীকার করল: কালোতেও আলো থাকলে তা সুন্দর হয়। এই আলোই তো গোটা আফ্রিকার দাবি, সুরমা।

য়ুরোপের শাদা মানুষ আফ্রিকার নাম দিয়েছে ডার্ক কন্টিনেন্ট, অন্ধকার মহাদেশ। দুটো পরস্পরবিরোধী, পরস্পরবিদ্বেষী মান তৈরি করেছে, শাদা আর কালো। শতাব্দীর বেশি যাদের অন্ধকারে নির্বাসিত করে রেখেছে তারা আজ আলোর সন্ধানী। আলো পেলে আফ্রিকার কালো কুৎসিত মানুষকেও সবার ভালো লাগবে, সুরমা। থ্যাদা-নাক, মিটমিটে-চোখ, তামাটে জাপানী বা ফ্যাকাশে চীন যদি সভ্যসমাজে গ্রাহ্য হয়, তাহলে পিটার কাবাকু কেন হবে না?

বাইরে অপ্রত্যাশিত গাড়ি-থামার আওয়াজ হল, আর বাধা পড়ল বিবেক-সুরমার প্রভাতীগুঞ্জনে। গাড়ির আওয়াজে চকিত হয়ে সুরমা বলে উঠল, নির্ঘাত জন মিলার। অমন ধপ্ করে গাড়ি এ-শহরে আর কেউ থামায় না।

বিবেক রঙ্গ করে বলল, এককালে পদধ্বনি প্রিয়বন্ধুর আবির্ভাব ঘোষণা করতো। একালে মোটরগাড়ির চাকা ও হর্নের বিকট আওয়াজে বান্ধবীমানসে পুলক সঞ্চার হয়ে থাকে। তা, এই সাতসকালে মিলার সাহেব কেন, কোত্থেকে এবং কোন্ পথে? সোমজায়ার সঙ্গে পূর্বাহ্নে অ্যাপয়েন্টমেন্ট হয়েছিল নাকি?

সুরমা রঙিন হয়ে রেগে গেল: সবটাতেই একটা কুৎসিত-কিছু আবিষ্কার না করলে তোমার তৃপ্তি নেই।

দ্বিতীয়বার হর্ন বাজতে দুজনে দ্বারপথে অতিথি-অভ্যর্থনায় উদ্যোগী হল। মিলার তখন গাড়ি থেকে নেমে ফাটক খুলে বাগিচার বুকচেরা পথে অগ্রসর হয়েছে। সোমযুগলকে দেখে একগাল হেসে অভিবাদন জানাল মিলার।

সুপ্রভাত, সোম। সুপ্রভাত, মিসেস সোম। সাতসকালে উপদ্রব করতে এলাম।

সুপ্রভাত, মিলার। প্রভাতে উঠিয়া ও-মুখ দেখিনু, দিনটা একেবারে গোল্লায় গেল।

সুরমাকে হাসি চাপতে দেখে মিলার বলল, ওটার মানে কী হল?

রাধা-কৃষ্ণের কথা শুনেছ?

নিশ্চয়। শুধু শুনি নি, তোমার বৃন্দাবনে তিনদিন থেকেও এসেছি।

রাধিকা-দর্শন হয়েছিল ?

তা বলতে পারি নে।

শ্রীকৃষ্ণ একবার রাধার সঙ্গ ত্যাগ করে অন্য রমণীতে উপগত হয়েছিলেন, বলতে বলতে সোম মিলারকে বৈঠকখানায় এনে বসাল। সুরমা চলে গেল প্রাতরাশের ব্যবস্থা করতে।—যখন ফিরে এল, তখন তার চেহারা দেখেই রাধা রেগে আগুন। চোখের কোণে কালি, জামায় কুঞ্চিত কালো চুলের অংশ, গালে লিপষ্টিকের দাগ। রাধা বললে, খবরদার, এদিকে এসো না, ঐখানে দাঁড়িয়ে থাকো, তোমাকে দিয়ে আমার আর কাজ নেই। সকালে উঠেই তোমার ঐ শ্রী দেখতে হল, আজ দিনখানা কেমন যাবে ভগবান জানেন।

আর তুমি অনায়াসে আমায় দেখে তাই আবৃত্তি করলে ?

করলাম। আমার এমন সুন্দর রবিবারের সকালটায় তুমি এসে হাজির হলে, তাকে বিদায় দেবার সময় একটু আপসোস করতে পারব না ?

বুঝেছি। তুমি বেমালুম ভুলে গেছ, আজ আমার আসবার কথা ছিল। রাজারামের বাড়ির পার্টির দিন তুমি নিজেই আমায় নেমন্তন্ন করেছিলে। আরও বলেছিলে, সকালবেলাই চলে এসো, একসঙ্গে ব্রেকফাস্ট করা যাবে।

সোম ভয়ানক লজ্জা পেল। হঠাৎ মুখে কোন কথা বেরুল না। তারপর বলল, আমায় ক্ষমা কর, জন। একেবারে ভুলে গেছ্‌লাম। সুরমাকে পর্যন্ত বলি নি।

তাতে কী হয়েছে ? কোন কাজ নেই তো ?

কিচ্ছু না। তুমি রাগ কর নি ?

একেবারেই না।

এই হল মার্কিনী মহত্ত্ব, জন মিলার। কোন ইংরেজ হলে···

সুরমা এসে একটা চেয়ারে বসল।

সোম বলল, সুরমা, সর্বনাশ হয়েছে। আমিই জনকে আজ ব্রেকফাস্টে নেমন্তন্ন করেছিলাম। অথচ—

সুরমা হেসে বলল, একেবারে ভুলে গেছ, এই তো ? আমি কিন্তু ভুলি নি, মিঃ মিলার। আপনার ব্রেকফাস্ট তৈরি।

এই যে বিবেক বলল, সে আপনাকে পর্যন্ত বলে নি !

ঠিকই বলেছেন। উনি যখন আপনাকে আসবার অনুরোধ করেন তখন আমি পাশেই ছিলাম।

তাহলে সকালে আমাকে বলো নি কেন ?

তোমার ব্যাপারটা দেখব বলে। সুরমা আবার হাসল : এবার তোমার বুদ্ধিটাও দেখলাম। সোম আবার লজ্জা পেল।

প্রাতরাশে বসে জন মিলার দক্ষিণ-ভারতের কথা তুলল। কিছুদিন আগে সে সারা দাক্ষিণাত্য ভ্রমণ করেছে। অন্ধ্র, হায়দরাবাদ, মাদ্রাজ, ত্রিবাঙ্কুর-কোচিন। ইলোরা-অজন্তা দেখেছে ; দেখেছে তামিলনাদের প্রাচীন ভাস্কর্য, বিস্ময়কর বিরাট বিরাট মন্দির। গেছে তাঞ্জোর, মাদুরা, রামেশ্বর, ত্রিরুচিরাপল্লী, মহাবালিপুরম। প্রাচীন বিজাপুর, ও গোলকুণ্ডার ভগ্নস্তূপ দেখেছে। মহীশূরের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত দর্শন করেছে। বহুলোকের সঙ্গে কথা বলেছে, আলাপ জমিয়েছে, নামী লোক, নাম-না-জানা লোক। দক্ষিণ-ভারত জন মিলারের মন ভরে আছে। কিন্তু কেন যেন অন্তর স্পর্শ করতে পারে নি।

কী মনে হল আমার জান, সোম, তোমাদের দক্ষিণ-ভারত দেখে ? মনে হল যেন এক প্রাচীন রাজপুরী, দাঁড়িয়ে আছে তার সাবেকি জাঁকজমক, অহংকার আর নিঃসঙ্গতা নিয়ে ; জৌলুস গেছে, কিন্তু প্রাচীন রীতিনীতির নিষ্প্রাণ অবয়ব রয়েছে অটুট। আমার সবচেয়ে আশ্চর্য লেগেছে তোমাদের তামিলনাদ, উত্তাল উন্মত্ত সমুদ্রের তীরে এমন নিস্তরঙ্গ সভ্যতার সমতলভূমি আমি আর দেখি নি।

সমুদ্রের চেয়ে নদীর ভাঙন বেশি, সোম বলল। বাংলাদেশ নদীমাতৃক। বহু নদীর কাড়াকাড়িতে অনেক ভাঙা-গড়ার চিহ্ন তার ইতিহাসে। সমুদ্র দূরে, কিন্তু অতল জলের আহ্বান প্রত্যেক বাঙালীর বুকে।

অথচ শুনতে পাই তোমরা সবচেয়ে ঘরকুনো, অথবা বাংলাকুনো, দুঃসাহস-বিমুখ।

ও আমাদের নিন্দুকরা বলে। আসলে আমরা দুটোই। বাংলাদেশকে যে জানে না, সে বাঙালী মানসের উৎস খুঁজে পাবে না। আমরা এককালে হেলায় লংকা জয় করেছিলাম। আমাদের বন্দরে পৃথিবীর পণ্য ভিড় জমাতো। আমরাই পশ্চিম থেকে এনেছিলাম নতুন ভাবধারার বন্যা। প্রাচীন আত্মরক্ষী হিন্দু সমাজের অবরোধ আমরাই প্রথম ভেঙেছি। বার বার হিন্দুধর্মের সংকীর্ণতার বিরুদ্ধে আমরা করেছি বিদ্রোহ। অবশেষে একদিন আমরা যেমন

য়ুরোপ থেকে নিয়ে এসেছি নতুন জাগরণ-বাণী, তেমনি সনাতন হিন্দুধর্মকে নতুন গৌরবে প্রতিষ্ঠা করে আমরাই তাকে খ্রীষ্টান ধর্ম থেকে বাঁচিয়েছি। স্বাধীনতা-সংগ্রামের আগুন জ্বালিয়েছি আমরা, আর সে-আগুনে আমরাই পুড়েছি সবচেয়ে বেশি। গত ত্রিশ বছরে ভারতবর্ষের চেহারা অনেক বদলেছে। শিল্প গড়ে উঠেছে, রাজনীতি দানা বেঁধেছে, পাকা-পোক্ত শাসকশ্রেণীর জন্ম হয়েছে। এই পার্থিব সম্পদের স্ফীতমান হাটে-বাজারে বাংলা কোন বিপণি সাজায় নি। তার দান অন্যত্র। সে দিয়েছে ভারতবর্ষকে রামমোহন, রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, জগদীশচন্দ্র, অরবিন্দ। গত একুশ বছর পৃথিবীর কাছে ভারতবর্ষ যাঁদের পরিচয়ে জ্ঞাত, একমাত্র গান্ধীবাদে, তাঁরা প্রায় সবাই বাঙালী।

বাপরে বাপ। তুমি যে ভীষণ এক বক্তৃতা দিয়ে বসলে!

ইচ্ছে করেই দিলাম। সেদিন তোমাদের দূতাবাসে একটা পার্টি ছিল। এসে আলাপ জুড়লেন এক মাঝবয়সী ভদ্রমহিলা, এবং একটু পরে, জুটল আরও তিন-চারজন মেয়ে-পুরুষ। তাদের মধ্যে একটা ভাব বড প্রচ্ছন্ন দেখতে পেলাম। তাঁরা কলকাতার নামে শিউরে ওঠে, বাংলা বলতে আতংকিত হয়। রাস্তায় পচা দুর্গন্ধ, গা-ময়লা, দাঁত-বার-করা ঘর-বাড়ি, পথে-পথে অনন্ত মানুষ, আর মিছিল! বাংলা মানে কম্যুনিস্টদের দৌরাত্ম্য, ঘর-ছাড়া উদ্বাস্তুর উলঙ্গ জীবনযাত্রা, বস্তি, আর কলেরা-বসন্ত! 'আপনার কলকাতা কেমন লাগে?' প্রশ্নের জবাবে সব মার্কিন বিদেশীর নাসিকা কুঞ্চিত হয়। অথচ তারা এ-ও জানে, যত পয়সা-কেনা ফুর্তি কলকাতায় মেলে তার অর্ধেকও বোম্বেতে নেই।

আমি আরও শুনেছি, সোম, বাঙালীর মতো স্বজাতিভিত্তিয় ভারতের অন্য কেউ নয়।

মানতে দ্বিধা করতাম না, যদি এ-কথার প্রচলিত অর্থ এ না হত যে বাঙালীর সর্বভারতীয় দৃষ্টি নেই। তার একটা স্বকীয়তা আছে—যেমন আছে মারাঠার, গুজরাতির, তামিলের। কার নেই? বৃটেনে দেখেছি ওয়েল্‌শ্‌ স্বাজাত্য এখনও টাটকা—আর বৃটেন তো ঐটুকু একটা দ্বীপপুঞ্জ! তোমাদের দেশে নেই? তাহলে? স্বাজাত্য নিয়েও বাঙালী সর্বভারতীয় ভাবধারার নেতৃত্ব করেছে। শুধু সর্বভারতীয় কেন! তুমি বিবেকানন্দ ও রামকৃষ্ণের মধ্যে উদাত্ত বিশ্বজনীনতার আলো দেখতে পাবে। রবীন্দ্রনাথ যখন আন্তর্জাতিকতার

পাঞ্চজন্য বাজিয়েছিলেন, তখন তোমাদের য়ুরোপের মনীষীরা পর্যন্ত জাতীয়তা-বাদের দেয়াল লঙ্ঘন করতে পারেন নি।

মিলার সুরমাকে লক্ষ্য করে বলল, মিসেস সোম, আপনি এসব আলোচনায় যোগ দিচ্ছেন না যে!

সুরমা মৃদু হেসে জবাব দিল, আপনারা দুজনেই দুশো। তা ছাড়া, দুজনে আলাপ, তিনজনে প্রলাপ।

হোহো করে হেসে উঠে মিলার, বলল, হ্যাঁ, হ্যাঁ, ধরতে পেরেছি। থ্রি মেক্‌স্ এ ক্রাউড্।

কোম্পানিকে ক্রাউডে পরিণত করতে চাই নে, সুরমা যোগান দিল।

আমি একটা জিনিস দেখেছি, বুঝলেন মিসেস সোম। উত্তর-ভারতের মেয়েরা, ধরুন পাঞ্জাবী মেয়েরা, যতোটা উৎসাহ নিয়ে পুরুষদের ব্যাপারে যায়, আপনারা তা করেন না।

আমরা কী করি?

আপনারা উপস্থিত থেকেও একটু অনুপস্থিত। কাছে থেকে দূরে।

এই আমরা কারা? সব বাঙালী মেয়েরাই?

না, তা বলব না। তাহলেই সোম 'কোশ্চেন' বলে চিৎকার করে উঠবে। তবে অনেকেই। দক্ষিণেও আমি তাই দেখেছি।

কোন্‌টা আপনার ভালো লাগে?

আমাদের মেয়েরা কোন-কিছুতেই পুরুষের থেকে আলাদা থাকতে রাজি নয়। তারা স্ল্যাক্‌স্ পরে, পুরুষের মতো চুল ছাঁটে। একমাত্র প্রকৃতি যে পার্থক্যটুকু মানতে বাধ্য করেছে তার বাইরে তারা মানে না। মা হতেই হয়, প্রেমিকা না হয়ে পথ নেই। সমুদ্র-সৈকতে তারা ন্যূনতম আবরণ রেখে দেহকে সূর্যের লালসার কাছে ধরে দেয়, জীবন থেকে সবটুকু মধু নিঙড়ে পান করা তাদের জীবনবেদ। একবার যুদ্ধের বাজারে রাশিয়া থেকে একদল ব্যালে-নর্তকিনী আমেরিকায় এসেছিল। আমি তখন নিউইয়র্কে সাংবাদিকতা করি। নিউইয়র্ক টাইম্‌সে প্রথম পাতায় বড় হরফে খবর ছাপল, রুশ নর্তকীরা লজ্জাশীলা—'রাশান ড্যানসার্‌স আর শাই।' আপনারা যাকে লজ্জা বলেন, তা আমাদের মেয়েরা ত্যাগ করেছে। তারা জীবনসঙ্গিনী নয়, জীবনরঙ্গিনী। সহকর্মিণী নয়, শুধু কর্মিণী। তারা সম্পূর্ণ স্বাধীন। সমুদ্রতীরে নগ্নপ্রায় স্ত্রী-দেহ দেখে তাই আমাদের ঔৎসুক্য জাগে না, কিন্তু দিল্লীর রাজপথে

গজেন্দ্রগামিনীর চৌলি ও কটিদেশের মধ্যবর্তী অনাবৃত দেহভাগ আমাদের কৌতূহলী করে।

চমৎকার বলেছ জন, বেশ বলেছ। সোম সোৎসাহে যোগান দিল। তাই আমি সুরমাকে বার বার বলি, অমন করে সর্বাঙ্গ আবৃত করে সেজো না, অন্তত কটিদেশ সামান্য খোলা রাখ, যেখানে চমকিত বিদেশীর চকিত দৃষ্টি সন্তর্পণে বিচরণ করতে পারবে। কিন্তু সুরমা কোনদিন আমার সদুপদেশে কান দিল না।

সুরমা সরমে রক্তিম হল। যে-দৃষ্টি স্বামীর ওপর হানল তাতে সোমের বুদ্ধির প্রতি গভীর অপ্রত্যয়।

প্রত্যেক দেশের প্রকৃত পরিচয় তার মেয়েরা, জন মিলার বলে চলল, তাই বুঝি ভ্রমণবিলাসীদের আকর্ষণ করতে সব দেশের বিজ্ঞাপনেই সুন্দরী রমণীর ছবি থাকে। তার মানে অবশ্য এ নয় যে মেয়ের লোভে তুমি ভারতে এসো, মিশরে এসো, প্যারীতে এসো। তার মানে, এই দেখ, আমাদের দেশের স্ত্রীলোক কত শান্ত, কত সুন্দর, কত শ্রী আর কান্তি, তার মুখে-চোখে। এমনি শ্রী আর কান্তি আছে আমাদের দেশের মাটিতে, আকাশে, প্রকৃতির বৈভবে। আমরা পুরুষ, কাজ-অকাজ-কুকাজে জীবনপাত্র আমাদের পূর্ণ। আগন্তুককে আমরা কষ্টিপাথরে যাচাই করে নিই। আমাদের স্ত্রীলোকরা তা করে না। তারা দেখে, দেখায়। বিদেশী যখন কোন দেশে যায়, স্বভাবতই সে নারীসঙ্গ চায়! মেটাতে চায় সে-অভাব যার মূল তার জননী। কেবল পুরুষসমাজে তার মন ভরে না। তৃষ্ণা পায় নারীসঙ্গের—যে-নারী মা, বোন, বান্ধবী। এটা শুধু দেহের দাবি নয়। সে-দাবি মেটানোর পথ সর্বত্র প্রশস্ত। শুধু পয়সা-কেনা মেয়ে নয়, এমন অনেক মেয়ে বিদেশীর জীবনে উড়ে আসে পাখা-গজানো পিঁপড়ের মতো, যাদের চাহিদা ক্ষণিকের দুঃসাহস, মুহূর্তের মাদকতা। দীর্ঘ অবস্থানের পক্ষে এ-খাদ্য মোটেই যথেষ্ট নয়। বিদেশী তাই চায় এমন নারীসঙ্গ যা মা, বোন, বান্ধবী সব-কিছুর আস্বাদ দেয়। অর্থাৎ যে-দান জীবনে স্বাভাবিক, যা সর্বত্র সর্বদা সহজ, সজাগ, সমব্যথী।

ঠিক বলেছ, জন। বিলেতে গিয়ে আমারও তাই মনে হয়েছিল।

ভারতে এসে আমাদেরও তা মনে হয়। তফাত হল, আমাদের কষ্টটা বেশি। তোমরা বিদেশে যাও কম বয়সে, একটা নির্দিষ্ট লক্ষ্যের সন্ধানে। বৃটেনে গিয়ে, তার ওপর, তুমি মেনে নিয়েছিলে, অনুমান করছি, যে ওটা মনিবের দেশ,

ওখানে অবহেলা পেলে তা সইতে হবে। অবহেলা পাও নি, তার কারণ, ইংরেজ নিজের দেশে অত্যন্ত সুসভ্য এবং তুমিও একটি আকর্ষণীয় যুবক। দাঁড়াও, বলতে দাও, আমি বলছি না তুমি অনেক বুনো ওট বুনে এসেছ। আমরা প্রাচ্যে আসি বেশি বয়সে, আর কোন নির্দিষ্ট লক্ষ্য দু'তিন বছরে ভেদ করে দেশে ফিরে যাবার জন্যে নয়। তা ছাড়া, নিজের দেশে আমরা পাওয়ার প্রাচুর্যে অভ্যস্ত। সারাদিন ভূতের মতো খেটে সন্ধ্যেবেলা নতুন-চেনা বান্ধবীকে নিয়ে আশি মাইল বেগে গাড়ি চালিয়ে পাঁচশ মাইল দূরে নতুন কোন শহরের সবচেয়ে নাম-করা নাইট-ক্লাবে ফুর্তি করে রাত দুটোয় বাড়ি ফেরা, কিংবা একেবারেই না-ফেরা, আমাদের জীবনে অস্বাভাবিক নয়। অন্তত সপ্তাহ-শেষে আমরা অনেকে তা করে থাকি। তাতে যে মাদক উত্তেজনা আছে, তাকেই আমরা আনন্দ বলে জানি ; যে-জ্বালা আছে, তা-ই আমাদের তৃপ্তি।

আর ভারতবর্ষে ?

তার একান্ত অভাব। তবু উত্তর-ভারতে, অর্থাৎ পাঞ্জাব ও দিল্লীর কোন কোন পরিবারে আমরা জায়গা পাই। বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। কিন্তু বেশির ভাগ বিদেশীই ভারতীয় অন্দরে অগ্রাহ্য।

তোমরা মিশতে চেষ্টা কর ?

করি। কিন্তু পারি নে। সবাই আমাদের যেন একটু দূরে সরিয়ে রাখে। পুরুষরা একটু কম, মেয়েরা খুব বেশি। আমরা হাজির হলে আতিথেয়তার কার্পণ্য হয় না, বরং একটু বেশিই হয়। বুঝতে পারি আমাদের মন-রাখার জন্যে, খুব কম ভারতীয়ই আমাদের সঙ্গে স্পষ্টভাবে কথা বলে। আমরা যা বলি তাতে সায় দিয়ে যায়, যদিও তার চিন্তাধারা, বিশ্বাস হয়তো একেবারে আলাদা। নয়তো আমাদের মুখের ওপর এক-বালতি অপ্রিয় কথার বরফ-জল ঢেলে দেয়। বলে, আমরা সাম্রাজ্যবাদী, ভারতের শত্রু। বোঝে না, আমি একজন সাধারণ মার্কিন, আমি আমার দেশের রাষ্ট্রপতি নই, রাজনীতি আমার পেশা নয়। আমি সাম্রাজ্যবাদী নই, কারুর শত্রু নই, শুধু মানুষ, যদিও আমার কতগুলি প্রত্যয় আছে, বিশ্বাস আছে, মূল্যবোধ আছে, পছন্দ-অপছন্দ, বিচারবুদ্ধি আছে। তোমাদের মেয়েরা আমাদের সঙ্গে হয় বড্ড বেশি মেশে, নয় একেবারে মেশে না। প্রথম শ্রেণী সংখ্যায় কম, এত ঝাঁঝালো যে তার সঙ্গ বেশিক্ষণ অসহ্য। দ্বিতীয় শ্রেণী সংখ্যায় বেশি, তাদের অস্তিত্ব সর্বত্র।

এখানে একটা কথা আপনাকে মনে রাখতে হবে, মিঃ মিলার, স্বরমা বলল। আমাদের মেয়েরা বিদেশী বলেই আপনাদের সঙ্গে মেশে না তা নয়। অবিশ্যি, বিদেশীদের সম্বন্ধে খানিকটা সংশয় থাকা স্বাভাবিক, এবং সবদেশেই আছে। আমাদের মেয়েদের পুরুষদের সঙ্গে মেশা এখনো অনেকখানি সংযত। আগে আরও ছিল। এখন পুরোনো নিষেধ আমরা অনেক ক্ষেত্রে মানি নে। কিন্তু তবু যেটুকু মানি আপনাদের মাপকাঠিতে তা প্রকাণ্ড।

তা জানি, স্বীকার করল জন মিলার: আমি কোন অভিযোগ বা নালিশ করছি নে। আমি একটা বাস্তব অবস্থা বিবৃত করছি মাত্র।

তা তোমার ব্যক্তিগত দুর্দশার কথা এক-আধটু শোনাও, জন। চাপা হাসির সঙ্গে বিবেক অনুরোধ জানাল: রবিবারের সকালে কাঁচামিঠের আস্বাদ তোফা লাগবে।

কথোপকথনের রীতি হল বর্তমান ব্যক্তিদের বাদ দিয়ে। যখন বললাম, ভারতীয় পরিবারে আমরা অগ্রাহ্য, যখন সোম-পরিবারের কথা বলি নি। তোমাদের দেশে এসে আমার কী কী নারী-ঘটিত অভিজ্ঞতা হয়েছে তার স্বীকারোক্তি না-ই বা শুনলে। সবটা সুখশ্রাব্য নাও তো হতে পারে। বিষও পান করেছি, অমৃতও একেবারে পাই নি তা নয়।

অমৃত-কাহিনীর দিকেই আমার লোভ। বিষে রুচি নেই।

আমি যে অমৃতটুকু কৃপণের মতো সঞ্চয় করে রাখতে চাই। বিষ নিতে চাও তো দিতে পারি।

ভারতীয় মেয়েদের সম্বন্ধে মোটামুটি আপনার ধারণা জানতে ইচ্ছে করি, বলল স্বরমা।

যদি অনুমতি করেন, খোলাখুলি বলব। ভারতীয় মেয়েরা আমাদের কাছে খানিকটা বিস্ময়, খানিকটা কৌতূহল। আপনাদের বেশভূষা, চালচলনে আমরা চমকিত হই, বিস্মিত হই। আপনাদের সলজ্জ নমনীয়তা আমাদের ভালো লাগে। নারীকে পুরুষ চিরদিন রহস্যময়ী ভাবতে ভালোবাসে। আপনাদের মধ্যে সে-রহস্য আছে যা আমাদের মেয়েরা স্বেচ্ছায় ত্যাগ করেছে। আপানাদের শান্ত সেবাপরায়ণতা, স্বাভাবিক আত্মত্যাগ আমাদের বিস্মিত করে। ভাবছেন, এত আমি জানলাম কী করে? চার-পাঁচ বছর এ-দেশে আছি, সমস্ত দেশটা ভ্রমণ করেছি, এত রকমের মানুষের সঙ্গে মিশেছি যা সোম কখনো করে নি, করবে না। বুদ্ধি আর চোখ দিয়ে জানতে, বুঝতে, দেখতে চেষ্টা করেছি। ভারত-

বাসী, আমাদের মতো, নিজের কথা বলতে ভালোবাসে, খুব বেশি খোঁচাতে হয় না। সুতরাং জানা অসম্ভব নয়, যদি আগ্রহ থাকে। হ্যাঁ, যা বলছিলাম। রহস্য, বিস্ময় সব আছে আপনাদের মধ্যে। কিন্তু একটা জিনিসের অভাব। তার নাম কী জানি নে, সে-অভাব আমরা বিদেশীরাই বোধ হয় অনুভব করি। আমরা মেয়েদের মধ্যে বলিষ্ঠ প্রত্যয়ে অভ্যস্ত। সেটা আপনাদের নেই। পুরুষের বড় বেশি আড়ালে আপনারা। সামান্য ব্যাপারেও পুরুষ-নির্ভর। তাতে আপনাদের স্বকীয়তা ক্ষুণ্ণ হয়। জানেন না কী চান, কতটুকু চান।

শোনো, শোনো, সুরমা। মিলার সাহেবের কথা মন দিয়ে শোনো। সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে সোম বলল।

আমার ভুল হতে পারে, বলে চলল জন মিলার। প্রত্যেক মানুষ তার অভিজ্ঞতার দাস। এদেশে নারীর নিকটসঙ্গ-লাভে আমার বার বার মনে হয়েছে এদের কামনা ভীরু, যেমন চাইতে ভীত, তেমনি দিতে। না পারে আদায় করে নিতে, না পারে দু'হাত ভরে গ্রহণ করতে। অবিশ্যি ব্যতিক্রমও আছে। কিন্তু ব্যতিক্রমে নিয়মের প্রমাণ।

ওহে মিলার, তুমি যা বললে তা যদি ভারতীয় বাস্তবে সত্য হত তাহলে আমরা হরির লুঠ দিতাম। আমাদের গৃহিণীরা দিনে মোহিনী, রাতে বাঘিনী। আবার দিনে বাঘিনী, রাতে মোহিনী।

তা হবে, বলল জন মিলার, আমি অবিশ্যি বিদেশী-মন নিয়ে বলছি। প্রথম যেদিন একটি ভারতীয় মেয়েকে গাড়িতে পাশে বসিয়ে সান্ধ্য-ভ্রমণে বেড়িয়েছিলাম, সে প্রায় সাড়ে-তিন বছর আগে, সেদিনকার কথা বলি। পাঞ্জাবী পরিবারের মেয়ে, ভয়ানক আধুনিক পরিবার। তার বড় ভাই-এর সঙ্গে আলাপ হয়েছিল, আলাপ থেকে বন্ধুত্ব। ক'দিন যাতায়াতের পর সেই অতি-সপ্রতিভ মেয়েটিকে সান্ধ্য ভ্রমণের আমন্ত্রণ জানাতেই সে রাজি হল। সেজেগুজে নেমে এল পথে, বসল গাড়িতে; দুঃসাহসে পা বাড়িয়েছে, বুক তার উঠছে, নামছে। আমরা গেলাম কুতবে। গাড়ির গতি পঞ্চাশে উঠতে কী তার উল্লাস! সে যেন বিরাট অ্যাড্‌ভেঞ্চার। আমি তাকে বেড়িয়ে নিয়ে এলাম। ভ্রমণ ছাড়া আরও কিছু সে আশা করেছিল, না পেয়ে হতাশ হল, এমন ভাব দেখাল যে আমি একটা আশ্চর্য জীব, বোধ হয় যে-ভাবটা চেপে গেল তা হচ্ছে নিজের আকর্ষণী-ক্ষমতায় সংশয়। আমি তার হাত পর্যন্ত ধরি নি, এমন সুভদ্র আমেরিকান যে সম্ভব তা বোধ হয় সে ভাবে নি। বিদায় নেবার সময় তাই

সখেদে পুনরায় আমন্ত্রণ জানাল, কণ্ঠস্বরে অভিমান গোপন করল না। পরের বার যেদিন তাকে নিয়ে বেরোলাম, সে-মেয়ের এ্যাড্‌ভেঞ্চার-লোভ পরখ করবার বাসনা হল। কাছে টানতেই অতি সহজে সে বুকে এল, কিন্তু একটু পরেই একেবারে কেঁদে ফেলল। অবাক্ হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, কী হল! কাঁদছো কেন? ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে সে বলল, বাড়ি যাব, এখুনি বাড়ি যাব! বাড়ি ফেরার পথে তাকে বললাম, প্রথম দিন তোমার সঙ্গে প্রেম না করাতে তুমি আহত হয়েছিলে। আজ প্রেম করতে যেতেই ভয় পেলে। আমরা মেয়ে দেখলেই লোভ করি নে। তোমাকে সত্যি বলছি, তোমার সান্নিধ্যের চেয়ে বেশি কিছু আমি চাই নি।

সোম বলল, তা থেকে তোমার মনে হল আমাদের মেয়েরা চাওয়ায় ভীরু, পাওয়ায় দুর্বল? বিশ্লেষণের প্রশংসা করতে পারলাম না।

মিলার বলল, তোমার বিশ্লেষণ এখুনি শুনব। তার আগে আর একটা কথা বলে নিই। তোমাদের পুরুষদের কথা।

বলুন, বলুন, উৎসাহে সায় দিল সুরমা।

বেশির ভাগ ভারতীয় পুরুষ দেখে আমরা হাই তুলি। মোষ্ট্ বোরিং।

ব্যাপারটা উভয়ত, টিপ্পনি জুড়ল সোম।

তা হোক। কিন্তু তুমি আর ক'টা আমেরিকান দেখেছো? যাদের দেখেছো তারা দেশ থেকে অনেক দূরে, শিকড়ছাড়া। আমেরিকানদের জানতে চাও তো তাদের দেশে যাও।

বল, তোমার পুরো নালিশটা শুনি।

নালিশ নয়। শুধু অভিজ্ঞতা। প্রথমত, তোমাদের জীবনতৃষ্ণা বড় সীমাবদ্ধ, সংকীর্ণ। তোমরা খেলো না, গাও না, নাচো না, ছবি আঁকো না, লড়াই শেখো না, শুধু দপ্তরের চেয়ারে বসে কলম চালাও। ত্রিশে তোমাদের ভুঁড়ি হয়, পঁয়ত্রিশে চুল পাকে। চল্লিশে তোমরা পেনসনের স্বপ্ন দেখ। তোমাদের একমাত্র প্যাসন হচ্ছে সন্তান-উৎপাদন, একমাত্র ফ্যাসন রাজনীতি। তোমরা কেবল রাজনীতির কথা বলতে ভালোবাস। তোমাদের একমাত্র ভগবান হচ্ছে গভর্নমেণ্ট, তাকে সব দুঃখ-দুর্ভোগের জন্যে দায়ী কর, আবার তারই কাছে তোমাদের সমস্ত প্রার্থনা। পশ্চিমের মানুষ সহজে রাজনীতি নিয়ে মাথা ঘামাতে চায় না, পৃথিবীর ঐ সবচেয়ে পুরোনো দ্বিতীয় পেশা যাদের হাত কলংকিত করেছে, তাদের দুর্ভাগাই মনে করে। তোমাদের শিক্ষা অজ্ঞানের

আক্রমণে পঙ্গু। য়ুনিভারসিটির সর্বোচ্চ ডিগ্রী যার আছে সেও জানে না আবহাওয়া কেমন করে বদলায়, কেমন করে মোটর গাড়ি স্টার্ট নেয়, বিজলি-বাতি ফিউজ্ হলে কেমন করে সারাতে হয়। আমরা রাজনীতি নিয়ে মাথা ঘামাই নে, জীবন আমাদের নেশাগ্রস্ত করে রাখে। আমরা তোমাদের মতো শেলি-কীট্‌স-ইলিয়ট আওড়াই নে, কিন্তু রোজ পরিশ্রম করি, আনন্দে গান ধরি, নাচি, গাড়ি নিয়ে ছুট্ দিই। আমরা নিজেরাই গাড়ি মেরামত করি, বিজলি খারাপ হলে মিস্ত্রি ডাকি নে, খাওয়ার পর রান্নাঘরে মেয়েদের সঙ্গে বাসন ধোয়ায় হাত লাগাই। তোমাদের সঙ্গে কথা বলতে গেলে কেবল রাজনীতি কপচাতে হয়, যাতে তোমরা গোটা পৃথিবীর ওপর মাস্টারি করবার সুযোগ পাও। তাই বলছিলাম, তোমাদের সঙ্গে অনেকক্ষণ থাকতে আমাদের ক্লান্তি লাগে।

তা, এই সকালটায় কতখানি রাজনীতির ময়লা তোমার হাতে লাগল? প্রশ্ন করল বিবেক সোম।

আমি তো আগেই বলেছি, কথোপকথনে বর্তমান ব্যক্তিরা পরিত্যাজ্য। সোম, তোমার বাড়ি সেই অতি-অল্প ক'টি গৃহের একটি, যেখানে আমি প্রাণ খুলে কথা বলতে পারি। আমি খুব ভালো করে জানি তুমি টেনিশ খেল, ফুলের বাগান কর, রাজনীতি ছাড়াও তোমার অন্যপ্রীতি আছে। তুমি গাও না, কিন্তু তোমার স্ত্রী ভালো গান করেন, তুমি সে-গানের তারিফ্ কর। তুমি নাচো না, কিন্তু লণ্ডনে নাচিয়ে বলে তোমার নাম ছিল। আমি এ-ও জানি, সোমপত্নী সুরমা সেইসব মেয়েদের মধ্যে নন যাঁদের কথা আমি একটু আগে রসিয়ে নিবেদন করছিলাম। আরও জানি, পাঁচ বছর তোমরা বিবাহিত জীবন ভোগ করছ, সন্তান-উৎপাদনের জন্যে অস্থির হও নি।

হাসতে হাসতে সোম বলল, বলিহারি তোমার চাটুকারিতা। আচ্ছা, তুমি তো ভারতীয় মেয়েদের একটা করুণ চিত্র আঁকলে, তোমাদের মেয়েরা ভারতীয় পুরুষদের কথা কী বলে?

তাদেরই জিজ্ঞেস করো না!

তাদের পাই কোথায়?

কেন? সেই অলিভ্ মিট্‌ফোর্ড? সে তো সোম বলতে অজ্ঞান।

কিন্তু সুরমা যে ভয়ানক সজ্ঞান!

হোঃ হোঃ হোঃ। তাই বুঝি মুশকিল!

তবে আর কী? সুরমা কম সজাগ হলে অলিভ্ অয়েলে মনের রংটা একটু চকচকে হতে পারতো।

আপনি কিছু বলছেন না যে মিসেস সোম?

আমি আবার কী বলব?

কী ভয়ংকর এই নীরব নিষেধ! জন, তুমি বিয়ে করো নি, স্বামীদুঃখ বোঝবার ক্ষমতা তোমার নেই। স্বামী মানেই স্বামিজী। সুতরাং তোমার মুখেই আমার প্রশ্নের উত্তর হোক।

দু'-একজনকে বলতে শুনেছি তোমাদের কথা। একজন বলেছিল, তোমরা ভয়ানক ভীরু, কিছুতেই এগোতে চাও না। আর একজন ঠিক উল্টো—তার নালিশ ছিল, এ-দেশের পুরুষ বড় সহজে লোভী হয়ে ওঠে। আরও একজনের কাছে শুনেছিলাম, ছেলেটা যেমন দপ্ করে জলে উঠল, তেমনি থপ্ করে নিভে গেল।

জন মিলার বিদায় নেবার পর বিবেক দাড়ি কামিয়ে স্নান করল। দু'-চারটে চিঠির জবাব দেওয়া বাকি ছিল, সে-কাজটা সমাপ্ত করল। এর মধ্যে বার-তিনেক টেলিফোন বাজল, উঠে এসে কথাবার্তা বলতে হল। শেষ চিঠিটার মাঝপথে খানিক চিন্তার দম নিতে গিয়ে লক্ষ্য করল সুরমা টেবিলের ওপর একগুচ্ছ আঙুর রেখে গেল। একটা একটা আঙুর চাখতে চাখতে বিবেকের পত্রালাপ সাঙ্গ হল।

সাড়ে দশটায় সাইকেল্ চেপে এল নিগ্রো আগন্তুক। কিনিয়ার পিটার কাবাকু।

গেটে ঢুকে সাইকেলটা সন্তর্পণে টেনে আনল, লনের ঘাস বাঁচিয়ে দাঁড় করিয়ে তালা পরাল। তারপর দরজার গায়ে বৈদ্যুতিক বেল্ টিপল।

চাকর এসে দরজা খুলল। দ্বারপ্রান্তে অজ্ঞাত অদ্ভুত চেহারা দেখে সংশয়ে ঘাবড়ে গেল। আগন্তুক জিজ্ঞেস করল, মিঃ সোম আছেন?

জী হাঁ।

কার্ড বার করে হাত দিল পিটার কাবাকু।

দু'মিনিট পরে সুরমা এসে স্বাগত করল।

নমস্কার। ভিতরে আসুন।

নমস্তে। আমার নাম পিটার কাবাকু।

আসুন। আমার স্বামী আপনার জন্যে অপেক্ষা করছেন।

পিটার কাবাকু গভীর চোখে দেখল সুরমা সোমকে। স্নানান্তে ভিজে চুল সুরমা পিঠের ওপর এলিয়ে দিয়েছিল, সারা পিঠ ঢেকে সে-চুলের প্রান্ত তার পিঠের নিচে লুটিয়ে পড়েছে। কালো, কুঞ্চিত কেশ, মৃদু-সুরভিত। চকচকে শ্যামবর্ণ ঢলঢলে মুখখানায় সিঁদুরের টিপ এনেছে অপূর্ব দীপ্তি। গভীর দুটি চোখে নম্র প্রসন্নতা। পাতলা ঠোঁট থেকে চিবুক পর্যন্ত নেমে এসেছে অব্যক্ত সুষমা। মুখে পাউডারের প্রলেপ নেই, অধরোষ্ঠে নকল লালিমা নেই। সংযত, সহজ বেশবাস। এককথায়, সুরমার দেহ ঘিরে যে প্রগাঢ় প্রশান্তি তার ছোঁয়াচ লাগল পিটার কাবাকুর চোখে।

সোম বেরিয়ে এল। উচ্ছ্বাসের সঙ্গে করমর্দন করে বলল, এসো, এসো, কাবাকু। তুমি আসায় বড় সুখী হলাম আমরা। আমার স্ত্রী। পিটার কাবাকু।

মিসেস সোমই তো আমায় স্বাগত করলেন! একগাল হেসে পিটার জবাব দিল : মিঃ সোম, আপনাকে অভিনন্দন জানাতে চাই। আপনার স্ত্রী-ভাগ্য আছে।

সুরমা অপ্রস্তুত হল। প্রথম দর্শনেই এতটা বাড়াবাড়ি!

সোম বলল, আর মিষ্টার-ফিষ্টার নয়, একেবারে সোজা সোম, বিবেক সোম। আমার স্ত্রী-ভাগ্য বেশি না সুরমার স্বামী-ভাগ্য বেশি সে-বিচার পরে হবে। এখন এসো, বসা যাক।

পিটারকে বিবেক বসাল তার পড়ার ঘরে। সদাগরি চাকুরে হলেও বিবেক সোমের পুস্তকপ্রীতি প্রাচীন ও বলিষ্ঠ। কৈশোর থেকে বই কেনার অভ্যেস, এবং বারো বছরে সংগৃহীত চার্লস্ ল্যাম্বের টেল্স্ ফ্রম শেক্সপীয়রখানাও সযত্নে রক্ষিত। পুস্তক-সংখ্যা, অতএব, কম নয়; এবং তাদের রক্ষণাবেক্ষণে সোম একবিন্দু কার্পণ্য করে না। পড়ার ঘরটা বেশ বড, চারদিকে দেয়াল বেয়ে ফরমাস-দিয়ে-তৈরি বই-এর তাক অন্তশ্ছাদ ছুঁয়েছে। নতুন-পুরোনো বই আর ন্যাপথালিনের মিশ্রিত গন্ধ সোমের এই ঘরখানার বৈশিষ্ট্য। দেওয়ালে রবীন্দ্রনাথের একখানি বৃহৎ আলোকচিত্র, কবির দৃষ্টি বহুদূরপ্রসারী, চিন্তাকুল, অথচ বলিষ্ঠ প্রত্যয়ে ব্যঞ্জনাময়। মাঝখানে মাঝারি সাইজের সেক্রেটারিয়েট টেবিল। বেতের ডালা-পরানো একটা বাতিদান; সোমের জন্যে একখানা ঘুরপাক কুরসি এবং দুখানা বেতের আরাম-কেদারা। টেবিলের ওপর নতুন

কেনা বই, একপাশে কাচ-বন্দী সুরমার একখানা ছবি, আর সুরমা-রক্ষিত গুচ্ছ গুচ্ছ গোলাপভরা একটি ফুলদান।

পিটারকে সোম আরাম-কেদারায় বসাল। সিগারেট কেস বের করে ধূম-পানে আমন্ত্রণ জানাল। নিজে গাঁট হয়ে বসল ঘুরপাক-চেয়ারে। একটা সিগারেট ধরিয়ে আলতো টান দিয়ে ধোঁয়া ছাড়ল। তারপর প্রশ্ন করল, তাহলে কাবাকু! তোমার সন্ধান কতদূর এগোল?

মন্দগতি, জবাব দিল পিটার কাবাকু।

গতি থাকলেই হল। সব যাত্রা ঘোড়ায় চড়ে হয় না। কোন কোন ক্ষেত্রে সন্তর্পণে এক-পা এক-পা এগোতে হয়।

আমার মুশকিল কী জানো, সোম? আমি এ-দেশটাকে চিনেও চিনতে পারি নে, জেনেও যেন জানতে পারি নে। একটা বিশ্বাস মনে গড়ে উঠতেই হঠাৎ ভেঙে চৌচির হয়ে যায়।

তাই নাকি গ্রীক সম্রাট আলেকজান্দার ভারতে এসে প্রধান সেনাপতিকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন, 'সেলুকস, বিচিত্র এদেশ'।

আমি আলেকজান্দার নই, সোম। আমি জয়ের লালসায় এদেশে আসি নি। আমি এসেছি শিখতে, জানতে, বুঝতে।

তুমি আলেকজান্দারের চেয়েও বড় অভিযানে এসেছো, কাবাকু! যদি সার্থক হয় তোমার অভিযান, তার গুরুত্ব ইতিহাসের ভবিষ্যৎ গতিকে বেশি প্রভাবিত করবে।

সার্থক হবার কোন সম্ভাবনা দেখি নে।

কেন?

কারণ প্রধানত দু'টো। এক, ভারতবর্ষ তার মন্ত্র হারাতে বসেছে। দুই, আফ্রিকা চলেছে ভিন্নপথে, তাকে ফিরিয়ে আনতে পারে এমন শক্তি আমার নজরে পড়ছে না।

ভারতবর্ষ কোন্ মন্ত্র হারাতে বসেছে?

গান্ধীর মন্ত্র। তোমরা টের-পাও না হয়তো, আমরা পাই। তোমরা বিরাট একটা দেশকে 'সভ্য' করে তুলেছো রাতারাতি। আধুনিক যান্ত্রিক সভ্যতার তড়িৎ আমদানি করছো। তোমাদের শাসনতন্ত্র, অর্থনীতি, রাজনীতি, সমাজ-নীতির মধ্যে আকর্ষণীয় অনেক কিছু আছে। কিন্তু গান্ধীবাদের লেশও আমার চোখে পড়ে না। যদি থাকে, দেখিয়ে দাও।

গান্ধীবাদ যে থাকতেই হবে এমন তো কোন কথা নেই।

নিশ্চয় নেই। তুমি বলবে, গান্ধীবাদ দিয়ে বর্তমান যুগের উপযোগী একটা জাতি বা দেশ গড়া যায় না। তাই যদি হয়, তাহলে গান্ধীবাদের প্রয়োজন কী? শুধু কি সে একটা নেতি-শক্তি? শুধু ইংরেজ-তাড়ানোয় তার সমাপ্তি? ভারতবর্ষকে পরাধীনতা থেকে মুক্তি দিয়ে তার কি আর কিছুই দেবার নেই?

এ-প্রশ্নের জবাব দেওয়া বড় শক্ত, পিটার। তুমি নিশ্চয় জানো, গান্ধী কোন একটা পরিণত, সুচিন্তিত গঠনপ্রণালী তৈরি করে যান নি! তাঁর ভাবধারা অনেক লেখার মধ্যে ছড়ানো। অনেক কিছুই পরস্পর-বিরোধী। তবু কতগুলো বিষয়ে তাঁর দৃষ্টি ও চিন্তা অত্যন্ত পরিষ্কার। যেমন, তিনি চেয়েছিলেন ভারতবর্ষ রাতারাতি পশ্চিমী শিল্পসভ্যতার আমদানি না করে, গঠন শুরু করুক গ্রাম থেকে এবং গ্রামীণ ও নাগরিক সভ্যতার একটা সমন্বয় করে নিক যাতে দুয়েরই কল্যাণ। কিন্তু ভারতরাষ্ট্রের কর্ণধার এখন যাঁরা, তাঁদের পথ আলাদা।

তাই তো আমি বলছি। তোমরা স্বাধীন হবার পর অনেক বড কাজ করেছো। এই যে দেশ-ভাগাভাগির ভয়ংকর ব্যাপার, আশ্চর্য শক্তিতে তোমরা এ-সমস্যার সমাধান করেছো। তোমরা বড় বড় সেচ-বিদ্যুৎ পরিকল্পনা হাতে নিয়েছো, তোমাদের দেশে বড় বড় শিল্প গড়ে উঠতে আর দেরি নেই। স্বাধীন ভারতে অনেক স্বপ্ন তোমরা দেখছো, এর অনেক কিছু বাস্তবে পরিণত হবে। কয়েক বছরের মধ্যে তোমরা হবে পৃথিবীর একমাত্র গণতন্ত্র যেখানে সরকারী পরিকল্পিত ও নির্দেশিত অর্থনীতি ব্যক্তিস্বাধীনতাকে খর্ব করবে না, যেখানে গণতন্ত্রের উচ্চশির স্তম্ভে ভর করে সমাজতন্ত্র গড়ে উঠবে। হয়তো এ-সবই হবে, হয়তো হবে না। কিন্তু এই কি ছিল গান্ধীর পথ? এ-ভারতবর্ষের সঙ্গে অন্য যে-কোন আধুনিক দেশের তফাত কোথায়? অথচ তোমাদেরই উত্তর-পূর্বে চীনে সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, নেপোলিয়ন যাকে 'নিদ্রিত সিংহ' বলেছিলেন, সে-চীন সাম্যবাদের মাদকতায় মেতে উঠেছে। তোমাদের মানসে ও বাস্তবে পরস্পর-বিরোধিতার অন্ত নেই। চীন নিষ্ঠুর নিষ্ঠায় তৈরি করছে একক-মানস একক-বাস্তব সমাজ। তোমরা তাকে তিব্বত ছেড়ে দিয়েছো। সে তোমাদের নিকটতম, বিরাটতম প্রতিবেশী। এখন তোমরা মৈত্রীতে আবদ্ধ, কিন্তু এশিয়া-আফ্রিকার সবাই জানে তোমাদের মধ্যে রয়েছে নেতৃত্বের লড়াই

এবং এ-লড়াইয়ে যে জিতবে সে নিশ্চয় হবে আগামী পৃথিবীর তৃতীয় প্রধান শক্তি ; তৃতীয় কেন, হয়তো আগামী শতাব্দীর প্রথম।

তোমার ধারণা চীন ও ভারতের মধ্যে এশিয়া-আফ্রিকার নেতৃত্ব নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা আছে ?

নিশ্চয় আছে। তোমরা বলবে, নেতৃত্ব তোমরা চাও না। স্বীকার করি। ভারতবর্ষ সচেতনভাবে কারুর ওপর হুকুমবাজি করতে চায় না। অতীতে করো নি। একালে সুযোগ পেলে তোমরা করবে কিনা কে বলতে পারে ? নেতৃত্ব এমন জিনিস যা বর্জন করা অসম্ভব। ভারতের মতো বিরাট দেশ, এত তার লোকবল, গৌরবদীপ্ত তার প্রাচীন সভ্যতা ; প্রকৃতি তাকে অকৃপণ হাতে বিকাশের পাথেয় দিয়েছে। অভিনব একটি মহাপুরুষের নেতৃত্বে নতুন :পথে পৃথিবীর লোককে চমক লাগিয়ে সে শৃঙ্খলমুক্ত হয়েছে। নির্ভীক স্বাধীনচোখে পৃথিবীকে সে দেখছে, বিচার করছে। অশিক্ষা ও দারিদ্র্য উপেক্ষা করে প্রত্যেক মানুষকে ভোটের অধিকারে রাষ্ট্রের সমান মালিক বানিয়েছে। গণ-তান্ত্রিক কাঠামোয় সমাজতন্ত্রের প্রতিমা গড়বার সংকল্প করেছে। এতগুলো অসাধারণ ভাবনা ও কর্ম নিয়ে বিনা-নেতৃত্বে তোমরা থাকবে কী করে ? তোমরা নেতৃত্ব না চাইলেও, তোমাদের চাইবে অপরে। এবং এই নিয়ে একদিন তোমাদের সঙ্গে চীনের সংঘর্ষ শুরু হবে।

একমত না হলেও তোমার কথা আমি মন দিয়ে শুনছি, সোম বলল, এ-সংঘর্ষের পরিণাম কী হবে মনে করো ?

আমাকে লজ্জা দিও না। পিটার কাবাক্ সংকুচিত হল : আমি পণ্ডিত নই, সামান্য আমার বুদ্ধি। তবে কী জানো, দুঃখ মানুষকে অনেক কিছু শেখায়। ব্যথা-বেদনা মানুষকে জ্ঞানী করে। আফ্রিকার অন্ধকারে এক শতাব্দীর বেদনা জমাট হয়ে আছে। এ শুধু পরাধীনতার দুঃখ নয়। অবমাননার দুঃখ। তোমার ভিক্তর হুগোর 'হঞ্চব্যাকের'র কথা মনে আছে ? "..more trampled on than a stone!" আমরাও তাই। প্রকৃতি আমাদের কালো করেছে, পৃথিবীতে কুৎসিত করেছে। পৃথিবীর যুক্তিহীন বিবর্তনে আমরা পেছনে পড়েছিলাম। য়ুরোপ আমাদের অধীন করেছে, এ নিয়ে নালিশ নেই। কিন্তু নালিশ শুধু এই নিয়ে যে নিগ্রোকে য়ুরোপ পৃথিবীর কাছে মানুষের চেয়ে নিচু করে রেখেছে। আমাদের সমস্ত প্রাচীন ইতিহাসকে নিশ্চিহ্ন করতে চেয়েছে। পৃথিবীর কাছে প্রচার করেছে আমরা বর্বর, হিংস্র

পশুর সঙ্গে আমাদের কোন ভেদ নেই। য়ুরোপ এশিয়ার এত বড় সর্বনাশ করতে পারে নি। আমরা আজ নতুন আলোর সন্ধান পেয়ে নিজেদের এই গভীর কলংকের বোঝা বয়ে বেড়াই। পৃথিবীর যে-কোন দেশে যাই, মানুষ আমাদের মানুষ বলে গ্রহণ করতে চায় না। তারা জানে, আমরা তাই, যা তারা বিলিতি ছবিতে দেখেছে, বিলিতি বই-এ পড়েছে। আমাদের মধ্যে বর্বরতা আছে, সিংস্রতা আছে, আদিম অসভ্যতা আছে। কিন্তু কেন? কারণ, পরিবর্তনবহুল একটা পুরো শতাব্দী আমাদের পাশ কেটে বেরিয়ে গেছে, আমাদের মনিবরা তার বার্তা আমাদের মনে পৌছতে দেয় নি।

জানি, কাবাকু, আমি তোমাদের ইতিহাস কিছু-কিছু পড়েছি।

যা পড়েছো, সোম, তা আমাদের ইতিহাস নয়। তা হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদের ইতিহাস। পড়েছো সিসিল রোড্‌স্‌-এর কাহিনী, আর তারই পদাঙ্ক অনুসরণ করে আরও দশ-বিশ-পঞ্চাশটা সাহেবের লেখা বই। আফ্রিকার ইতিহাস তাতে নেই! পৃথিবীর ক'টা লোক খবর রাখে যে এই পঁচিশ বছর আগেও আফ্রিকায় একাধিক বিখ্যাত রাজ্যের প্রতিষ্ঠা ছিল? যে তুলনাহীন শঠতা ও বিশ্বাস-ঘাতকতা দিয়ে সিসিল রোড্‌স্‌ পুরো মধ্য-আফ্রিকাটা ইংরেজের গোলাম করে নিল, তার কাহিনী এখনো লেখা হয় নি। যে সরল বিশ্বাস, উদার আতিথেয়তা আর জাতির কল্যাণবোধ বর্বর নিগ্রো-যূথপতিদের সর্বনাশের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল তার ইতিহাস কোথায়? সে-ইতিহাস লেখা হবে আফ্রিকা স্বাধীন হবার পর, লিখব আমরা।

পিটার কাবাকুর গলা চড়েছে, আক্রোশে গলার শিরাগুলি দানা বেঁধে উঠেছে। ইংরেজিতে দখল তার সোমের চেয়ে অনেক কম, মাঝে মাঝে শব্দ হাতড়াতে হয়, আর সেই শব্দশূন্যতায় ক্ষোভ যেন আরও বাড়ে।

বিবেক তাকে উত্তেজিত দেখে নিজেও উত্তেজিত হল। আক্রোশে নয়। হচ্ছে আঁচের উত্তাপ! সামনে আগুন জ্বললে তা গায়ে লাগে। সামনে-বসা নিগ্রোর মনে আগুন জ্বলছে। তার তাপ লাগল ভারতের বিবেক সোমের মনে।

কাবাকু, সোম বলল, ইংরেজের কথা ভাবতে তোমার খুব রাগ হয়?

রাগ? কী জানি? আমি কি খুব রেগে গিয়েছি? লজ্জা পেল পিটার। মাপ কর সোম। আমরা এখনো ভদ্র হই নি। তাই মনের ভাব গোপন করতে শিখি নি। হয়তো উষ্মা একটু বেশি বেরিয়ে এসেছে। তুমি জিজ্ঞেস

করছিলে, ইংরেজদের কথা ভাবলে আমার রাগ হয় কিনা। হয়। কিন্তু শুধু রাগই হয় না। বিস্ময় হয়। অদ্ভুত, আশ্চর্য এই ইংরেজ জাত! যেমন মহান তেমনি নীচ। যেমন উত্তম, তেমনি অধম! অমন ভালোও নেই; এত মন্দও চোখে পড়ে না। যে-জাতের শেক্সপীয়র আছে, শেলি-বায়রন-বার্নস্ আছে তার ওপর তুমি রাগ করবে কী করে? ইংরেজ অর্ধেক পৃথিবীকে শৃঙ্খল পরিয়েছে, আর অর্ধেক পৃথিবীর বিপ্লবী, বিদ্রোহীদের আশ্রয় দিয়েছে। ইংরেজ রাজার মাথা কেটেছে, অথচ রাজতন্ত্র প্রাণপণ আগলে রয়েছে। আমরা ইংরেজের খারাপ দিকটাই বেশি দেখেছি, দেখছি। কিন্তু তার মহৎ দিকটাও দেখতে হবে আমাদের।

তোমার কথা শুনে সুখী হলাম কাবাকু। টাগোরও তাই বলতেন। ইংরেজ, বা যে-কোন দেশ বা জাতি, যে পুরোপুরি হীন, তাকে শুধু বিদ্বেষ করতে হবে, এটা তাঁর সহ্য হতো না। গান্ধী যখন ১৯২১ সালে প্রথম অসহযোগ আন্দোলন করলেন, স্বল্প দিনে তা দেশব্যাপী ইংরেজ-বিদ্বেষে পরিণত হল। টাগোর, যিনি দু'বছর আগে ইংরেজের অত্যাচারের প্রতিবাদে নাইটহুড ত্যাগ করেছিলেন (পৃথিবীতে তাঁর আগে আর কেউ এ কাজ করেন নি), এই জাতি-বিদ্বেষের বিরুদ্ধে সরব হয়েছিলেন। এ নিয়ে টাগোর ও গান্ধীর মধ্যে যে বাদানুবাদ হয়েছিল ভারতবর্ষের স্বাধীনতা-ইতিহাসে তার স্থান বিশিষ্ট। এ-ঘটনার অনেক পর, বাংলাদেশের সবচেয়ে নামকরা ঔপন্যাসিক একখানা উপন্যাসে গোটা ইংরেজের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ ঘোষণা করেছিলেন, সে বইখানাও টাগোর প্রশংসা করতে পারেন নি।

পিটার বলল, প্রতিপক্ষ সম্পর্কে গান্ধী যে মনোভাবের পরিচয় দিয়ে গেছেন, তার অবশ্যি তুলনা নেই। এ আমি কল্পনায়ও আনতে পারি নে। যার সঙ্গে লড়ছি, তাকে বিন্দুমাত্র দ্বেষ বা হিংসে করছি নে, বরং পরিপূর্ণ শ্রদ্ধা করছি, লড়ছি আমার মঙ্গলের জন্যেই শুধু নয়, তার কল্যাণের জন্যেও, মানুষের চিন্তাধারায় এ অবদান অভিনব, বিস্ময়কর। এর তুলনা নেই।

তুলনা আছে, কাবাকু। ভারতীয় শাস্ত্রে এ চিন্তাধারা প্রাচীন। মহাভারত মহাকাব্যের কথা শুনেছো? দুই প্রতিপক্ষ লড়াই-এর জন্যে তৈরি হয়ে কুরুক্ষেত্রে সমবেত হয়েছে। ভ্রাতৃযুদ্ধ: একদিকে পাঁচ পাণ্ডব ভাই, অন্য-দিকে একশ কৌরব ভাই। সমস্ত ভারতবর্ষ দুভাগে ভাগ হয়ে লড়ছে। এসে

যোগ দিয়েছে চীন, আরব, নিগ্রো, ম্লেচ্ছ, যবন সৈন্য—বেশির ভাগই কৌরবদের দলে। যুদ্ধ শুরু হবে। শ্রীকৃষ্ণ, মানুষের বেশে স্বয়ং ভগবান, নিজে সারথি হয়ে অর্জুনের রথ চালাচ্ছেন, অর্জুন তৃতীয় পাণ্ডব, মহাভারতের শ্রেষ্ঠতম যোদ্ধা। দুই প্রতিপক্ষের মাঝখানে দাঁড়িয়ে অর্জুন চারদিকে তাকিয়ে দেখতে পেলেন সবাই তো আত্মজন, কেউ তো শত্রু নয়। অস্ত্র ফেলে দিয়ে বেঁকে বসলেন, আমি লড়বো না। শুধু রাজ্যের লোভে এত আত্মজন-বিনাশ আমার পক্ষে অসম্ভব। তখন শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে যে উপদেশ দেন, তাই হচ্ছে ভগবদ্-গীতা, হিন্দুদর্শনের সারাংশ। শ্রীকৃষ্ণের প্রধান বক্তব্য হচ্ছে, কোন কিছুই চিরস্থায়ী নয়, কেবল আত্মা ছাড়া। আত্মা অবিনশ্বর, তার মৃত্যু নেই। সব-কিছুর মধ্যে ভগবান। সব পথ ভগবানে বিলীন। যাদের শত্রু ভাবছো তারাও আমি, তোমার মিত্ররাও আমি। মানুষ নিষ্কাম হয়ে নিজের কর্তব্য করে যাবে। ফলের লোভ করবে না। যা তোমার কর্তব্য তা কর নিষ্ঠার সঙ্গে, ভক্তির সঙ্গে, প্রেমের সঙ্গে। ফল তুমি পাবেই। তুমি যে বিনাশ করছো তাতে হিংসে নেই। আছে বিশুদ্ধচিত্ত কর্তব্যপালন। তোমার প্রতিপক্ষও তার নিজের কর্তব্য করছে। উচ্চতর কর্তব্যের জয় হবে; এই হল প্রকৃতির নিয়ম। এই হল ধর্ম। তাহলেই দেখছ, গান্ধীয় অহিংসা কোন মৌলিক আবিষ্কার নয়। যেটা তাঁর একান্ত নিজের তা হচ্ছে এ-অহিংসাকে একটা জাতির স্বাধীনতা-সংগ্রামের অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার। এত ব্যাপকভাবে এ পরীক্ষা তাঁর আগে কেউ করে নি।

জানো, সোম, আমি তোমাদের ভগবদ্-গীতা অনেকবার পড়েছি। অবশ্যি ইংরেজিতে।

ভারত-মানসকে জানতে হলে উপনিষদ, গীতা, রামায়ণ ও মহাভারত না পড়লে চলবে না।

আর কী পড়তে হবে?

আর যাই পড়ো-না-পড়ো, এগুলি পড়তেই হবে। এবং বুঝতে হবে।

রামায়ণ-মহাভারতের ইংরেজি আছে?

পুরো অনুবাদ বোধ করি নেই। সারাংশ আছে।

অনুবাদ নেই কেন?

করা হয় নি বলে। সমুদ্রের কি অনুবাদ হয়?

ইলিয়ডের হয়েছে।

মহাভারত আর ইলিয়ডের তুলনা হয় না। ইলিয়ড ভাগীরথী। মহাভারত অকূল সাগর।

পিটার কী যেন বলতে গিয়ে থেমে গেল।

সোম বলল, কাবাকু, ভেব না আমি বাড়িয়ে বলছি। হোমর মহাকবি। দান্তেও তাই। কিন্তু বাল্মীকি আর ব্যাসদেব মহাকবিই নন, মহর্ষি। ভারতবর্ষ বলে যা দেখেছো, হাজার হাজার বছর দু'খানি মহাকাব্য তাকে বাঁচিয়ে রেখেছে। রসদ পেয়েছে এ-দু'খানা মহাকাব্য থেকে। ভারতবর্ষের মানুষের জীবনে এমন কোন সংঘাত, আদর্শ, স্খলন, মাহাত্ম্য, ভাবনা নেই যা এ-দুই মহাকাব্যে প্রতিফলিত হয় নি। এ-দেশের লক্ষ লক্ষ গ্রামে যারা রামায়ণ আর মহাভারত থেকে জীবনতৃষ্ণা মেটায় তারা অশিক্ষিত, কিন্তু অসভ্য নয়; তারাই সত্যিকারের ভারতবর্ষ, আমরা কয়েক লক্ষ নগরবাসী যা নই। তুমি ভারতবর্ষের কোন ভাবধারার পুরো নাগাল পাবে না যদি না এই অসীম রসসমুদ্রে প্রবেশ করতে পার; এদিক থেকে দেখলেই রামায়ণ-মহাভারত ও ইলিয়ড-অডিসীর তফাত করতে পারবে।

কিন্তু পথ কই?

পথ খুলবে। যদি তোমার ভারত-দর্শনের বাসনা আন্তরিক হয় তাহলে পথ পাবেই।

ভাষা যে অন্তরায়।

ভাব সে অন্তরায় ভাঙবে।

অপেক্ষা করব। কিন্তু আজ তোমার এখানে এসেছিলাম কেন মনে আছে?

টাগোরের কবিতা শুনবে বলে।

কথায়-কথায় বেলা বেড়ে গেল।

তাহলে এসো, এবার শুরু করি।

করো।

দুপুর অতিক্রম হল, অপরাহ্ণের ম্লান রৌদ্র বাগানের সবুজ ঘাসের গায়ে এলিয়ে পড়েছে। সুরমা তিন-চারবার দেখে গেছে, কিন্তু বাধা দেয় নি। বিবেক একটার পর একটা কবিতা পড়ছে, তর্জমা করছে, পিটার কাবাকু তন্ময় হয়ে শুনছে। মাঝে মাঝে অনুরোধ করছে, জায়গাটা আবার বল। বিবেক আবার বলছে। রেডিয়োগ্রামে বিবেক কবির নিজকণ্ঠে ইংরেজি

কবিতা আবৃত্তির রেকর্ড সাজিয়ে রেখেছিল, তিনবার পিটারকে তা বাজিয়ে শোনাতে হয়েছে। আফ্রিকার পিটার কাবাকু এক অভিনব অনুভূতিতে মগ্ন হয়ে আছে। ভারতের বিবেক সোম ভাবছে আমি কি নতুন যুগের পুরোহিত হলাম?

শেষ হল 'আফ্রিকা' দিয়ে।

এবার শুনবে তোমার জন্যে লেখা রবীন্দ্রনাথের কবিতা!

আমার জন্যে? পিটারের সারা শরীরে শিহরণ।

সমস্ত আফ্রিকার জন্যে। পৃথিবীর কোন কবি যখন আফ্রিকার কথা ভাবেন নি, তখন, সেই ১৯৩৯ সালে, টাগোর তোমাদের ভবিষ্যৎ সমস্যা উপলব্ধি করেছিলেন। তোমরা যে ভয়ংকর অত্যাচার সয়েছো তার প্রতিদানে য়ুরোপকে একদিন কী দেবে! হিংসার বদলে হিংসা! সংহারের পরিবর্তে সংহার? ঘৃণার দেনা শোধ করবে ঘৃণার সুদে ও আসলে? এই প্রশ্ন তিনি করেছিলেন তোমাদের কথা ভেবে আর তার সঙ্গে জানিয়েছিলেন নিজের মিনতি, মানবতার অনুরোধ। তিনি তোমাদের 'অন্ধকার আফ্রিকা' বলেন নি। বলেছেন 'ছায়াবৃতা আফ্রিকা'। কী সুন্দর কথাটা কাবাকু! ছায়াবৃতা। অরণ্যের ছায়া তোমাদের ঘিরে রেখেছে। এক উদ্‌ভ্রান্ত আদিম যুগে রুদ্র সমুদ্রের বাহু তোমাদের ছিনিয়ে নিয়ে গিয়েছিল প্রাচী ধরিত্রীর বুক থেকে—নইলে তোমরা এশিয়ারই অঙ্গ হয়ে থাকতে। শুধু ছিনিয়েই নিয়ে যায় নি; বিধাতা বনস্পতির নিবিড় পাহারায় রেখে দিলেন আফ্রিকাকে তাঁর কৃপণ অন্তঃপুরে। সেখানে চলল তার সঙ্গে প্রকৃতির দ্বন্দ্ব-মৈত্রী। নিভৃত আফ্রিকা সংগ্রহ করল দুর্গমের রহস্য, চিনে নিল জল-স্থল আকাশের নিভৃত সংকেত; প্রকৃতির দৃষ্টি-অতীত যাদুমন্ত্র জাগাল তার চেতনাতীত মনে। ভীষণকে বিদ্রূপ করল বিরূপ আফ্রিকা, আপনাকে উগ্র ক'রে শঙ্কাকে চাইল হার মানাতে।

শোনো, কাবাকু শোনো, ভারতের মহাকবি আফ্রিকাকে কুরূপ বলেন নি, কুৎসিত বলেন নি। শুধু দেখেছেন সেই অরণ্য-আদিম আফ্রিকাকে, প্রকৃতির ভীষণতার কাছে যে হার মানে নি, এমন দুর্ধর্ব তার প্রাণশক্তি। নাগরিক সভ্যতার বাইরে সে রয়ে গেল, আদিম প্রকৃতির নিরাবরণ কোলে। যে ছায়াবৃতা আফ্রিকার কালো ঘোমটার নিচে লক্ষ লক্ষ মানুষ লুকিয়েছিল—সে-আফ্রিকারও যে একটা মানবরূপ ছিল, তা পৃথিবীর চোখে পড়ল না, উপেক্ষার আবিল দৃষ্টিতে তা অপরিচিত রয়ে গেল।

এমন সময়, কাবাকু, এমন সময়

এল ওরা লোহার হাতকড়ি নিয়ে
নখ যাদের তীক্ষ্ণ তোমার নেকড়ের চেয়ে
এল মানুষ-ধরার দল
গর্বে যারা অন্ধ তোমার সূর্যহারা অরণ্যের চেয়ে।
সভ্যের বর্বর লোভ
নগ্ন করল আপন নির্লজ্জ অমানুষতা।
তোমার ভাষাহীন ক্রন্দনে বাষ্পাকুল অরণ্যপথে
পঙ্কিল হল ধূলি তোমার রক্তে অশ্রুতে মিশে ;
দস্যু-পথের কাঁটা-মারা জুতোর তলায়
বীভৎস কাদার পিণ্ড
চিরচিহ্ন দিয়ে গেল তোমার অপমানিত ইতিহাসে।

এই তো হল তোমাদের অবস্থা ; আর সেই সভ্য-বর্বর য়ুরোপের? তোমাদের সম্পদ লুঠ হয়ে সাজল য়ুরোপের অট্টালিকা, মন্দির, বিপণি। সেখানে সভ্যতার বিকাশ চলল অপ্রতিহত। রসদ যোগাতে লাগল দলিত আফ্রিকার মানুষ ; আলোয়-ফুলে-অলংকারে ঘর সাজাল পশ্চিমী সভ্যতা

কিন্তু, কাবাকু, সে-সভ্যতার আলোর ঝলক একদিন দপ্ করে নিভে গেল। বাধল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। ১৯৩৯ সাল, যে-সালে এই কবিতার জন্ম। সেই দুর্দিনে আফ্রিকার কথা ভারতের কবির মনে পড়েছে। যখন পশ্চিম দিগন্ত ঝঞ্ঝা-বাতাসে রুদ্ধশ্বাস, যখন গুপ্ত গহ্বর থেকে বেরিয়ে এসেছে হিংস্র পশুর দল, অশুভ ধ্বনিতে প্রদোষেই ঘোষণা করল দিনের অন্তিমকাল, তখন কবির মনে পড়ল তোমাদের কথা। তিনি বুঝলেন, একদিন 'সভ্য' মানুষের সঙ্গে 'অসভ্য' আফ্রিকার একটা নির্দয় বোঝাপড়া হবে ; ইতিহাস এই স্তূপীকৃত অন্যায়ের নিষ্ঠুর প্রতিশোধ নেবে। বহুদিনের লাঞ্ছিত, গঞ্জিত, অবহেলিত, উপেক্ষিত, অবমানিত আফ্রিকা একদিন জীবনের আলোয় জাগবে, আর জেগে উঠে হিসেব চাইবে, কঠিন, কঠোর হিসেব। পৃথিবীর যে সভ্যতা-গর্বিত মানুষ তাকে মানুষের দেশ বলে মানে নি, তাকে ডেকে বলবে, এসো, এবার চরম হিসেব হোক। সেই ভীষণ দিনের নিশ্চিত সম্ভাবনা ভারতের মহাকবিকে বিচলিত করেছিল, কাবাকু। তাই তিনি সব মানুষের হয়ে আফ্রিকার কাছে পৃথিবীর এক চরম দুর্দিনে ক্ষমা চেয়ে গেছেন। বলেছেন, আমি তো সেদিন

থাকব না, যেদিন ছায়াবৃতা আফ্রিকা খুলে ফেলবে তার কালো ঘোমটা, কিন্তু নতুন দিনের কবি, তুমি থাকবে, আমার উত্তরসূরী। তুমি সেদিন আমার হয়ে আমাদের সবাকার হয়ে, আফ্রিকাকে পুণ্যশ্লোক সম্ভাষণ ক'রো।

এসো যুগান্তরের কবি,
আসন্ন সন্ধ্যায় শেষ রশ্মিপাতে
দাঁড়াও ঐ মানহারা মানবের তরে,
বলো, "ক্ষমা করো"—
হিংস্র প্রলাপের মধ্যে
সেই হোক তোমার সভ্যতার শেষ পুণ্যবাণী।

কাবাকু, ভারতবর্ষের এই মিনতি। আফ্রিকা, তুমি সভ্য হবে, জাগ্রত হবে। তখন কি তুমি হিংস্রতার শোধ দেবে প্রবলতর হিংসায়, না সুমহান ক্ষমায়? ভারতের কবি মিনতি জানিয়ে গেছেন, তুমি মার্জনা কর। বিশ্বজোড়া হিংস্র প্রলাপের মধ্যে মরণমুখী সভ্যতা তার শেষ পুণ্যবাণী নিয়ে আসুক, বলুক: "ক্ষমা কর"। তুমি সে-বাণী উপেক্ষা ক'রো না।

বিবেক থামল। নিস্তব্ধ ঘরের মধ্যে নেমে এল নিস্তরঙ্গ মৌন গাম্ভীর্য।

বিবেক তাকাল পিটার কাবাকুর দিকে।

চোখের জলে তার দু'গাল ভেসে গেছে।

ছয়

জটপাকানো জীবন, সন্ন্যাসীর চুলের মতো। কীভাবে, কেমন করে জট বেধে যায় তা দুর্বোধ্য। সেই বিদেশী রূপকথার ডাইনী বুড়ী এসে জট পাকায়, তার মন্ত্রে মুক্তির রাস্তা বন্ধ। বন্ধ বলেই তো বেঁচে এত সুখ, অশান্তি! যদি জট না থাকত, জীবনে হত না জটলা, বাঁচার আনন্দ যেত ফুরিয়ে। নিজেকে নিজের হাতে প্রতি মুহূর্তে শেকল পরাবার উন্মাদনা থাকত কোথায়?

সুলোচনা মাঝে মাঝে এভাবে চিন্তা করেন। কী ছিলাম কী হয়েছি। কুমারী-জীবনের বন্ধনহীন গ্রন্থি, এখন উত্তীর্ণযৌবনে জটাজালে সহস্রবন্ধন। একটা মানুষের আঙিনায় কী ভিড়! কত মানুষের, অনুভূতির, ঘটনার! তার

কতটুকু মন ধরে রাখে, কতটুকু রেখে যায় পদচিহ্ন? কিন্তু মরুপথে তো তারা হারিয়ে যায় না! তারা জীবনকে বদলে দেয়, গতিকে করে পরিবর্তিত। ভাবনা বদলে দেয়, চেতনাকে জাগায়, ঘুম পাড়ায়। কখনো কখনো রজনীর নির্জনতায় মনের দূরপ্রান্তে ছায়া হয়ে এসে দাঁড়ায়; আবার কখনো জুলুম করে। ভীরু কামনা, চকিত চাওয়া, অসতর্ক লোভ এবং তস্কর লালসা শুরু করে দৌরাত্ম্য। ভদ্রতা, সভ্যতা, স্বাভাবিক ব্যবহার প্রকাশ্যে যাদের দমিয়ে রেখেছে, দৈত্যের মতো তারা নৈঃসঙ্গে হানা দেয়। যার সঙ্গে হেসে কথা বলেছি, ন্যাকামির করেছি চূড়ান্ত, তাকে নখদন্তে ছিঁড়ে ফেলতে ইচ্ছে করে। যার দিকে ঔদাসীন্য ছুঁড়েছি, তার মুখখানা হঠাৎ মনের আয়নায় চোখের সামনে ভেসে ওঠে। যে স্রোতধারাকে নিবৃত্তির বাঁধ দিয়ে থামিয়ে দিয়েছি, মনের অরণ্যে তার ভীষণ ঝাপ্টা ভয়ংকর শিহরণ আনে।

ক্ষুধা নিয়ে জীবন। এ-ক্ষুধা দেহের, মনের, আত্মার। পরিমিত আহারে সুসংযত জীবন সুলোচনার কুমারী-কালের আদর্শ। বাবাকে দেখেছেন আত্মার ক্ষুধায় জ্বলতে। জ্ঞান ছিল তাঁর সাধনা। যাঁর সঙ্গে বিয়ে হল তাঁর ক্ষুধা বলিষ্ঠ। দেহ মজবুত, মন শক্ত, বুদ্ধি ব্যাপক না হলেও সজোর। জীবনকে তিনি ভোগ করতে চান ব্যবহারিক সার্থকতার মধ্যে। লোভী নন, কিন্তু কামনা তাঁর ভীরু নয়। অতিভোজী নন, কিন্তু আস্বাদবিলাসী। সুলোচনার জীবনতৃষ্ণা সুনিয়মিত, নিয়ন্ত্রিত। পেলেই নিতে হবে, এ-আদর্শ তাঁর নয়। পেয়েছি কিন্তু নিই নি, এর উন্মাদনা দীর্ঘস্থায়ী। তাই আরনেস্ট লংফেলো নেওয়ার বন্যায় নিশ্চিহ্ন হয় নি। পেয়েও-না-নেওয়ার সূক্ষ্ম সম্ভোগ-বিলাসে সে বেঁচে আছে। কামনা ভীরু ছিল বলেই রজনীর একান্তে তার স্মৃতি জীবিত। সেখানে চুরি করে পাওয়ার লজ্জা নেই, আছে পেয়ে-না-নেওয়ার গৌরব।

শুকদেব তা বোঝেন না। বোঝবার কথাও নয়। তিনি কাজের মানুষ, কর্মবীর। জীবনটা পাহাড়, শিখরে পৌঁছন শুকদেবের লক্ষ্য। ধাপে-ধাপে বিজয়চিহ্ন তিনি রেখে যেতে চান। এই গিরিবিজয়ে তাঁর রোমহর্ষক আনন্দ। পথে লোভনীয় খাদ্য জুটলে, ক্ষুধার্ত তিনি, বর্জন করেন না। বহু বিচিত্র আস্বাদে তাঁর জীবনসম্ভার পূর্ণ করতে চান। তাই বলে সব-কিছুতে রুচি নেই তাঁর। চাওয়ায় আভিজাত্য আছে। স্বামীকে বোঝেন বলেই সুলোচনা এসব নিয়ে তাঁর সঙ্গে বিবাদ করেন না।

কিন্তু, তথাপি, সিন্থিয়া ওয়ার্ডকে সুলোচনা কিছুতেই গ্রহণ করতে পারেন না। মনের গহনে সে একটা আগুন জ্বেলে রেখে গেছে। তা আর নিভল না। সে-আগুনে সুলোচনা একাই জ্বলেন। এ-জ্বালার সহভোগী নেই, এ-ব্যথার নেই সমব্যথী। শুকদেবকে বেশি-কিছু তিনি বলেন নি। শুধু লক্ষ্য করেছেন, সিন্থিয়া ওয়ার্ড তাঁর স্বামীর কাছে একটা জ্বালাময়ী অনুভূতি। দীর্ঘকাল শুকদেবকে সুলোচনা দীপান্বিত করেছেন। কিন্তু জ্বালাতে পারেন নি। আমি এসেছি মঙ্গলের প্রদীপ নিয়ে; তোমার জীবনকে আলোকিত করতে। সুলোচনা নিজেকে আশ্বাস দিয়েছেন। সেই যে বিবাহিত জীবনের প্রথম প্রহর, যখন তুমি আমাকে নিয়ে পাগল হয়ে যেতে, তখনো আমি চেয়েছি তোমাকে উদ্ভাসিত করতে, তোমার মধ্যে আমার একাগ্র ভালবাসার আলোক-পাত করেতে। আমি তো বনবহ্নি নই; মহীরূহকে দগ্ধ করাই আমার লালসা নয়। আমি প্রদীপ, সংকোচে নম্র, দানে ব্যাকুল।

তবু যেন কোথায় একটা ফাঁক থেকে যায়। সে কি আমাদের প্রাথমিক আদিমতা? পুরুষকে পুড়িয়ে যে-আনন্দ, যার স্বাদ সুলোচনা পেলেন না জীবনে, তার মূল কি রয়েছে আদিম মানুষের চির-অতৃপ্ত কামনায়? সুলোচনা স্বামীর দিকে তাকান, আর ভাবেন। একটা পুরুষ যেন অনন্ত রহস্য! অথচ নিজের এই রহস্য-ঐশ্বর্যের কতটুকু বা সে জানে? শুধু ধরা পড়ে নারীর সান্নিধ্যে। মেয়েরাই পারে পুরুষকে আবিষ্কার করতে, যে-আবিষ্কারের আর শেষ নেই। সুলোচনা ভেবেছিলেন, শুকদেব-আবিষ্কার তিনি সমাপ্ত করেছেন। সিন্থিয়া ওয়ার্ড এসে দেখিয়ে গেছে, শুকদেবের আগুন এখনো নেভে নি, নির্বাপিত হয়েছেন সুলোচনা নিজে। আগুন নিয়ে খেলা সুলোচনা কখনো করতে চান নি। হিন্দু মেয়ে, জীবনের আদর্শ তাঁর দীপশিখা, বহ্নিবন্যা নয়। কিন্তু চপলা নদী যেমন উন্মত্ত সমুদ্রকে ঈর্ষা করে তেমনি সুলোচনার অনির্বাণ দীপশিখা সিন্থিয়া ওয়ার্ডের লেলিহান অগ্নিস্রোতকে ঈর্ষা করছে। সে-আগুনে শুকদেব পুড়েছেন; তাতে একটা সমাপ্তি আছে। সুলোচনা পোড়েন নি, শুধু দহন তাঁর অন্তরে লেগেছে। সে-দহনের সমাপ্তি নেই।

মাত্র সাতদিন অতিথি হয়ে এ-গৃহেই অবস্থান করেছিল সিন্থিয়া ওয়ার্ড। জন্মে ইংরেজ, জীবনে ফরাসি। দৈর্ঘ্যে সুলোচনার চেয়ে একমাথা উঁচু, বর্ণে ফরাসি লালিত্য, চোখে সমুদ্রের নীল। হালকা মেদহীন দেহ, নিখুঁত রূপ-চর্যায় সুরক্ষিত। চুলগুলি প্রায় পুরুষের মতো ছাঁটা। বয়স কত কে জানে,

নিজে বলে, চল্লিশ। সরু টিকোল নাকের নিচে লাল পাতলা অধরোষ্ঠ; ঝকঝকে দাঁত মুখখানাকে আরও সুন্দর করেছে। চোয়ালের হাড় চওড়া, কিন্তু চিবুক সুগঠিত। সিন্থিয়া ওয়ার্ড ফরাসি দেশের নামকরা কাগজের নাম-জানা সংবাদদাতা। তাছাড়া, তিনখানা উপন্যাস লিখেছে ইংরেজীতে, চারখানা ফরাসিতে। পৃথিবীর বেশির ভাগ দেশ তার দেখা ও চেনা। ভারতবর্ষে এসেছিল পত্রিকার কাজে। তদুপরি, ভারতবর্ষকে দেখতে।

শুকদেব তাঁকে সপ্তাহের অতিথি করে নিয়ে এসেছিলেন স্বগৃহে।

প্রথম দিনেই সুলোচনা বুঝলেন, তাঁর সামনে কঠিন পরীক্ষা। সিন্থিয়া ওয়ার্ড সংবাদপত্রচারিণীই শুধু নয়, রূপসী রমণী। রূপকে সুলোচনা ভয় পেতেন না। ভয় পেলেন এক নতুন নারীদর্শনে। বিদ্যায়, বুদ্ধিতে, চালচলনে, আত্মপ্রত্যয়ে, দৃষ্টির অভিনবত্বে এবং মনের ব্যাপকতায় এ এক নতুন রমণী। পৃথিবীর কত বড় বড় মানুষের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ পরিচয়। পৃথিবীর জটিল গতির সঙ্গে প্রতিদিন সে পা ফেলে চলে আসছে। এমন কোন সমস্যা নেই যা সে শুকদেবের সমকক্ষ হয়ে আলোচনা না করতে পারে; অনেক সমস্যায় শুকদেব অজ্ঞ, সে বিজ্ঞ। প্রথম দিনেই সে চারজন মন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছে; প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাতকারের নির্দিষ্ট সময় আদায় করেছে। প্রত্যেক জাগতিক সমস্যা সম্পর্কে তার মতামত সুচিন্তিত, সুগঠিত, সমাপ্ত। শুকদেবের সঙ্গে ঘণ্টার পর ঘণ্টা সে এমন-সব বিষয় আলোচনা করে যাচ্ছে যা সুলোচনার গোচরের বাইরে, যেখানে নিজগৃহে তিনিই আগন্তুক। শুকদেবের জীবনের যে বিরাট কর্মব্যাকুল, চিন্তাসংকুল প্রান্তরে সুলোচনার স্থান নেই, সিন্থিয়া ওয়ার্ড সেখানে অনায়াসে আসন করে নিল। শুকদেব তার সঙ্গে আলোচনা করছেন জটিল শাসন-সমস্যা; তার মতামত সাগ্রহে শুনছেন, প্রশ্ন করে জেনে নিচ্ছেন অজ্ঞাত তথ্য।

সুলোচনা এতেও বিশেষ ভাবিত হতেন না, যদি দেখতেন সিন্থিয়া ওয়ার্ড শুধু সংবাদ-শিকারী। প্রথম দিনেই সুলোচনা বুঝলেন, সিন্থিয়া ওয়ার্ড জীবন সম্বন্ধে পুরোপুরি সচেতন। জীবন-সন্ধানী না হলে সাহিত্যরচনা করবে কী করে? একদিকে সে যেমন দেহসৌষ্ঠব-প্রচারে প্রগল্‌ভ, অন্যদিকে পুরুষ-চিত্তজয়ে তার আগ্রহ প্রচ্ছন্ন। বিদ্যা ও বুদ্ধি তার নারীত্বকে খর্ব করে নি, ধারাল করেছে। সিন্থিয়া তার জীবনতৃষ্ণা গোপন করতে চায় নি, চাইলেও সুলোচনার কাছে সে ধরা পড়ত। সিন্থিয়ার কামনা ভীরু নয়; সহজ; সে

প্রলুব্ধ নয়, সুস্থ আহারে তার সুরুচি। কম বয়সে একজনকে বিয়ে করেছিল, সে-বন্ধন বেশিদিন টেকে নি। তারপর অনেক পরিশ্রমে জীবনের পথে এগিয়েছে, অনেক বাধা জয় করে সার্থকতা পেয়েছে। বিয়ে আর করে নি।

সুলোচনা বিস্মিত, কতকটা আহত হয়েছেন সিন্থিয়ার বাক্‌স্বচ্ছতায়। জীবনের কোন কথাই কি এদের কাছে গোপনীয় নয়? সব-কিছুই টেনে আনা যায় জনতায়, সবার সামনে, নিঃসঙ্কোচে? বুকের কথা মুখে আনতে কান লাল হয় না, ঠোঁট কাঁপে না, আসে না জল? কোনদিন বুক ফাটে নি বলেই কি এত সহজে মুখে কথা ফুটে ওঠে? সিন্থিয়া বে-সরম নয়: অথচ সে সহজ, স্বচ্ছ। জীবন তার কাছে গভীর রহস্য নয়। তা হল অনন্ত বিজয়ের আহ্বান। তাই নিজের কথা খুলে বলতে তার লজ্জা নেই, সংকোচ নেই।

সুলোচনার সঙ্গে তাব ব্যবহার সুভদ্র, সুমধুর। তিনি গৃহস্বামিনী, সে অতিথি। সুলোচনার সুরুচি, লাবণ্য, দেহশ্রী, তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও সুনিপুণ সংসারনিষ্ঠার সুখ্যাতিতে সে মুখর। সামান্য অবসরে সে সুলোচনাকে নানা প্রশ্ন ক'রে ভারতীয় সমাজের অনেক-কিছু জেনে নিয়েছে। সিন্থিয়ার প্রশ্ন শুনে সুলোচনা ভেবেছেন, এর বুদ্ধি এত প্রখর, দৃষ্টি এত তীব্র! আর সিন্থিয়া ভেবেছে, আশ্চয এই মেয়ে, জমাট রহস্যের মতো। নিজেকে জানাতে চায় না, আমাকে জানতে চায় না। এ আমাকে ভয় করে, অথচ অতিথির সম্মান দিতে এতটুকু অবহেলা করে না। এর শাড়ির ভাঁজে ভাঁজে থমথমে নির্বাক্ প্রশ্ন। মুখে তার প্রকাশ নেই।

• •

গৃহবাসের দ্বিতীয় দিনেই সুলোচনার সঙ্গে সে বন্ধুত্ব পাতিয়েছে।

আমার সময় কম, অনেক কাজ তাড়াতাড়িতে সারতে হবে। ধীরেসুস্থে কিছু করার সময় নেই। তোমার সঙ্গে পরিচয়টা একলাফে সখিত্বে উত্তীর্ণ করতে হবে।

আপত্তি নেই। কিন্তু সেটা তো সত্যিকারের বন্ধুত্ব হবে না!

না হোক। একেবারে মিথ্যে না হলেই আমি খুশী।

তুমি যদি খানিক ফাঁকির পুরো ফাঁকটা না দেখতে চাও তাহলে আমিই বা দেখব কেন?

তোমার কাছে আমার অনেক-কিছু জানবার আছে।

আমার কাছে কেন?

তুমি যা জানাতে পারবে আর কেউ তা পারবে না।

তোমার প্রশ্নের জবাব দিতে চেষ্টা করব।

প্রশ্নের শেষ নেই। সিম্থিয়ার উদ্দেশ্য সুলোচনার কাছে ভারতীয় পারিবারিক, সামাজিক ও ব্যক্তিগত জীবনের খুঁটিনাটি মালমসলা সংগ্রহ করা। নারীজীবন নিয়ে তার অনুসন্ধিৎসা বেশি। পুরাতন ভারতের প্রভাব কতখানি এখনো শিক্ষিত সমাজে—ভারতীয় নারীজীবনের বহুধারা বিবর্তনে। যা সুলোচনা স্পষ্ট করে ভেবে দেখেন নি, সিম্থিয়ার ঔৎসুক্য তাই নিয়ে। সুলোচনা প্রশ্নের জবাব দিতে ভয় পান। বুঝতে পারেন, এই বুদ্ধিপটু বিদেশিনী প্রধানত জানতে চাইছে, বুঝতে চাইছে না।

তোমরা নিজেরা পছন্দ করে বিয়ে কর, না বাবা-মা বিয়ে দেন?

দুটোই হয়। দ্বিতীয়টাই নিয়ম।

প্রেম করে বিয়ে করা তোমার পছন্দ, না না-পছন্দ?

আমার পছন্দে কী এসে যায়? তবে, আমাদের যে-নিয়মে বিয়ে হয় তাতে বিয়ের খুঁটি শক্ত হয়ে দাঁড়ায়। সহজে ভাঙে না।

নিজে-পছন্দ-করা বিয়ে সহজে ভাঙে?

যা নিজে গড়ি তা নিজেই ভাঙতে পারি। এখানে জবাবদিহি নিজের সঙ্গে। জিতলে নিজের গৌরব; হারলে নিজের লজ্জা। যা নিজে করি নি, শুধু মেনে নিই, তাতে আশ্রয় বেশি।

কিন্তু প্রতিষ্ঠা কম।

না ও হতে পারে। আমাদের পরিবারে স্ত্রীদের প্রতিষ্ঠা বরং বেশি। আমরা ছোটবেলা থেকে স্বামীর সাধনা করি। আমাদের মায়েরা শিবপুজো করে শিবের মতো স্বামী বর চাইতেন। আমরা তা করি নি, কিন্তু স্বামীকে আমরা অনেক বড় মনে করি। দেবতা বলব না, তুমি হাসবে, কিন্তু তোমাদের মতো, স্বামীর সঙ্গে আমাদের সমপর্যায়ের সম্পর্ক নয়। স্বামী আমরা আনি নে, তিনি আসেন। সে তো আগমন নয়, আবির্ভাব। সে-আবির্ভাবের জন্যে আমরা অপেক্ষা করি, সে-ফাল্গুনের কাল গুণি। নতুন সংসার আমরা গড়ি, সাজাই, তার সেবা করি।

তোমাদের ব্যক্তিত্বের অপমান হলে?

আমরা এখনো ব্যক্তিকেই উচ্চতম আসনে বসাই নি। আগেকার যৌথসমাজ বা পরিবার আর নেই, ভেঙে যাচ্ছে। কিন্তু শুধু সবার ওপরে আমিই সত্য

তাহার ওপর নেই—এ-নীতি আমাদের নয়। আমরা বিয়ের আগে বাবা-মা-ভাই-বোনের, বিয়ের পর স্বামী-শ্বশুর-শাশুড়ী-ছেলে-মেয়ের।

তাতে যদি তুমি হারিয়ে যাও?

সে তো আমার চরম সার্থকতা! এক অনেকের মধ্যে হারিয়ে মুক্তি পায়, গৌরব পায়।

তোমার স্বামী যদি তোমাকে ভালো না বাসেন?

সে-দুর্ভাগ্য যদি আমার হয় তাহলে তার প্রতিকার করতে হবে বইকি!

কী প্রতিকার?

বিবাহ-বিচ্ছেদই একমাত্র নয়।

প্রেমহীন বিবাহিত জীবনের মতো কুৎসিত গ্লানিকর আর কী আছে, সুলোচনা?

কিছু নেই। কিন্তু আমাদের সমাজে মেয়েরা নিজের পায়ে দাঁড়াতে অভ্যস্ত নয়। আর, মেয়েরা নিজের পায়ে দাঁড়ালেই তাদের সবরকম কল্যাণ হল তাও তো মনে হচ্ছে না। তাছাড়া, সংসার বলতে শুধু স্বামীই নয়; আত্মীয়-পরিজন আছেন, পুত্রকন্যা আছে।

অর্থাৎ স্বামী ভালো না বাসলেও তাঁর স্ত্রী হতে তোমাদের মন বিদ্রোহ করবে না?

নিশ্চয় করবে। দরকার হলে আমরা স্বামীকে ত্যাগও করব। কিন্তু তার আগে, চেষ্টা করব তাকে বিভ্রম থেকে ফেরাতে, আর ভেবে দেখব, স্বামীত্যাগই একমাত্র সম্মানজনক পথ কিনা।

একটা প্রশ্ন করি, সুলোচনা।

কর।

তোমার জীবনে ক'জন পুরুষ এসেছে?

আনাগোনা হয়তো করেছে কয়েকজন। এসেছেন একজন।

স্বামী ছাড়া অন্য কোন পুরুষের নিকটতম সান্নিধ্যে আসো নি?

একটু ভেবে সুলোচনা জবাব দিলেন, না।

তুমি কি এ-বিষয়ে নিয়ম, না ব্যতিক্রম?

নিয়ম।

তোমাদের পুরুষরা?

তাদের জিজ্ঞেস কর।

তোমার স্বামী যদি একনিষ্ঠ না হয়, তুমিই বা হবে কেন?

পুরুষের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে সব কাজ করতে হবে, এতটা প্রাধান্য তাঁদের দেব কেন?

কিন্তু একথা তো সত্যি যে পুরুষ নারীকে নানাভাবে বঞ্চিত করে রেখেছে।

দেখ সিন্থিয়া, এই পুরুষ-দুর্ভাবনাটা বর্তমান কালের মেয়েদের যেমন করে পেয়ে বসেছে তার অর্থ আমি খুঁজে পাই নে। অনেক ক্ষেত্রে সামাজিক, নাগরিক, রাজনৈতিক অধিকার আমাদের পেতে হবে, মানি; কিন্তু এজন্যে নয় যে তা পুরুষের আছে, আমাদের নেই; এজন্য যে ওগুলো না হলে আমরা স্ফূর্ত করতে পারছি না নিজেদের। তোমরা বড্ডো বেশি পুরুষের সঙ্গে পাল্লা দিচ্ছ। তাদের মতো চুল ছাঁটচ, পোশাক পরছ, তারা যা করছে তাই করছ। আমাদের দেশে মেয়েদের ভূমিকা আলাদা। তারা ভারসাম্য রক্ষা করছে সমাজে, গৃহে, দাম্পত্য-জীবনে। তুমি দেখবে, স্বামী কালোবাজারে ব্যবসা করে রাতারাতি ধনী হয়ে অন্য মানুষ; কিন্তু স্ত্রী নিভৃতে গৃহদেবতার পদতলে বারবার তাঁর জন্যে মার্জনা ভিক্ষা করছে। এর মধ্যে একটা বড় অর্থ আছে। একটা কাব্য আছে।

আরও কথাবার্তার পর সিন্থিয়া বলল, তোমাকে এত কথা জিজ্ঞেস করলাম। তুমি আমাকে কিছু প্রশ্ন কর।

সুলোচনা একটু হেসে বললেন, আমার আবার কী প্রশ্ন?

মনে মনে যোগ দিলেন, শুধু প্রশ্ন করে মানুষকে কতটুকু জানা যাবে? তোমাকে কিছুটা জেনেছি, অনেকখানি বুঝি নি। প্রশ্ন ও উত্তরে তা বোঝা যাবে না।

আত্মপরিচয় দিতে সিন্থিয়া ওয়ার্ড কিন্তু কার্পণ্য করে নি। সুলোচনা দেখে প্রথম বিস্মিত, পরে সংকুচিত হয়েছিলেন যে, শুকদেবের মতো অমন সময়-কৃপণ, কর্মব্যস্ত মানুষ, যিনি আরনেস্ট লংফেলোর দেখাশোনার ভার বেশির ভাগ স্ত্রীর হাতে ছেড়ে দিয়েছিলেন, সিন্থিয়ার সঙ্গে কথোপকথনের পর্যাপ্ত সময় খুঁজে পেলেন এবং তাকে শহর দেখাবার কাজটা নিজেই গ্রহণ করলেন। হঠাৎ খচ্ করে কাঁটার মতো যে উপলব্ধিটা সুলোচনার আত্মাকে পীড়ন করল তা হচ্ছে, কাজের চাপে স্বামী তাঁর সঙ্গেও গল্প করা প্রায় ভুলে গেছেন, তাঁদের একদা-ঘনিষ্ঠ জীবনে স্বামীর জীবন-সাফল্য প্রাচীরের মতো এসে দাঁড়িয়েছে। অথচ সিন্থিয়ার জন্যে শুকদেবের সময় আছে, কেননা সিন্থিয়া শুকদেবের

প্রত্যেকটি সমস্যার বিচক্ষণ সমজদার; তার সঙ্গে সব-বিষয় সমান স্তরে শুকদেব আলোচনা করতে পারেন, এমন-কি শুকদেবের মন্ত্রীর সঙ্গে ডিনারে নিমন্ত্রিতা সিস্থিয়া শুকদেবের কাছে অনেকখানি সমীহের পাত্রী! সিস্থিয়া শুকদেবকে পৃথিবীর বিচিত্র কাহিনীর সরস, সতথ্য বিবরণ শুনিয়ে মন্ত্রমুগ্ধ রাখতে পারে; গণতন্ত্রের জোর ও দুর্বলতা সম্বন্ধে সারগর্ভ আলোচনা করতে পারে; চীনের সঙ্গে ভারতের সংঘর্ষ কেন অবশ্যম্ভাবী তা প্রমাণ করতে পারে; আবার গ্রাহাম গ্রীনের উপন্যাসে হিংসাতত্ত্বের ওপর সুন্দর আলোচনাও তার পক্ষে সহজ। সুলোচনা পিকাসোর আর্ট জানে, মিশরের প্রত্নতত্ত্ব জানে, মাও সেতুং-এর সামরিক নীতি জানে, স্তালিন মারা গেলে সোবিয়েত রাশিয়ার পতন অবশ্যম্ভাবী, তাও সে পুরোপুরি জানে। শুকদেবকে সে শুধু পৃথিবীর কথাই শোনায় না, প্রত্যেকদিন ভারতবর্ষ সম্বন্ধে যে-জ্ঞান ও অনুভূতি সে আহরণ করেছে, তারও আস্বাদ দেয়।

এই কথাবার্তার ফাঁকে ফাঁকে নিজের জীবনের পর্দা অনেকখানি তুলে ধরে। তাতে তার সংকোচ নেই, লজ্জা নেই। শুকদেবকে সে বলেছে (সুলোচনাকেও, কেননা, তিনিও উপস্থিত ছিলেন) জীবন সে শুরু করেছিল আর্টিষ্টের মডেল হিসেবে। সপ্তাহে তিনদিন সম্পূর্ণ নিরাবৃতা হয়ে চিত্রশিল্পীর সামনে দাঁড়াতে হত। কথাবার্তার মধ্যে হঠাৎ জিজ্ঞেস করেছে, ভারতীয় সমাজে দেহতত্ত্ব নিয়ে এত বিধিনিষেধ কেন? নিজেই বলেছে, 'খাজুরাহো দেখে যে-দেশের, যে-মানুষের কথা মনে হয়, সে যেন অন্য ভারতবর্ষ, অন্য ভারতবাসী, তোমরা নও।' জানতে চেয়েছে, ন্যুডিজম্ সম্বন্ধে সুলোচনার কী মত? তার লজ্জা দেখে মজা পেয়েছে। ঘোষণা করেছে, সে নিজেই কিছুদিনের জন্যে ফ্রান্সে একটা ন্যুডিষ্ট ক্লাবে যোগ দিয়েছিল, ওহ, ইট্স্ পারফেক্টলি ইনোসেণ্ট অ্যাণ্ড সুপার্ব ফর ইয়র হেলথ্। কথাবার্তায় হঠাৎ বলে ফেলেছে তার প্রথম যৌন অভিজ্ঞতা হয়েছিল আঠারো বছর বয়সে: অ্যাণ্ড আই ডিড্ নট লাইক্ ইট অ্যাট্ অল্—আই ওন্লি ফেল্ট্ রব্ড্। পৃথিবীর বহুদেশ সে ঘুরেছে, বহু বিচিত্র মানুষের সঙ্গে তার নানা স্তরের যোগাযোগ হয়েছে। পৃথিবীটা বড বিচিত্র মনে হত প্রথম-প্রথম, এখন মনে হয় একঘেয়ে, একই রান্না রোজ-রোজ খাবার মতো।

যেখানেই যাও, সেই এক ব্যাপার। খুদে-খুদে মানুষ, যাদের বুদ্ধি পর্যাপ্ত, বিবেচনা গোষ্ঠিবদ্ধ, এবং দৃষ্টি সীমিত, তাদের ঘাড়ে বিরাট দায়িত্ব, হাতে

বিরাট শক্তি। তারা সবাই মিলে মানুষকে চরম বিনাশের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, আর, কী ক্ষুধাই না বেড়ে গেছে মানুষের! পাঁচশো বছর ধরে মানুষ যত্ন করে নিজের পুঁজি যা-কিছু জমিয়েছিল, এই বিংশ শতাব্দীতে বুঝি সব খেয়ে শেষ করবে। চারদিকে কেবল আরও চাই, আরও চাই! যার কুটির ছিল তৃপ্তির নিলয়, সে চাইছে কোঠাবাড়ি; যার কোঠাবাড়ি ছিল, সে চাইছে অট্টালিকা! কোন ক্ষেত্রে মানুষের পরিতৃপ্তির চিহ্ন নেই, তার অনন্ত কামনা লেলিহান বহ্নিশিখায় চারদিকে উন্মত্তের মতো ছুটেছে। নিজেকে নিয়ে, পরকে নিয়ে, ধরিত্রীকে নিয়ে কী যে সে করবে বিন্দুমাত্র ধারণা তার নেই।

সিস্থিয়া ওয়ার্ডের যেন কোন-কিছুতেই শ্রদ্ধা নেই, কোন-কিছুকেই, কাউকেউ সে পুরোপুরি বিশ্বাস করে না।

আমি অনেক বড় বড় মানুষ দেখেছি, আর দেখেছি প্রদীপের পদতলে কত কালো ছায়া! যখন ওঁরা কথার মালা গাঁথেন আমার ঘুম পায়। যেসব রোমহর্ষক বক্তৃতা বিশ্বের সংবাদপত্রগুলি ফলাও করে ছাপে, তা যারা রাত জেগে তৈরি করে তাদের কথা তোমরা জান না, তারা আমারই মতো অতি সাধারণ মানুষ! সেই পরের-লেখা বক্তৃতা পড়ে রাজনৈতিক নেতারা হাততালি পান। এমনি এক নেতার হয়ে ফ্রান্সে আমিও এককালে গরম-গরম ভাষণ লিখেছি। কোন বড় কথা আমি তাই শুনতে চাই নে। সব বড় প্রতিজ্ঞার মধ্যে ফাঁকিটাই আমার আগে চোখে পড়ে।

তেমনি নীতি সম্পর্কে।

পৃথিবীর বহুদেশে ঘুরেছি, মানুষের অনেক পরিচয় জানি। তাই বুঝতে পেরেছি, নিজের তৃপ্তি, আনন্দ, উন্নতি ও সার্থকতা ছাড়া অন্য কোন নীতি নেই। 'নিজের' মানে কখনো ব্যক্তির, কখনো গোষ্ঠির: আমার ও আমাদের।

আদর্শ সে মানে না।

অনেক আদর্শ দেখেছি। তার পরিণতি নৈরাশ্যে! তোমরা স্বাধীনতাকে আদর্শ করেছিলে, যতক্ষণ পাও নি, মনে হত কী-ই যেন না সে-জিনিস। এখন পেয়েছ, দেখছ, তেমন-কিছু নয়। দেখবে, পদে-পদে তোমরা পরাধীন, আত্মাধীন। আরও দেখবে, অযোগ্য মানুষের হাতে আদর্শের কী নিদারুণ লাঞ্ছনা! গণতন্ত্রের পরিণতি দেখছ না? সাম্যবাদের চেহারা

দেখে আঁতকে উঠছ না? আমি এখন শুধু ডিক্টেটরশিপে বিশ্বাস করি—হিটলারের মতো পাগলের একনায়কত্ব নয়, এই ধরো, তোমাদের গান্ধীর মতো কোন একজন মানুষ, যার হাতে অনেক ক্ষমতা, যার আকাঙ্ক্ষা নেই, লোভ নেই, দাবি নেই। তা তো আর পাব না, সুতরাং…।

নতুন ভারতবর্ষ নিয়ে সিন্থিয়ার কোন কৌতূহল নেই।

ও আমি অনেক দেখেছি। বাঁধ, কলকারখানা, নতুন রাস্তা, বিদ্যুৎ-ঘর আমার দেখবার ইচ্ছে নেই। ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়ে তোমরা য়ুরোপের দ্বিতীয় শ্রেণী কোন একটা দেশের সমান হতে চাইছ, দেখে আমার দুঃখ হয়। আমি বরং দেখতে চাই তোমাদের সেই কালীঘাটের কালী, যা দিয়ে মিস্ মেয়ো তাঁর 'মাদার ইণ্ডিয়া' শুরু করেছিলেন। আমি দেখতে চাই তোমাদের ন্যাংটা সন্ন্যাসী, জটাজুটধারী যোগী, তোমাদের শিবের গাজন, হোলি। হায় ঈশ্বর, তোমরা সতীদাহ বহুদিন বর্জন করেছ, আমি দেখবার জন্যে প্রাণ দিতে পারতাম! যদি দেখাতে পার, অন্ধকার শ্মশানে মরা-মানুষের বুকে বসে তোমাদের কোন তান্ত্রিক সাধনা করছে! আহা, সে তো হাজার ডলারের 'ষ্টোরী'!

সিন্থিয়া জীবনীশক্তির আশ্চর্য আধার। ক্লান্তি নেই তার দেহে বা মনে। সকালবেলা উঠে সে প্রথমেই পড়ত চারখানা সংবাদপত্র। তারপর সযত্ন প্রভাতী প্রসাধন। বাংলো-বাড়ির সামনে আলাদা একখানা ঘর আছে, আলাদা স্নানঘর সমেত। গোলাকৃতি দেয়াল বেয়ে যুঁই আর মালতীর জড়াজড়ি মিতালি। ঘরের চারদিকে ঘোরান বারান্দায় অনেকগুলি ফুল ও পাতাবাহারের মৃৎপাত্র। সে-ঘরে সিন্থিয়া ছিল সপ্তাহের অতিথি। সাত-সকালে বেয়ারা চা পৌঁছে দিত সিন্থিয়ার ঘরে; তার আগেই সে সংবাদপত্র-পাঠ সমাপ্ত করেছে। স্নান ও প্রসাধন সেরে সাতটায় সে তৈরি। প্রভাতী আহারে বসে গালগল্প হত পূর্বদিনের নৈশ গল্পের রেশ টেনে।

তারপর শুরু হত সিন্থিয়ার 'দিন'। দু'-দিন ছাড়া দুপুরে সে খেতে আসে নি। ফিরেছে সন্ধ্যায়। প্রায় রোজই বাইরে আহারের নেমন্তন্ন।

ফিরতে ফিরতে রাত দুপুর। সুলোচনা শুতে চলে গেছেন। কিন্তু শুকদেব আপিস-ঘরে কাজ নিয়ে বসে থেকেছেন সিন্থিয়ার অপেক্ষায়। দু'-দিন দুজনে একই জায়গায় নিমন্ত্রিত হয়ে একত্র গেছেন, ফিরেছেন মধ্যরাত্রি উত্তীর্ণ করে।

অন্যদিন অনেক রাতে শয্যাত্যাগ করে সুলোচনা ড্রেসিং গাউন চাপিয়ে

বেরিয়ে এসে দেখেছেন বসবার ঘরে গভীর কথাবার্তায় ডুবে আছেন শুকদেব ও সিম্থিয়া। সিম্থিয়া তাঁকে সাদরে ডেকে বসিয়েছে; আপসোস করেছে, আহা, বেচারি ঘুমকাতুরে সুলোচনা, তোমার ঘুম ভেঙে গেল! সুলোচনা খানিকটা অপ্রস্তুত হয়ে বসে থেকেছেন, কিন্তু অর্ধনিদ্রিত মন ওদের গল্প-গুজবের রেশ ধরতে পারে নি। মনে হয়েছে লজ্জা, হয়তো সিম্থিয়া ভাবছে, তিনি তাঁর স্বামীকে বিশ্বাস করেন না। নিজেকে ছি ছি করে সুলোচনা উঠে গেছেন, মাপ চেয়ে ঘুমুতে। ঘুম আসে নি। অভিমানে, ক্ষোভে, ধিক্কারে বুক ভরে উঠেছে, হঠাৎ নিজেকে মনে হয়েছে বড় একা, বড় খালি। চলে গেছেন শীলার ঘরে। স্লিপিং-স্যুট-পরা পরম-নিশ্চিন্তে-নিদ্রিত মেয়ের মাথায় অকারণ হাত বুলিয়েছেন। দেখে এসেছেন একবার ঘুমন্ত রমেশকে। বসবার ঘর থেকে শুকদেব ও সিম্থিয়ার মিলিত হাসি বিদ্রূপের মতো তাঁর পেছনে ধাওয়া করেছে।

হঠাৎ কানে এসেছে, শুকদেব বলছেন, ও, ইউ আর ওয়াণ্ডারফুলি ক্লেভার!

আর সিম্থিয়া হেসে জবাব দিয়েছে, এ্যাম্ আই? থ্যাংক ইউ!

একদিন খাবার টেবিলে বসে তিনি সিম্থিয়াকে জিজ্ঞেস করলেন, সাতদিনে তুমি দিল্লীর কী পরিচয় পেলে?

এ সিটি অব ফাইন্ মেন্, উত্তর দিল সিম্থিয়া, শুকদেবের দিকে তাকিয়ে।

তুমি কি ফাইন্ মেন্-এর খোঁজে এসেছ, সিম্থিয়া? সুলোচনা অতি স্বাভাবিক স্বরে জানতে চাইলেন।

আমি এসেছি ভারতবর্ষ দেখতে। আর তা দেখছি পুরুষদের চোখে।

কোন্ পুরুষকে সবচেয়ে ভালো লাগল?

সত্যি বলব? তার নাম জবাহরলাল নেহেরু।

মৌলিকতা নেই, বললেন শুকদেব।

মৌলিকতা হতো, যদি বলতাম, শুকদেব শর্মা, আই. সি. এস্, হেসে উঠল সিম্থিয়া।

নেহেরুকে তোমার কীসে ভালো লাগল? কথা ঘোরালেন সুলোচনা।

সব-কিছুতে। অমন ছেলেমানুষী হাসি আমি কোন নেতার মুখে দেখি নি, অমন ভারমুক্ত, হালকা অথচ স্বচ্ছ মন আমি কোন প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে পাই নি। অমন ব্যাথাতুর আশাবাদ আমি জীবনে কম দেখেছি, অমন নিঃসঙ্গ বিনয় আমি কোনখানে পাই নি। তোমাদের নেহেরুকে দেখবার আগে

আমার বিশ্বাস ছিল আদর্শবাদ পৃথিবীর রাজনীতি থেকে নির্বাসিত হয়েছে; ছোট ছোট মানুষ স্বখাত সমস্যা-সলিলে হাবুডুবু খাচ্ছে; যতই উঠতে চাইছে, ততই যাচ্ছে তলিয়ে। কিন্তু তোমাদের নেহেরুর মধ্যে অনেকদিনের পুরোনো দীপশিখা এখনো জ্বলছে দেখতে পেলাম। বেচারা নেহেরু!

কেন? বেচারা কেন? খপ্ করে বলে উঠলেন শুকদেব।

বেচারা নয়? বড় বেশি বেচারা! এ পৃথিবীতে আদর্শের কোন স্থান আছে? দু'টো বিরাট শক্তির সাংঘাতিক লড়াই চলছে, একদিকে আদর্শহীন দুর্ধর্ষ সাম্যবাদ, অন্যদিকে আদর্শ-পচা ক্রমশ-নিস্তেজ ধনতান্ত্রিক গণতন্ত্র। এর মাঝখানে নিজের জন্যে, এশিয়ার জন্যে, আফ্রিকার জন্যে একটু আলাদা স্থান করে নিতে চাইছেন তোমাদের নেহেরু। কিন্তু এ হবার নয়। তোমরা তোমাদের অজ্ঞাতেই য়ুরোপের অন্ধ অনুকরণ করছ, গান্ধীবাদ ভুলে গেছ। যা একটু আছে তোমাদের মানসে, তাও যাবে, যত তাড়াতাড়ি তোমরা যান্ত্রিক সভ্যতা গড়ে তুলবে! তোমরা যে-এশিয়ার স্বপ্ন দেখছ, তা তেমন অলীক, যেমন অলীক ছিল অনেক আদর্শবাদীর য়ুরোপ-স্বপ্ন। একদিন তোমরা দেখবে, এশিয়ায় শুরু হবে সেই অন্তর্কলহ যা য়ুরোপকে শত-শত বছর ডুবিয়ে রেখেছে। আলাদা হয়ে থাকতে তোমরা পারবে না। হয় সাম্যবাদ তোমাদের গ্রাস করবে, নয়তো তোমরা অন্য পথে অন্য শক্তির সঙ্গে হাত মিলিয়ে সাম্যবাদ থেকে বাঁচতে চাইবে। আর মারামারি করবে নিজেদের মধ্যে। যেমন করছি আমরা।

তুমি নেহেরুকে বলেছ এ-কথা?

আমি কেন বলতে যাব? আমি তো বলতে আসি নি, শুনতে, দেখতে, জানতে এসেছি।

কতটুকু জানলে?

দেখ সুলোচনা, এ-যুগের একটিমাত্র বাণী আছে: সময় নেই। ভালো করে জানব তার সময় কই? অনেক করে দেখব, সে অবসর কোথায়? এ-যুগের সর্বপ্রধান সাহিত্য সংবাদপত্র। তার আদর্শ কী? মানুষকে যত পার চমক লাগাও—সত্যকে অর্ধসত্য করে, মিথ্যেকে আবিষ্কার করে, হত্যা, অবৈধ প্রেম, আরও যত রকমের গোপনীয় জঘন্য বৃত্তি আছে তার প্রভাতী আসর সাজিয়ে সংবাদ-সাহিত্য কর! সংবাদ-শিকারীরা ছলে-বলে-কৌশলে চমকপ্রদ 'খবর' ধরে আনছে, পৃথিবীর সব জায়গা থেকে। কী এই 'খবর'? তুমি তোমার

স্বামীর সঙ্গে সুখে জীবন কাটাচ্ছ, তাতে 'খবর' নেই; তুমি স্বামীর বন্ধুর সঙ্গে পালিয়ে গেলে আমাদের পরম উল্লাস, কেননা, সেটা 'খবর'। আমরা হচ্ছি গোটা পৃথিবীর নর্দমা-পরিদর্শক, তোমাদের গান্ধী যে বিশেষণে মিস্ মেয়োকে অভিনন্দিত করেছিলেন।

তাহলে তুমিও ভারতবর্ষের নর্দমা দেখতে এসেছ?

অনেকটা তাই। সেক্ষেত্রে আমিও মিস্ মেয়ো। তবে কী জান, এটা বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ এবং ভারতবর্ষ স্বাধীন দেশ, দুনিয়ায় যার একটা মানে আছে। সুতরাং শুধু নর্দমা দেখলেই আমার চলবে না। আমাকে আরও কিছু দেখতে হবে, অন্তত দেখবার ভান করতে হবে। তোমাদের কথা লিখতে গিয়ে পাঠকদের জ্ঞান-বৃদ্ধি করতে চাইব না, তাদের চমক লাগাতে চাইব। সুতরাং, যদি তার করি, 'নেহেরু একজন বিরাট মানুষ', আমার চাকরি যাবে। বিলেত বা ফরাসী দেশের লোকেরা তা পড়বে না। কিন্তু যদি লিখি, 'নেহেরু আজ পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে নিঃসঙ্গ নেতা', আমার পাঠকেরা একটু থেমে তাকাবে। যদি লিখতে পারি—এই আশাবাদী নিঃসঙ্গ মানুষটির সঙ্গে একঘণ্টা কথাবার্তার পর আমার বিশ্বাস আরও দৃঢ় হল যে তিনি গভীর স্বপ্নভঙ্গের ব্যথায় একদিন একেবারে মুষড়ে পড়বেন, তাহলে তারা হয়তো আমার লেখাটা পড়বে।

কিন্তু তোমার বিবেক?

বিবেক এ-যুগে ছুটি নিয়েছে।

তোমরা ছুটি দিয়েছ, তাই।

কী করা যায় বল? জেট-প্লেনের যুগ: গতিটাই যে বড় হল, মতি গেল ডুবে। তাছাড়া, সুলোচনা, এটা তো ভ্রমণের যুগ নয়, এটা ট্যুরিষ্টদের যুগ। আমি একমাসে ভারতবর্ষের সব দেখব, জানব, শিখব। দেশে গিয়ে আমি ভারত-বিজ্ঞ! সব ব্যাপারটাই এমন অদ্ভুত যে এখানে বিবেক বা সুমতির কথা আনা অবাস্তর।

কিন্তু এখনো অনেকে আছেন যাঁদের সততায়, গভীরতায়, আন্তরিকতায় আস্থা অটুট, যাঁরা জীবনকে সাধনা বলে মনে করেন, যাঁরা আদর্শের জন্যে প্রাণ দিতে প্রস্তুত।

আছেন বইকি। কিন্তু পৃথিবীর গতি তাঁরা নিয়ন্ত্রণ করেন না। তাঁরা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ান, মোটা মোটা বই লেখেন, মাঝে মাঝে সারগর্ভ ভাষণ দেন,

প্রবন্ধ ছাপেন। কেউ তা পড়ে না, শোনে না; পড়লেও, শুনলেও, পরক্ষণে ভুলে যায়। মার্কিন দেশে পণ্ডিত-মানুষের প্রতি একটা সহজ অবজ্ঞা আছে, কেননা তারা দশের বাইরে। ইংলণ্ডে তাদের সম্মান আছে, তাও রাজনীতিক্ষেত্রে নয়। লাস্কি-লাস্কি করে তোমরাই পাগল হয়েছে, বিলেতের মানুষ তাঁকে একজন অধ্যাপক ছাড়া আর কিছু কখনো মনে করে নি। ফরাসী দেশে হয়তো এঁদের সম্মান এককালে অনেক ছিল, আজ তা নিশ্চিহ্ন-প্রায়। এটা হচ্ছে সিম্থেটিক মানুষের যুগ, প্লাষ্টিক নীতির যুগ, সুলোচনা। এ-যুগের একমাত্র জীবনাদর্শন অস্তিত্ববাদ। আর এই অস্তিত্ববাদীদের দেখতে চাও তো এস রিভিয়েরায়। সারা য়ুরোপ আর মার্কিনমুলুক থেকে তারা জাড়ো হয় সমুদ্রতীরে, জীবন-সম্ভোগে। সবাই নোংরা, জনাকীর্ণ, ব্যস্তব্যাকুল শহর-ত্যাগী, এরা পৃথিবীর ট্যুরিষ্ট! পুরুষরা স্পোর্টস্‌-কারের এ্যাক্‌সিলেটরে পা রেখে ন্যুব্জপিঠ, তাদের হাতে এমন জোর নেই যে একটা বড় হাই উঠলে তাকে চাপতে পারে, আর মেয়েরা বিজয়িনী, প্রতি মুহূর্তে তাদের নতুন শিকার; হাত-ব্যাগে রূপচর্যায় যাবতীয় সরঞ্জাম মায় নকল ভ্রূ ও চুল পর্যন্ত; কালো-কাচে বন্দী-চোখের অন্ধ দৃষ্টি দিয়ে পৃথিবীকে তারা তাচ্ছিল্য করে। এই অস্তিত্ববাদের মিছিলে তোমার চিরন্তন সাধনা বা সনাতন মূল্যায়নের স্থান কোথায়?

সিম্থিয়ার কথাগুলো সুলোচনার বুকে জ্বালা ধরিয়ে দিত; শুকদেবের মনে আনত এক অদ্ভুত নেশা। এ-নেশার আভাস সুলোচনা স্বামীর চোখে, মুখে, ব্যবহারে দেখতে পেতেন। লক্ষ্য করতেন বাক্‌চতুরা সিম্থিয়ার কথা শুনতে শুনতে শুকদেবের চোখ বিদেশিনীর দেহে বিচরণ করছে, লুব্ধ মন ধাবিত হচ্ছে সেখানে, যেখানে সিম্থিয়ার দেহ প্রগল্‌ভ।

নিজের স্বামীর সম্পর্কে যে ফাঁকটা সুলোচনাকে এখন প্রায়ই পীড়া দিত, তা যেন আরও বড় হয়ে উঠল ঐ সাতটা দিনের অনন্ত ব্যাপ্তিতে। পাছে সুলোচনা বুঝে ফেলেন তাঁর নতুন নেশা, সেজন্যেই শুকদেব নিজের চতুর্দিকে বিরাট কর্মব্যস্ততার দেওয়াল তুলে দিলেন। হঠাৎ তাঁর মিটিং-এর সংখ্যা বেড়ে গেল, বাড়িতে এল ফাইলের বোঝা। সুলোচনা আহত অভিমানে, প্রতিহত অহংকারে স্বামীর কাছ থেকে দূরে সরে রইলেন। মনে মনে বললেন, তোমাকে যদি নেশায় পেয়ে থাকে, তবে মাতলামি কর, আমি তোমায় বাধা দেব না। আমি শুধু দেখব, এ-নেশা তোমার কতদিন থাকে, কতদূর গড়ায়। তারপর আমার নতুন ব্যবস্থা।

চূড়ান্ত পরিণতি হল সিন্থিয়ার বিদায়ের পূর্বরাত্রে। দুজনে একসঙ্গে ডিনার খেতে গিয়েছিলেন এক উপমন্ত্রীর নিমন্ত্রণে। নিমন্ত্রণ ছিল সুলোচনারও, কিন্তু এ ক'দিনের চাপা বেদনা তাঁর দেহমনকে এত ক্লান্ত করেছিল, তিনি যেতে রাজি হন নি। বহুক্ষণ অপেক্ষা করার পর ঘুমিয়ে পড়েছিলেন সুলোচনা। হঠাৎ গাড়ির শব্দে নিদ্রা ভাঙল। গাড়ি বন্ধ করে প্রথম নামল সিন্থিয়া, তারপর শুকদেব। দুজনে এগিয়ে এল লাল-সুরকি পথ দিয়ে, পদধ্বনি সুলোচনা কান পেতে শুনলেন। হঠাৎ থেমে গেল পদধ্বনি, সুলোচনার বুকে উঠল ঝড়। অন্ধকার ঘরের খোলা-জানলার পর্দা সরিয়ে তিনি দেখতে পেলেন, গভীর আলিঙ্গনে আবদ্ধ একটি পুরুষ, একটি নারী। একবার কেঁপে উঠে সর্বশরীর তাঁর জমে গেলে, মনে হল পাথর। খোলা-জানলার পর্দার আড়ালে স্থাণু হয়ে তিনি দাঁড়িয়ে রইলেন।

সুলোচনার কান শুনতে পেল, চোখ দেখতে পেল, মন বুঝতে পারল! তবু সব ব্যাপারটাই যেন অলীক, যেন অন্য-কোন-জীবনের ঘটনার তিনি আকস্মিক দর্শক, এর সঙ্গে তাঁর কোন সম্পর্কে নেই।

পুরুষ বলল, চল, তোমার ঘরে যাই।

নারী বলল, না না, তা ঠিক হবে না!

পুরুষ বলল, ঠিক হবে। কাল তুমি চলে যাবে। আর তোমাকে পাব না।

নারী বলল, কিন্তু সুলোচনা? (সুলোচনার মনে হল, এ অন্য কারুর নাম, তাঁর নিজের নাম নয়)

পুরুষ বলল, ঘুমুচ্ছে। সে কিছু জানতে পাবে না।

নারী বলল, জানলে সে দুঃখ পাবে।

পুরুষ বলল, না পেলে আমি পাগল হব।

নারী বলল, সত্যি?

পুরুষ বলল, সত্যি।

ঘণ্টাখানেক পরে শুকদেব ঘরে এলেন। সুলোচনা নিজেই দুয়ার খুলে দিলেন। শুকদেব বললেন, তুমি ঘুমোও নি?

আমি ঘুমিয়েই ছিলাম, জবাব দিলেন সুলোচনা।

পরের দিন সকালে সিন্থিয়া বিদায় নিল। অসুস্থ সুলোচনা শয্যাত্যাগ করলেন না। শুকদেব ভোরে উঠে সিন্থিয়ার যাত্রার ব্যবস্থা করলেন। নিজেই সিন্থিয়াকে নিয়ে যাবেন বিমান-বন্দরে। বিদায় নিতে সিন্থিয়া সুলোচনার

ঘরে এসে তাঁর ফ্যাকাশে মুখ, ফোলা-ফোলা চোখ আর মুখে বয়সের রেখা দেখে মুহূর্ত থমকে দাঁড়াল। তারপর কাছে এসে নত হয়ে স্থলোচনার কপালে মৃদু চুম্বন করল সিন্থিয়া ওয়ার্ড।

আমায় মাপ কর স্থলোচনা, নিচু গলায় তাড়াতাড়ি বলল সিন্থিয়া। এ্যাণ্ড্ ডোণ্ট্ টেক্ ইট্ সীরিয়স্‌লি প্লিজ।

স্থলোচনা সে-কথা শুনতে পেলেন না। বললেন, যাবার সময় অসুস্থ হয়ে পড়ায় বড় লজ্জিত বোধ করছি, সিন্থিয়া। আশা করি আমায় মার্জনা করবে।

স্থলোচনা অনেক কিছু করবেন ভেবেছিলেন, করলেন না কিছুই। ভেবেছিলেন, স্বামীর সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করবেন। দেখলেন, বোঝাপড়ার কিছু নেই। বুঝলেই পুড়তে হবে আরও বেশি। শুকদেব হঠাৎ যেন অনেক দূরে সরে গেছেন, স্থলোচনা তাঁর নাগাল পেলেন না।

আরনেস্ট লংফেলো তাঁকে প্রলোভন দেখিয়েছিল, কিছুটা প্রশ্রয়ও দিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু তিনি যেখানে থেমেছিলেন, তাঁর স্বামী সেখানে থামেন নি। স্থলোচনার মনে হল তাঁর ঠোঁটে সেই বিদেশী পুরুষের চুম্বন লেগে আছে, তাঁর দেহে আটকে আছে তার প্রলুব্ধ, উন্মাদ হাতের অগ্নিস্পর্শ। সে-আগুনে তিনি দগ্ধ হন নি, তার কারণ কি তাঁর জীবনের স্তিমিত তৃষ্ণা? শুকদেব ভীরু নয়, তাঁর তৃষ্ণা স্তিমিত নয়, তাই তিনি যা চেয়েছেন, ভোগ করেছেন? এ নিয়ে স্বামীকে ঘাঁটাবার সাহস স্থলোচনার হল না। তাছাড়া, তিনি নিজেকে বোঝালেন, শীলা ও রমেশ বড় হয়েছে, বাবার স্থান ওদের কাছে সর্বশ্রেষ্ঠ; এ-গৌরব যেন তিনি না হারান। স্বামীর কাছে ছোট হতে পারেন, ছেলেমেয়ের কাছে যেন বড় থাকেন।

তবু স্থলোচনা শুকদেবকে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন, সিন্থিয়া-ঘটিত ব্যাপারটা তাঁর অজানা নেই। পরিষ্কার করে কিছু বলেন নি, কিন্তু যা বলেছেন, তাতেই শুকদেব লজ্জা পেয়েছেন। তিনি যে ভোগে একনিষ্ঠ নন তা স্থলোচনা জানতেন, এবং স্ত্রী জানতেন বলে এ নিয়ে তাঁর লজ্জা ছিল না। কিন্তু স্থলোচনার সামনে, নিজের বাড়িতে, এমন স্খলন হবে, নিজেই তিনি কোনদিন ভাবেন নি। স্ত্রী সোজাসুজি এ নিয়ে তাঁর সঙ্গে কলহ করেন নি, এজন্যে তিনি যেমন কৃতজ্ঞ তেমনি সন্তুষ্ট হয়েছিলেন এবং চিরোজ্জ্বল পত্নীপ্রেমের নিদর্শন-স্বরূপ দামী জড়োয়ার নেকলেস স্থলোচনাকে জন্মদিনে উপহার দিয়েছিলেন।

রাতের নির্জন সান্নিধ্যে শুকদেব লুকিয়ে-রাখা কণ্ঠহার পত্নীর গলায় গভীর স্নেহে পরিয়ে দিয়েছিলেন। তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে সুলোচনার চোখ ভরে উঠেছিল তপ্ত, নোনা জলে।

শুকদেব তাঁকে বুকে টানতে গিয়ে থেমে গিয়েছিলেন।

সুলোচনা বলেছিলেন, আজ আমার বয়স বিয়াল্লিশ হল।

আমার কাছে তুমি বয়সের ঊর্ধ্বে সুলোচনা, শুকদেব নিচু গলায় উত্তর দিয়েছিলেন।

তা জানি নে, বলেছিলেন সুলোচনা, শুধু জানি, আমি ফুরিয়ে যাচ্ছি। তুমি এখনো তাজা, তোমার তৃষ্ণা তপ্ত, বল অক্ষুণ্ণ। আমার তো তা গৌরব। আমি চাই তুমি তরুণ থাক, বলবান থাক, আরও উন্নতি হোক তোমার, মানুষ হিসেবে, কর্মী হিসেবে। শুধু একটা মিনতি আমার। তোমার গৌরবে তুমি আমার অসম্মান ক'রো না।

বছর যখন ঘুরে এল, আবার বিদেশী অতিথি গৃহে আনবার সময় হল, শুকদেব প্রমাদ গণলেন। ইচ্ছে হল, এবার আর ওর মধ্যে থাকবেন না। কিন্তু, সমাজে মান আছে, দপ্তরে শান আছে, তার দৃষ্টি উপেক্ষণীয় নয়। কর্তব্য স্থির করতে না পেরে শরণাপন্ন হলেন সুলোচনার।

এবার কাউকে আনবার দরকার নেই, কী বল?

সে কি! আপত্তি তুললেন সুলোচনা। তাতে তোমার বদনাম হবে।

তাহলে কাকে রাখব?

যাকে তোমার খুশি।

ওরা বলছে, একজন আফ্রিকানকে এবার নাও!

কোন্ জাতের আফ্রিকান? সুলোচনার মনে পড়ল আরনেস্ট লংফেলোকে।

নিগ্রো।

নিগ্রো! আঁতকে উঠলেন সুলোচনা। ওরা যে ভয়ানক অসভ্য!

ছি, সুলোচনা! মৃদু তিরস্কারে শুকদেব বললেন, ও কথা বলতে নেই। ওরা অসভ্য ছিল, এখন সভ্য হতে চেষ্টা করছে। ভারতবর্ষে ওরা অনেক আশা নিয়ে আসে। মনে করে, আমরা এশিয়া-আফ্রিকার প্রথম ও প্রধান দেশ,

আমাদের কাছে ওদের অনেক পাবার, শেখবার আছে। অথচ এ-দেশে ওরা একেবারে পাত্তা পায় না। সরকার যতটা পারে, করে। বৃত্তি দেয়, উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থা করে। কিন্তু ভারতীয় সমাজে ওরা অগ্রাহ্য, অপাংক্তেয় হয়ে থাকে। আমরা যদি ওদের একজনকে অতিথির মর্যাদা দিই, সমাজের চোখ খুলবে, এবং প্রধানমন্ত্রী নিজেও প্রীত হবেন।

কিন্তু—সুলোচনা চিন্তিত হলেন: শীলা বড় হয়েছে—

শীলা ক্যান্ লুক আফ্‌টার হারসেলফ্, আ'ম্ কোয়াইট সিওর, যোগ দিলেন শুকদেব। আমি বাছাই করে একটি ভদ্র, মার্জিত ছেলে আনব। তোমার বিশেষ অসুবিধে হবে না।

সুলোচনা কিছু জবাব দিলেন না। শুকদেব নিশ্চিন্ত হলেন।

হাতমুখ ধুয়ে সলোমন কুচিরো ঘরটা একবার দেখল। বেশ ঝকঝকে, সুন্দর সাজানো ঘরখানা। দেয়ালে দু'খানি ছবি, একখানা গগাঁর তুলিতে জীবন্ত তাহিতি মেয়ে, অন্যখানা সমুদ্রে সূর্যাস্ত। দু'খানাই ছাপান নকল, যত্নে বাঁধান। আরও আছে, শুকদেব শর্মা ও মিসেস শর্মার একখানা আলোকচিত্র। এককোণে কাচের আলমারিতে বই—বেশির ভাগই পকেট বুক ও পেঙ্গুইন সিরিজের উপন্যাস, কয়েকখানা জীবজন্তু ও বাগান-চর্চার বই। ধবধবে বিছানার ওপর উত্তরপ্রদেশের তাঁতে বোনা তাজমহলের নক্‌শা-করা চাদর। একটা লেখবার টেবিল, তার সঙ্গী হাতহীন চেয়ার। দুটো আরামকেদারা। মোটা সতরঞ্চিতে গা-ঢাকা মেঝে। দরজায় খদ্দরের মোটা বেগ্‌নি রঙের পর্দা।

কি করবে ভেবে সলোমন বাইরে এল। চারদিকে ঘোরান বারান্দায় বাহারে সবুজ ও নানা-রং পাতার মিষ্টি বিন্যাস। মাসটা অক্টোবর, শীতের মরসুমী ফুল লাগান হয়েছে মাটির পাত্রে, বাইরে বাগানে। দুটো লতানো ফুলের গাছ দেওয়াল বেয়ে ছাদে উঠেছে, একটার গায়ে তারার মতো ছোট ছোট শাদা ফুল, কী মিঠে সুবাস! বাইরে বিরাট সবুজ-ঘাসে-ছাওয়া লন্— আসল বাড়িটার চারদিক ঘিরে। ডানদিকে বড় একটা গাছের নিচে চারখানা সবুজ বেতের চেয়ার, মাঝে কাচবসানো টেবিল। বাঁ-দিকে আরেকটা গাছের নিচে একটি ছেলে, বয়স হবে বছর চোদ্দ, বন্ধুদের নিয়ে কী যেন একটা তর্কে জমে আছে। সেই কথা বলছে বেশি, সঙ্গীরা শুনছে। হয়তো মিঃ শর্মার ছেলে

হবে। সলোমনের ইচ্ছে হল ওদের মধ্যে গিয়ে দাঁড়ায়। ইচ্ছেটা চেপে গেল।

ভোঁস করে একটা মস্ত গাড়ি ফটক পেরিয়ে বাড়ির মধ্যে ঢুকল। গাড়ি থেকে নামলেন যিনি, সলোমনের মনে হল, তিনিই গৃহস্বামী। মিঃ শুকদেব শর্মা। সে শুনেছে, ইনি উচ্চপদের রাজপুরুষ, নিউ দিল্লীর সেরা সমাজের অন্যতম মণি। বুদ্ধিমান, বিদ্বান, উদার লোক, আফ্রিকার প্রতি সহানুভূতিতে প্রাণ পরিপূর্ণ।...তার অনুমান মিথ্যে নয়। ভদ্রলোক গাড়ি থেকে নেমে সোজা তারই দিকে এগিয়ে আসছেন। সেও একটু এগিয়ে এল।

হাত বাড়িয়ে দিয়ে শুকদেব বললেন, মিঃ কুচিরো? আমি শুকদেব শর্মা। তোমাকে পেয়ে বড় খুশী হয়েছি। মাপ ক'রো, নিজে তোমাকে স্বাগত করতে পারি নি, কিছুতেই বেরিয়ে আসতে পারলাম না। আশা করি আমার স্ত্রী কিছু ত্রুটি করেন নি, এবং তুমি ইতিমধ্যেই এখানে নিজের বাড়ির মতো হতে পেরেছ।

সলোমন এই উত্তপ্ত অভিবাদনে বিব্রত হল। আমি খুব সুখে আছি, লজ্জা-করুণ মুখে সে বলল: মিসেস শর্মা ও মিস্ শর্মা দুজনেই আমাকে আপ্যায়ন করেছেন। আপনার গৃহে অতিথির সম্মান পেয়ে আমি গর্বিত, কৃতজ্ঞ। অনুরোধ করব, আমার সব ত্রুটি মার্জনা করবেন।

তার পিঠে হাত বুলিয়ে শুকদেব বললেন, ও কথা বলতে নেই। ভারতীয় শাস্ত্রে বলা হয়েছে, অতিথি দেবতা। আচ্ছা, আমি কাপড় ছেড়ে নিই। চা নিশ্চয় তৈরি রয়েছে, এবং ওঁরা নিশ্চয় আমার অপেক্ষা করছেন।

একটু পরে বেয়ারা এসে সলোমন কুচিরোকে চায়ের টেবিলে ডেকে নিয়ে গেল। সলোমন দেখতে পেল, প্রকাণ্ড টেবিলে মিঃ এবং মিসেস শর্মা প্রতীক্ষা করছেন। তার চোখ কয়েকবার এদিক-ওদিক খুঁজল।

যাকে প্রথমেই দেখতে পেয়েছিল, তাকে আর দেখল না।

চায়ের টেবিলে বসে কথাবার্তা হল। শুকদেব প্রশ্ন করলেন, সলোমন জবাব দিল। সুলোচনা নীরবে শুনলেন। সলোমনকে দু'চারবার আরও কিছু খেতে অনুরোধ করলেন: আর একটা চপ খান, মিঃ কুচিরো। আসুন, এই মিষ্টিটা খেয়ে নিন।

শুকদেবের প্রশ্নের জবাবে সলোমন আত্মপরিচয় দিল। দেশ তার নায়াসা-ল্যাণ্ড, ছায়াবৃতা আফ্রিকার এক রমণীয় পরিবেশে নায়াসা হ্রদের তীরে ছোট্ট

দেশ। রাজধানী ব্লানটায়ার—ডেভিড লিভিংস্টোনের স্কটিশ জন্মস্থানের নামে যার নাম। ডেভিড লিভিংস্টোনের আবিষ্কৃত নায়াসা হ্রদ ও ভিক্টোরিয়া জলপ্রপাত। নায়াসাল্যাণ্ড কালো মানুষের দেশ, খুব কম শ্বেতাঙ্গই ওখানে বাস করে। ইংরেজের 'সংরক্ষিত' দেশ, কিন্তু দক্ষিণ ও উত্তর রোডেশিয়ার সঙ্গে শাসনে আবদ্ধ। সলোমনের বাবা চাষী, তামাকের চাষ করে। নায়াসাদের শিক্ষাপ্রবণতা প্রবল, ক্রীশ্চান মিশনের অনেক স্কুল ওখানে আছে। এমনি একটি স্কুলে শিক্ষা সমাপ্ত করে সলোমন বাবার সঙ্গে চাষাবাদে মন দিয়েছিল। কিন্তু হঠাৎ তার মন গেল বদলে, ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়ল অজানার উদ্দেশ্যে। আফ্রিকায় এমন হয়ে থাকে। মানুষ দেশান্তরে চলে যায় জীবিকার খোঁজে, জীবনের নেশায়। সলোমন চলে গেল লিভিংস্টোন শহরে, বেলজিয়ান কঙ্গোর গায়ে, যেখানে ভিক্টোরিয়া জলপ্রপাতের গর্জন তামার খনির কালো কুলিদের বুকে কাঁপন লাগায়। কিছুদিন তামার খনিতে কাজ করল। সামান্য পুঁজি জমতেই চলে গেল নাইরবি। কেন? দেশ দেখতে। ওখানে কাজ পেল এক ভারতীয় বণিকের দোকানে, মাধবভাই দেশাই তার নাম, গুজরাটের মানুষ। তিন বছর দোকানে কাজ করে রাত্রিতে পড়াশোনা চালিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম পরীক্ষা পাশ করল। মাধবভাই দেশাই উদারপন্থী, গান্ধীর দেশে তাঁর জন্ম। তাঁর উপদেশে সলোমন ভারত সরকারের শিক্ষাবৃত্তির জন্য দরখাস্ত করল। দেশাইর এক আত্মীয় কাজ করতেন নাইরবিতে ভারতীয় দূতাবাসে। তাঁর সাহায্যে সলোমন বৃত্তি পেয়ে গেল। এই হল তার ভারত-আগমনের ইতিহাস।

কেমন লাগছে এখানে এসে?

ভালো লাগছে।

ভর্তি হয়েছ?

আজ্ঞে হ্যাঁ। তিন বছরে বি-এ পাশ করে তারপর আইন পড়ব ভাবছি।

তোমাদের দেশের আইন তো অনেকটা আমাদের দেশেরই মতো।

উৎস একই।

তা বটে। বন্ধুবান্ধব জুটেছে তো?

দু'-চারজনের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় হয়েছে কলেজে।

আফ্রিকার অনেক পরিবর্তন হবে আগামী কয়েক বছরে। তোমাদের দেশও স্বাধীন হবে। তখন তোমরাই হবে নতুন আফ্রিকার নির্মাতা।

পরিবর্তন হবে, সন্দেহ নেই। তবে, আমাদের অঞ্চলে সহজে শাদা মানুষ ক্ষমতা ছাড়ছে না।

তার মানে, তোমরা সংগঠিত ও শক্তিশালী নও।

ঠিক বলেছেন। আর ওরা সব-ক্ষমতার অধিকারী।

তোমাদের জাতীয় আন্দোলন কোন্ পথে এসেছে?

আন্দোলন এখন নেই বিশেষ। সংগঠনের অভাব। তবে অসন্তোষ ব্যাপক এবং তার থেকেই একদিন আন্দোলন গড়ে উঠবে।

কোন্ পথে? হিংসা না অহিংসা?

তা ভেবে দেখি নি। বোধ হয় নির্ভর করবে নেতৃত্বের ওপর।

কিনিয়ায় তো ভয়ানক অবস্থা!

খুবই ভয়ানক।

এই যে মাউ মাউ, এরাই কিনিয়ার সর্বনাশ করবে।

একদা আপনাদের কংগ্রেস সম্বন্ধেও তো ইংরেজ তাই বলত।

তুমি কি মাউ মাউ-এর সমর্থক?

কিনিয়া আমার দেশ নয়। তবে, সেও আফ্রিকার একটা দেশ এবং ইংরেজ আমাদের একসূত্রে বেঁধেছে। আপনারা মাউ মাউ-এর হিংসাই খবরের কাগজে পড়ে থাকেন। অপর পক্ষের হিংসার অতো খবর রাখেন না।

দুটো অন্যায়ে তো একটা ন্যায় হয় না।

কিন্তু অন্যায় অন্যায়কে ডেকে আনে। হিংসা আহ্বান করে হিংসাকে। অত্যাচারের প্রতিবাদে মানুষ অত্যাচার করে। এই তো পৃথিবীর নিয়ম।

অত বড় শক্তির সঙ্গে হিংসায় তোমরা পারবে কেন?

হয়তো পারব না। তখন অন্য পথ দেখতে হবে। সেজন্যেই তো নেতৃত্বের কথা বলছিলাম। একটা কথা জেনে রাখুন, মিঃ শর্মা। নিগ্রো স্বভাবত অত্যন্ত শান্তিপ্রিয়। সবচেয়ে সে যা ঘৃণা করে তা হচ্ছে সংঘর্ষ।

চা শেষ হতে হতে রমেশ এল ঘরে। শুকদেব ডেকে পরিচয় করিয়ে দিলেন। রমেশ কোনমতে দু'-চারটে কথা সেরে পালিয়ে বাঁচল।

সন্ধ্যায় শুকদেব সলোমনকে নিয়ে গাড়ি করে বেড়াতে গেলেন। আরেকজন পদস্থ রাজপুরুষের সুসজ্জিত বৈঠকখানায় সলোমন স্বাগত হল।

মিঃ পাণ্ডে ভারত সরকারের একজন সেক্রেটারী, শুকদেবের মতো উত্তর-

প্রদেশের লোক। তিনি সলোমনের সঙ্গে করমর্দন করলেন, রূপোর কেস বার করে সিগারেট এগিয়ে দিলেন, আফ্রিকা সম্বন্ধে অনেক ভালো ভালো কথা বললেন। মিসেস পাণ্ডে মেদভারে কাতর হলেও মেজাজে জাঁদরেল এবং সাজ-সজ্জায় অতি-সৌখিন। শিফন ও নাইলন ছাড়া পরেন না, সেই মসৃণ মোলায়েম আবরণের আড়ালে তাঁর দেহের অতিকায় দ্রব্যসম্ভার ভীষণ আত্ম-প্রকাশ করে। পাণ্ডে সাহেব রোগা, ছোট মানুষটি, মাথায় একটি চুল নেই, অথচ তাজা জোরাল একজোড়া গোঁফ। দপ্তরে ভয়ানক প্রতাপশালী, গৃহে স্ত্রী-শাসিত, শান্ত, শান্তিপ্রিয়। মিসেস পাণ্ডে সলোমনকে বেশ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখলেন এবং নিজের হাতে এক কাপ চা এগিয়ে দিলেন, যা তিনি স্বামীর সমপদ না হলে কাউকে দেন না। চা হাতে তুলে দিয়ে আরও নিবিষ্ট দৃষ্টি রাখলেন কুচিরোর মুখে, কর্কশ-মধুর কণ্ঠে চোস্ত ইংরেজিতে বলে উঠলেন, এইচ. ডি., এর চুলগুলি সত্যিই নিজে থেকে এমনি কোঁকড়ান?

এইচ. ডি. অর্থাৎ হরিদাস পাণ্ডে একটু বিব্রত হলেন। বললেন, ডার্লিং, নিগ্রোদের চুল সুন্দর কোঁকড়ান হয়ে থাকে।

'ডার্লিং' মিসেস পাণ্ডের ডাকনাম।

ডার্লিং অত্যন্ত স্পষ্টভাষিণী। তিনি উত্তর দিলেন, সুন্দর তো নয়! বলতে পার, অদ্ভুত। প্রথম দেখে মনে হয়, অদ্ভুত। একটু তাকালে, রীতিমত বিশ্রী।

শুকদেব ও হরিদাস দুজনেই অস্বস্তি বোধ করতে লাগলেন। শুকদেব বললেন, আচ্ছা আজ উঠি, এইচ. ডি.। একটু সোমানির ওখানে যাব। সলোমনকে ভারতীয় সমাজ যতটুকু পারি দেখিয়ে দিই। আজ সন্ধ্যে একটু নিস্তার পেয়েছি। কালকে হয়তো আর পাব না।

বিদায় নেবার আগে ডার্লিং শুকদেবকে বললেন, ইজ্ হি কোয়াইট সেফ্? শুকদেবকে জোর দিয়ে মাথা নাড়তে দেখে সাবধান করলেন, শীলাকে ওর ধারে-কাছে আসতে দিও না! আর, সুলোচনাকেও সাবধানে রেখ।

দীপঙ্কর সোমানি আই. সি. এস. না হয়েও সরকারী সমাজে মানী মানুষ। ডাক ও তার দপ্তরের সর্বোচ্চ আসনে বসেন, দিল্লী আর্ট সোসাইটির সভাপতি, তাঁর নাটক বেতারে অভিনীত হয়ে থাকে। আই. সি. এস. পরীক্ষার জন্যে বিলেতে গিয়েছিলেন; ওখানে হারলেও একটি ইংরেজ বারমেড জয় করে এনেছিলেন। দেশে ফেরার পর চাকরি পেলেন পিতার রাজানুগত্যে; সুন্দরী

ইংরেজ স্ত্রীর সাহায্যে উন্নতিটাও বেশ তাড়াতাড়ি হল। মিসেস সোমানি দিল্লীর অভিজাত সমাজে সুপরিচিতা। ইংরেজ আমলে সাহেবদের সঙ্গে বন্ধুত্ব নিয়ে অনেক কাহিনী চালু ছিল, এখনো মিসেস সোমানি পুরুষপ্রিয়া। তাঁর বন্ধু অনেক, তারা সবাই মেরী বলতে অজ্ঞান। ভারতীয় মেমসাহেবরা ঈর্ষা নিয়েও স্বীকার করেন, পুরুষের প্রীতি পাবার একটা সহজ, স্বাভাবিক গুণ মেরী সোমানির আছে। ভারতবর্ষে মেরী সোমানি অনায়াসে বিদুষী হয়েছেন। চিত্রকলার পারদর্শী সমালোচক তিনি; তাঁর স্বামী প্রায়ই স্বদেশী বন্ধুদের কাছে নিজের ইংরেজির তারিফ করতে বলেন, ভুলে যেও না, আমার স্ত্রী একজন বিদুষী ইংরেজ মহিলা! ইংরেজি শিখতে হয় ইংরেজের কাছে!

আওরংজেব রোডের বিরাট বাংলো-বাড়িতে সোমানিরা বাস করেন। বসবার ঘরখানা ছবির মতো সাজান। দেওয়ালে চারখানা বড় বড় ছবি; একখানাও ছাপান নকল নয়। এ-যুগের সুরে সুর মিলিয়ে সোমানিরা দেওয়ালে টাঙিয়েছেন একখানা যামিনী রায়, একখানা অমৃত শেরগিল। আরও আছে একটি রাজপুত চিত্র। চতুর্থটি একটি হিমপ্রধান প্রাকৃতিক দৃশ্য। সুযোগ বুঝে মিঃ সোমানি বলেন, ওখানা তাঁর স্ত্রীর আঁকা।

শুকদেব যখন সলোমনকে নিয়ে সোমানিদের বাড়িতে উপস্থিত হলেন তখন মিঃ সোমানি সেজে-গুজে বারান্দায় অপেক্ষা করছিলেন: সস্ত্রীক নৈশ-ভোজন-পার্টিতে যাবেন। অবশ্যই, স্ত্রীর প্রস্তুত হবার অপেক্ষা করছিলেন। শুকদেবকে দেখে বললেন, আরে শর্ম্মা যে, এসো, এসো।

বড় দুঃখিত। তোমরা তো বাইরে যাচ্ছ!

তা একটু দেরি আছে। মেরী সাজতে সময় নেয়। আর্টিষ্ট মানুষ কিনা। এসো, বসবে এসো। ও-হো, এ আবার কে হে?

পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি। মিঃ সলোমন কুচিরো, আমার অতিথি। মিঃ ডি. সোমানি, আমার বন্ধু।

ও, আই সী! তোমার আফ্রিকান অতিথি! তা বেশ! দেখে সুখী হলাম। বড় ভালো লাগল। আমাদের মার্কিন ভদ্রলোক আগামী সপ্তাহে আসবেন। মেরী তো ভয়ানক উত্তেজিত। তিনি নাকি একজন কবি। মেরীও এককালে কবিতা লিখত কিনা! আমাদের ভালোবাসার প্রথম যুগে প্রতি সপ্তাহে আমাকে একটি করে কবিতা উপহার দিত।

মিঃ সোমানির বৈঠকখানায় শুকদেব ও কুচিরো উপবিষ্ট হলেন। প্রাথমিক বাক্যালাপের পর সলোমনকে প্রশ্ন করলেন, আফ্রিকায় তো আর্টের একান্ত অভাব। এ-অভাব আপনাদের দূর করতে হবে। আর্ট ছাড়া কোন জাতি সভ্য হতে পারে না।

সলোমন বলল, নিগ্রোর আর্ট নেই একথা আপনাকে কে বলল?

না থাকাটা অবশ্য আপনাদের অপরাধ-কিছু নয়, মিঃ সোমানি সান্ত্বনা দিলেন, এখন নেই, পরে হবে।

কিছু মনে করবেন না, আপনার ধারণা ভুল। নিগ্রো অত্যন্ত কলাপ্রিয়। তার কুটিরের বিচিত্র নক্শা দেখে আপনি আশ্চর্য হবেন। যে নাচ আজ আমেরিকায় ও য়ুরোপে সবচেয়ে জনপ্রিয়, তার উৎস তো নিগ্রো-নাচ।

কিন্তু আপনাদের আর্ট থাকলেও তা নিশ্চয় অত্যন্ত আদিম।

আমরাই যে ভয়ানক আদিম, সলোমন কুচিরো জবাব দিল, আমরা আদিম, অসভ্য। আমরা উলঙ্গ থাকি, মানুষ-পশু মেরে কাঁচা মাংস খাই, বন্য পশু আর আমাদের কোন ভেদ নেই।

শুকদেব বিপদে পড়লেন। সামান্য কথা থেকে যে সলোমন অপমান কুড়িয়ে রেগে যাবে তা তিনি ভাবেন নি। আবহাওয়াটাকে হালকা করতে গিয়ে বলে উঠলেন, আর্ট তো যত আদিম ততই সুন্দর। সোমানি, কোথায় পার্টি তোমাদের?

সুইডিস অ্যামবাসাডারের বাড়িতে। উনি আবার মেরীর ভায়ানক বন্ধু কিনা!

• •

এমন সময় ভেতর-পথে দরজার পর্দা সরিয়ে মেরী সোমানি প্রবেশ করলেন। সোনালি-চুলে-ছাওয়া মাথা আর সুন্দর একখানা মুখ, সামান্য মেদপ্রাচুর্যে কমনীয়। আঁকা ভ্রূ তির্যক ভঙ্গিতে কানের কাছাকাছি প্রসারিত। রঙের প্রলেপে প্রজ্জ্বলিত ওষ্ঠাধর। দক্ষিণ চিবুকে নির্মিত একটি আঁচিল। সযত্নে আরোপিত পল্লবের ছায়ায় চোখ দু'টি মেঘকৃষ্ণ। সুঠাম দেহে সম্প্রতি কিছু মেদ বেড়েছে, কিন্তু ভাঁজ ভাঙে নি। অথবা ভাঙতে দেওয়া হয় নি।

মেরী সোমানি পর্দা সরিয়ে শুকদেবকে দেখতে পেলেন। আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল তাঁর মুখ, পরক্ষণেই সামান্য বিষণ্ন।

শুকদেব, মাই ডিয়ার, কত যুগ পরে তোমার সঙ্গে দেখা, তোমার আসবার সময় হল! সুলোচনা ভালো আছে তো? মিষ্টি শীলা কেমন আছে? আর

তুমি এমন কী দুষ্টুমি করে বেড়াও যে একবারও এদিকে আসতে পার না? আজ যদি বা এলে, আমরা এখুনি ডিনারে যাচ্ছি! হা ভগবান, দেরিই বুঝি হয়ে গেল! চলো ডার্লিং, এবার বেরতে হয়। আবার এসো শুকদেব, সুলোচনাকে নিয়ে এসো—

এমন সময় অঘটনটা ঘটল। মেরী সোমানি নজর ফিরিয়েই যেন ভূত দেখতে পেলেন। কালো কুচকুচে তার রং, হাসছে শাদা-শাদা বিকট দাঁত বার করে। হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলেন, ও বাবা, ভূত! অজ্ঞানই হয়তো হয়ে যেতেন, দীপঙ্কর সোমানির বাহুতে আশ্রয় পেলেন।

ছি, ছি, মেরী। ভূত হতে যাবে কেন? ইনি একজন আফ্রিকান। মিঃ— কী যেন, ও হ্যাঁ, মিঃ কুচিরো। শর্মার এ-বছরের বিদেশী অতিথি।

মেরী সোমানির মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসছিল, অ নিগার। দাঁত চেপে এই ভয়ংকর শব্দ দু'টো আটকালেন। নিজেকে একটু সামলে বললেন, আমায় মাপ করুন, আমি বড় দুঃখিত। এখানে এমনভাবে আপনার উপস্থিতি খুবই অপ্রত্যাশিত।

নৈশ-ভোজনে বসে শুকদেব সলোমনকে বোঝালেন। সন্ধ্যেবেলার ঘটনাবলী যেন তার মনে কঠিন রেখাপাত না করে। মানুষ কোনদিন পরদেশীকে সহজে গ্রহণ করতে চায় না। শুধু পরদেশী কেন, নিজের দেশেও হরেকরকম সংস্কার ও অলীক আতংক মানুষে-মানুষে সহজ ভাব-বিনিময়ের পথ আগলায়।

এই দেখ না, আমাদের দেশেই। এখনো এক ভাষাভাষী অন্য ভাষাভাষী-দের সহজে গ্রহণ করতে চায় না। কদাচিৎ কোন মারাঠীকে দেখবে পাঞ্জাবীর বাড়িতে বেড়াতে এসেছে। দেশেই যদি এমন অবস্থা, বিদেশীদের বেলা তো হবেই। তাছাড়া, তোমাদের বেলা আরও বাধা আছে। যে-কোন কারণে হোক, তোমাদের সম্বন্ধে নানা ধরনের মিথ্যে ধারণা পৃথিবীর সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে। মানুষ যত তোমাদের জানবে, তত এসব ধারণা যে শুধু মিথ্যে নয়, অন্যায়, তা বুঝতে পারবে। তোমরা পৃথিবীর মানুষের চোখ খুলছ। অনেকে তোমাদের শুভেচ্ছা জানাবেন, তোমাদের ব্যথার সমব্যথী হবেন। তাই, মিঃ কুচিরো, আমি বলছি, আজ যদি তুমি ব্যথা পেয়ে থাক, সে-ব্যথা আমারও; যদি কারুর অপরাধ হয়ে থাকে, সে-অপরাধ আমারই।

সলোমনের চোখ জ্বালা করে উঠল। শুকদেবের প্রতি শ্রদ্ধায় মন ভরে গেল। নিগ্রো দেখে নাক সিঁটকোয় এমন মানুষ সে অনেক দেখেছে, লিভিংস্টোনে, নাইরবিতে। কিন্তু তারা যে ভারতবর্ষেও আছে, একথা এদেশে আসার আগে কোনদিন ভাবে নি। মাধবভাই দেশাই তাকে অন্য ধারণা দিয়েছিলেন।

খাবার টেবিলে শুকদেব, সুলোচনা ও সলোমন। সুলোচনা যত্ন করে খাওয়ালেন অতিথিকে। প্রথম স্যুপ এল, তারপর আলু-ভাজা ও পালং-শাক-সেদ্ধর সঙ্গে ফিস ফিংগার। সালাড-সহ রোষ্টেড চিকেন। ষ্ট্রবেরী পুডিং। কফি। খাওয়ার শেষে আরও কিছুক্ষণ কথাবার্তা হল।

শুকদেব মার্জনা চাইলেন, আমাকে একটু কাজকর্ম নিয়ে বসতে হবে। সলোমনকে ঘরে পৌঁছে দিলেন।

সকালবেলা অনেক পাখির ডাকে সলোমনের ঘুম ভাঙল। কালটা শীতের আগমনী। সলোমন জেগে দেখল রোদে ঘর ভরে গেছে, ঘোরান বারান্দায় গাইছে অসংখ্য ছোট ছোট পাখি, দুটো চড়ুই জানলা দিয়ে অনধিকার প্রবেশ করে টেবিলের ওপর নেচে বেড়াচ্ছে। কাল অনেক রাত তার ঘুম হয় নি। একে নতুন পরিবেশ, নতুন বিছানা, তার ওপর নতুন অভিজ্ঞতার চাপা শ্বাসরোধী অনুভূতি। পলাতক ঘুমের সাধনা ছেড়ে একখানা ডিটেকটিভ বই নিয়ে অনেক রাত কাটিয়েছে, কখন ঘুম এসেছে, কখন বিছানার সুইচ্ টিপে আলো নিভিয়েছে, এখন আর মনে নেই। এখন হেমন্তের খুশী লাগল সলোমনের মনে, হালকা অকারণ খুশী। হাত-মুখ ধুয়ে তৈরি হতে হতে মনে গান বেজে উঠল, সুর গুঞ্জিত হল কণ্ঠে। অন্য পরিবেশ হলে সলোমন হয়তো নেচে উঠত, পা-দু'টো কেমন অশান্ত পুলকে অস্থির।

বাইরে আসতেই প্রভাতী ফুলের মিষ্টি গন্ধে মন ভরে গেল। গলায় যে-সুরটা গুঞ্জিত হচ্ছিল, তা এবার জীবন্ত হয়ে উঠল।

My father was an Englishman,
"Whose blood was hot from fathers of warproof" ;
My mother, a dark African
Whose blood was sluggish and deplasmatised :
But I, no African or Englishman,

I wander craving for Man's love :
Am spurned by African and Englishman
And reap the hate I did not sow.

গোল্ডকোষ্টের এক নিগ্রো কবির লেখা এ-গানটা একদা বৃটিশ-আফ্রিকার সর্বত্র জনপ্রিয় হয়েছিল। সলোমনের হঠাৎ মনে হল, বাইরের প্রভাতী সৌন্দর্যের স্পর্শে মনে যে খুশী জেগেছে তার সঙ্গে গানটার কোন সম্পর্ক নেই, কিন্তু তবু এই সুরটা কিছুতেই তাকে ছাড়তে চাইল না। বার বার দু'টো লাইন পাহাড়ী ঝরণার শীর্ণ উচ্ছ্বাসের মতো বেরিয়ে আসতে লাগল তার বুক থেকে··· I wander craving for Man's love. And reap the hate I did not sow. . reap the hate I did not sow. .

নিগ্রোর রক্তে নাচ-গানের স্রোত। সলোমনের গলা গম্ভীর, সুরে ভরপুর। অন্তরের অব্যক্ত বেদনার গভীরতার সঙ্গে সে গভীর সুর মিলে হেমন্তের উজ্জ্বল প্রভাতে ম্লান কুহেলি নিয়ে এল। স্নান সেরে প্রসাধন করতে করতে সুলোচনা সে সুর শুনলেন, খবরের কাগজ পড়তে পড়তে থেমে গেলেন শুকদেব। স্কুলে যাবার জন্যে তৈরি হতে-হতে রমেশ বেরিয়ে এল বারান্দায়। পড়ার ঘরে ঢুকে সবেমাত্র বই নিয়ে বসবে শীলা, সে সুর তার কানে এল, একবার মাথা উঁচিয়ে বিস্মিত জিজ্ঞাসায় অন্বেষণ করল তার উৎস, বই রেখে দাঁড়াল এসে দরজার বাইরে। আচমকা ফিরে গেল টেবিলে, বসল বই নিয়ে। সলোমন গম্ভীর গলার মৃদু লয়ে গেয়ে যাচ্ছে···And reap the hate I did not sow.

শীলা মাকে কথা দিয়েছিল নিগ্রো-অতিথির কাছ থেকে দূরে থাকবে। সলোমন আসার আগের দিন চায়ের টেবিলে যে কথোপকথন হয় তাতে মা-বাবা দুজনেই রেগেছিলেন। শীলা জানে, তাকে নিয়ে মার অকারণ দুর্ভাবনা। এ নিয়ে সে রাগ করে না, মার প্রতি তার মমতা ও শ্রদ্ধা গভীর। খুব একটা কথা সে বলে না; যখন বলে, স্পষ্ট, নির্ভীক, সহজ। স্বভাবটা তার গভীর, তরল আনন্দের নেশা কম। চিরাচরিত জীবনে তার তৃপ্তি নেই, লোভ বৈচিত্র্যে, নতুনত্বে। কিন্তু এ-লোভ সে বাইরে প্রকাশ করে না; এ তার গোপন সম্পদ। সে নতুনের আস্বাদ চায়, নিজের পথে, নিজের মতো করে। সহপাঠীনীরা যখন গালগল্প নিয়ে মশগুল, সে লাইব্রেরিতে বসে পড়তে

ভালোবাসে, নয়তো দ্বীজের সবুজ নির্জনতায় ঘুরে বেড়াতে। মহান, বিরাট তাকে অতি সহজে আকর্ষণ করে; ক্ষুদ্র, ছোট্ট, সাধারণ তার উপেক্ষা। সবচেয়ে পড়তে ভালো লাগে জীবন-কথা। বাংলা শিখতে চেষ্টা করছে। সুলোচনার একটু আপত্তি ছিল, অতিরিক্ত পরিশ্রম হবে, কিন্তু মেয়ের জবাব শুনে বাধা দেন নি! সে বলেছিল, ইংরেজি শিখে শেক্সপীয়র পড়তে পারি আর বাংলা শিখে টাগোর পড়তে পারব না, মা? বিদেশী বন্ধুদের কাছে আমার লজ্জা করে এ-কথা মানতে। খানিকটা অভিনবত্ব, খানিকটা নতুনের নেশায় শীলা বিদেশীদের সঙ্গে মিশতে উৎসাহী। শুধু ইংরেজ বা আমেরিকান-দের সঙ্গে নয়—তার বন্ধুদের মধ্যে আছে চীনে, ইংরেজ, আরব ও ইন্দো-নেশিয়ান; সবচেয়ে ভালো লাগে সুইস্, সুইডিস ও ফরাসী দেশের ছেলেমেয়েদের। য়ুনিভারসিটি ছাড়া, সামাজিক স্তরেও, অনেকের সঙ্গে পরিচয়ের সুযোগ তার আছে। তার মধ্যে চপলতা কম বলে কেউ তাকে চটুলা বলে না; কিন্তু সে যে 'স্নব' তাতে অনেকের সন্দেহ নেই।

বাড়িতে বিদেশীরা প্রায়ই আসে-যায়। শীলা বা রমেশের এ নিয়ে বড় একটা ঔৎসুক্য আর নেই। আরনেস্ট লংফেলো বা সিন্থিয়া ওয়ার্ড ওদের বিশেষ চঞ্চল করে নি। বাবা-মার সঙ্গে ছোটবেলা থেকেই বিদেশীদের সঙ্গে মেশবার অভ্যেস। কিন্তু বাড়িতে একটি নিগ্রো ছেলে অতিথি হবে শুনে শীলা বেশ উৎসুক হয়ে উঠেছিল। নতুন নতুন দু'চারজন নিগ্রো ছেলে কলেজে সে দেখতে পায়, তার নিজের ক্লাসেই একজন আছে। কিন্তু কারুর সঙ্গে আলাপ নেই। মেয়েরা এদের সঙ্গে মিশতে চায় না; ভয় পায়। আসলে এটা ভয় নয়, শীলা জানে, সংস্কার ও অহংকারের সংমিশ্রণ। অনেকবার ইচ্ছে হয়েছে, সহপাঠী নিগ্রোর সঙ্গে আলাপ করে, কিন্তু বিদেশী বন্ধুরাও তাকে উৎসাহ দেয় নি। বাড়িতে নিগ্রো-অতিথি এলে অনেকটা সাহস হবে, ভেবে খুশী হয়েছিল।

কেমন হবে ছেলেটা, নিজেকে সে প্রশ্ন করেছিল। মা নিগ্রো শুনেই ভয় পেয়েছেন। পাবেন না কেন? যে-সব ইংরেজি সিনেমায় শীলা আফ্রিকার ছবি দেখেছে তাতে নিগ্রো শুনে আঁতকে ওঠাই স্বাভাবিক। দেশ-বিদেশে উৎসাহ দেখে শুকদেব মেয়েকে অনেক দাম দিয়ে 'Lands and Peoples' কিনে দিয়েছেন; নিগ্রোদের কথা যেখানে শুরু, সেখানে প্রথমেই এক বীভৎস নিগ্রোর

ছবি, মাথায় তীরগুচ্ছ বিচিত্র মুকুট, বর্বর মুখে ভয়াবহ রেখাঙ্কণ। এ বীভৎস চেহারার নিচে লেখা রয়েছে, 'মেডুসার প্রতিদ্বন্দ্বী'। গ্রীক উপ্যাখ্যানের মেডুসার চোখে চোখ পড়লে মানুষ পাথর হয়ে যেত—'উবাঙ্গী-শরীর এই নিগ্রো সেই মেডুসার চেয়ে কম ভয়ানক নয়'! বাবা অবশ্য মাকে আশ্বাস দিয়েছিলেন। ছেলেটি ভদ্র, শান্ত, নিরীহ; এসেছে পড়াশোনা করতে। ইংরেজি বলে। লংফেলো সাহেব খাবার টেবিলে বসে নিগ্রোদের সম্বন্ধে রোমহর্ষক কাহিনী বলতেন, কিন্তু শীলার মনে তা রেখাপাত করেনি। তার অন্তরে প্রশ্ন উঠত, নিগ্রো যদি এতই ভয়ানক হবে তবে তার দেশে তোমরা একশ বছর এমন সুখে বাস করছ কী করে। তাই রমেশ লংফেলোর উক্তি পুনর্ব্যবহার করে অজানা নিগ্রো ছেলেটির অপবাদ করতেই, শীলা প্রতিবাদ জানিয়েছিল। মা যে অমন কঠোরভাবে প্রথমেই তাকে অতিথির কাছে যেতে পর্যন্ত বারণ করবেন, সে একটুও ভাবে নি। কেন সে এই অস্বাভাবিক কাজ করবে তা বুঝিয়ে পর্যন্ত বলেন নি সুলোচনা। উই হ্যাভ্ টু বি কেয়ারফুল! আমাদের সাবধান হতে হবে? কীসের ভয় যে সাবধান হতে হবে? আমি কি দুর্বল? নিয়মিত খেলাধুলোয় সে সুন্দর দেহকে মজবুত করেছে। কোন একটা পুরুষ জোর করে তাকে আঘাত করবে, সে মানতে রাজি নয়। নিজেকে সে রক্ষা করতে পারে। সুতরাং 'সাবধান হতে হবে' শুনেই সে বিদ্রোহী হতে যাচ্ছিল। কিন্তু শুকদেব ব্যাপারটাকে নিয়মের মধ্যে নিয়ে এলেন। 'এটাই নিয়ম।' তিনি যখন বিলেতে গিয়েছিলেন পড়তে, তার সঙ্গে একটি মধ্যবিত্ত ইংরেজ-পরিবার এমনি সতর্ক ব্যবহার করেছিল। তাম্রবর্ণ শুকদেব শর্মা প্রথম যৌবনে অ্যানা বলে একটি ইংরেজ তরুণীর সঙ্গে বাক্যালাপের পর্যন্ত সুযোগ পান নি। সেটাকেই তিনি 'নিয়ম' বলে মেনে নিয়েছেন। বহু বছর পরে সেই 'নিয়ম' জারি করেছেন নিজের পরিবারে, কৃষ্ণচর্ম একটি নিগ্রো-যুবকের প্রতি অতিথি-বাৎসল্যে! শীলার মন বিস্বাদ হয়ে গিয়েছিল। বাবাকে সে ভয় করে, মান্য করে। বাবার 'নিয়ম' মানতেই হবে। সে মেনেও নিয়েছিল। তুমি ঠিকই বলেছ বাবা। একটি ইংরেজ পরিবার যদি তোমার সঙ্গে অমন ব্যবহার করে থাকে, উই মাষ্ট্ ডু দ সেম্ টু অ্যান্ আফ্রিকান্। বাবার 'নিয়মে'র কাছে নতি স্বীকার করে সে যখন উঠে গেল খাবার টেবিল থেকে তখন শুকদেব গম্ভীর হয়েছিলেন, সুলোচনা রক্তিম।

মেয়েকে সুলোচনা জানতেন। তাই রাতে শীলার ঘরে এসে তার পালঙ্কে

বসলেন। দেখলেন, শীলা চেয়ারে বসে একটা বই পড়ছে, 'Glimpses of World History'। পড়ছে আফ্রিকার কথা।

তোমার সঙ্গে একটা কথা আছে শীলা।

বল, মা। শীলা বই বন্ধ করে মার দিকে চেয়ার ঘুরিয়ে বসল।

সকালে আমার কথাটা তুমি বুঝতে পার নি।

বুঝিয়ে বল।

আমার কথা শুনে তোমার কী মনে হয়েছে আমি জানি। তুমি ভেবেছ, তোমাকে আমি পুরোপুরি বিশ্বাস করি নি। তাতে তুমি অপমানিত হয়েছ। ঠিক কিনা?

কিছুটা ঠিক।

কিন্তু আমি তা বলি নি। তোমার ওপর আমার পুরো বিশ্বাস আছে। তুমি যে বিপদে নিজেকে রক্ষা করতে পার তাও আমি জানি। আমার চিন্তা অন্য।

শীলা নীরবে আরও শোনবার অপেক্ষায় রইল।

নিগ্রোদের আমরা একেবারেই জানি নে। বই-এ, ছবিতে, সংবাদপত্রে ওদের কথা যা শুনি তাতে ভয়-ভাবনা স্বাভাবিক। তার সবটা সত্য নয় তা আমি জানি। সবটা মিথ্যে না তাও জানি। তোমার বাবা এই ছেলেটিকে ডেকে এনেছেন, তার অনেক কারণ আছে। সেসব নিয়ে আমাদের প্রয়োজন নেই। সমাজের সবাই আমাকে বলে দিয়েছেন, তোমাকে যেন ওর সামনে যেতে না দেই। যদি আমি এ উপদেশ অমান্য করি, আমাকে নানা কথা শুনতে হবে। সমাজের একটা আভিজাত্য আছে। তাকে সযত্নে বাঁচিয়ে চলতে হয়। আর হিন্দু-পরিবারের নিয়ম হচ্ছে, বাইরের পুরুষ থেকে বাড়ির মেয়েরা দূরে থাকে। আমরা এ নিয়ম সব সময় মানি নে। তুমি বলবে ইংরেজ বা আমেরিকান বা জার্মান, এমন-কি চীনে হলেও আমি একথা বলতাম না। হয়তো ঠিক। কিন্তু এই নিগ্রো ছোকরা কেমন হবে আমাদের কিচ্ছু জানা নেই। তাই মা, ভেবে দেখ, আমার মনে ভয় হতে পারে। আমি তার আদর-আপ্যায়নের ত্রুটি করব না। তাকে অতিথির পুরো সম্মান দেব। কিন্তু আমি তোমাকে দূরে সরিয়ে রাখতে চাই।

কেন?

কেন ঠিক জানি নে। আমার মন বলছে, সেটাই ভালো। তাই উচিত।

অর্থাৎ, তুমি ভয় পাচ্ছ এই ভেবে নিগ্রো ছেলেটা আমার ক্ষতি করতে পারে?

হয়তো পাচ্ছি। ঠিক ভয় পাচ্ছি কিনা জানি নে। পরিপূর্ণ ভরসা পাচ্ছি নে।

কিন্তু, বাবা বলল, ছেলেটা বি. এ. পড়ে। ওর সঙ্গে তো কলেজেও আমার আলাপ হতে পারে?

তা পারে। সেটা অন্য কথা। তুমি এমন অনেক বিদেশী ছেলের সঙ্গে মিশে থাক। তাদের সবাই আমার মনঃপূত নয়। সেই ইরানি ছেলেটাকে নিয়ে এসেছিলে বাড়িতে, হয়তো ভেবেও দেখ নি, সে মুসলমান।

ভেবে দেখবার কী আছে? সে তো মুসলমানই! তুমি তাকে টেলিফোনে কী-সব বলেছিলে, সে আর আমার ছায়া মাড়ায় না!

খুব ভালো হয়েছে। তোমার মেলামেশা সম্বন্ধে আর একটু আভিজাত্য থাকা দরকার। তুমি যার-তার মেয়ে নও। শহরে তোমার বাবাকে সবাই জানে। তুমি মিশবে কেরানির মেয়ের সঙ্গে। তোমার নিকটতম বন্ধু শর্মিলা ভাটনগর একজন সেক্‌সন অফিসারের মেয়ে! বিদেশীদের সঙ্গে মিশতে চাও, বেশ তো, বারণ করছে কে? কিন্তু তোমার উপযুক্ত বন্ধু বেছে নেবে তো! তোমাকে যদি কেউ একটা বর্মী বা চীনে বা ইরানির সঙ্গে বেড়াতে দেখে, আমাদের মান থাকে?

ওরা বুঝি মানুষ নয়?

বোকার মতো কথা বোল না। মানুষ তো সবাই। দুটো হাত, দুটো পা থাকলেই মানুষ। মানুষ তো খানসামা উম্মিদ আলিও। তাই বলে, তুমি তার সঙ্গে রেস্তোরাঁয় খাবে, না সিনেমায় যাবে? যাবে না। যেমন জাতীয় সমাজ আছে, তেমনি আন্তর্জাতিক সমাজ আছে। দেশের সমাজে কারুর সঙ্গে তুমি মিশবে, কারুর সঙ্গে তুমি মিশবে না। আন্তর্জাতিক সমাজেও তাই। উম্মিদ আলির সঙ্গে তুমি সিনেমায় যাবে না, তার মানে এই নয় যে তুমি তাকে ঘৃণা কর। তেমনি একজন বর্মীর সঙ্গে তুমি ঘুরে বেড়াবে না। তার মানে এই নয় যে বর্মী মানুষ নয়। সে মানুষ, এবং হয়তো সবদিকেই সে ভালো মানুষ। তবু সে তোমার পংক্তির বাইরে। তোমার আভিজাত্য একান্তভাবে তোমার নিজের। আভিজাত্য গড়তে অনেক সময় লাগে। ভাঙতে সময় মোটেই লাগে না।

তুমি বললে, আমি যদি কলেজে ওর সঙ্গে কথাবার্তা বলি সেটা অন্য কথা। অন্য কথা হল কী করে?

তুমি নিজে সহপাঠীদের সঙ্গে কলেজে আলাপ করবে, আর বাড়িতে একটি অবাঞ্ছিত লোকের সঙ্গে আমরা তোমাকে পরিচয় করিয়ে দেব, দুটো এক কথা হল?

শীলা কিছুক্ষণ চুপ করে রইল! তারপর পরিষ্কার গলায় বলল, মা, তোমার কথা মেনে নিলাম।

স্বীকার করল না শীলা, সুলোচনা বুঝলেন। তবু মেনে যে নিল এটুকু তিনি যথেষ্ট মানলেন। ইতিমধ্যেই সে নেহেরুর দৃষ্টিতে আফ্রিকাকে দেখতে চেষ্টা করেছে। অদূর ভবিষ্যতে দু'চারটে আফ্রিকানের সঙ্গে যে সে বন্ধুত্ব পাতাবে না, সে-ভরসা সুলোচনা পেলেন না। একদিন হয়তো এই নিগ্রোকেই বন্ধু বানিয়ে বাড়ি এনে হাজির করবে। কিন্তু সে ভবিষ্যতের কথা। শীলাকে সুলোচনা পুরোপুরি বুঝতে পারেন না, কিন্তু এ-রহস্যময়তা তাঁকে আকর্ষণ করে। বাপের জেদটা পেয়েছে সে অনেকখানি, একটি মেয়ের যতটা পাওয়া উচিত তার বেশি, আর পেয়েছে বাপের জীবন-প্রাচুর্য। এ প্রাচুর্য এখনো বাইরে উচ্ছ্বসিত নয়, অন্তরে আবদ্ধ। এরই তাড়নায় সে নতুনের সন্ধান করে, জীবন যেখানে গুরু-গম্ভীর সাধনার বস্তু, পথ যেখানে বন্ধুর, সেখানে তার স্বাভাবিক আকর্ষণ। আজকের মতো শীলার মেনে নেওয়াটাই সুলোচনাকে খুশী করল। তাতেই সমাজে তাঁর সম্মান থাকবে। দশজনে বলবে, সুলোচনার মেয়ের ওপর পুরোপুরি প্রভাব আছে। বলবে, মা বটে সুলোচনা! মেয়ে বটে শীলা!

শীলা চেয়ার ফিরিয়ে পড়ায় মন দিয়েছে। সুলোচনা তার মাথায় হাত বুলিয়ে নিষ্ক্রান্ত হলেন।

ব্যাপারটা ঠিক তা হয় নি। সলোমন এসে হাজির হল বাড়িতে, আর সেই-মুহূর্তে, টেনিস খেলে সাইকেল চেপে ফিরল শীলা। ট্যাক্সি দেখে শীলা ভাবে নি সোওয়ারি তাদের নিগ্রো অতিথি। ভেবেছিল, যেমন আগে হয়েছে, বাবাই গাড়ি করে নিয়ে আসবেন নিগ্রো ছেলেটাকে। ট্যাক্সি করে তাকে একা আসতে দেখে শীলার মনটা খচ্‌ করে উঠল। ব্যবহারের তারতম্য তাহলে প্রথম থেকেই শুরু! একবার মনে হল সাইকেল নিয়ে পেছনের দিকে চলে

যায়। পরক্ষণেই ভাবল, তাহলে ভদ্রলোকের অভ্যর্থনা পুরোপুরি হয় সে এগিয়ে এল। ছেলেটা প্রথম হকচকিয়ে গেল ওকে দেখে, তারপর এমন ভয়ংকরভাবে দেখতে লাগল যে শীলার হাসি পেল। সেও তাকিয়ে দেখল। মুখটা একটু চেনা-চেনা। মনে পড়ল মাসতিনেক আগে বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র য়ুনিয়নের যে বার্ষিক উৎসবে শীলা বিবেকানন্দের শিকাগো বক্তৃতার অংশ আবৃত্তি করে পুরস্কার পেয়েছিল, তাতে তিনটি নিগ্রো ছেলে নাচ পরিবেশন করেছিল। এ তাদের একজন।

যে নিগ্রো ছেলেটির সঙ্গে কথাবার্তা দূরের কথা, দেখা-সাক্ষাৎ পর্যন্ত সে করবে না ঠিক ছিল, তাকে স্বগৃহে অতিথিরূপে প্রথম অভ্যর্থনা করতে হল শীলাকেই।

সুলোচনা যখন ঝড়ের মতো আবির্ভূত হলেন, শীলা একটু দাঁড়িয়ে মজা দেখে নিল। সুলোচনা ভাবলেন, মেয়ে তাঁকে বিদ্রূপ করছে। কড়া ইশারায় তার প্রস্থান আদেশ করলেন।

হাসি চেপে শীলা অন্তর্হিত হল।

শীলা এসে দাঁড়াল জানালার পাশে। সলোমন তাকিয়ে আছে দূরের আকাশে। মনভোলা সুরে গাইছে,...

"And reap the hate I did not sow."

চোখ ফিরিয়ে সলোমন তাকাল সেই জানলার দিকে, আর দেখল সেই মুখ যা সে দু'বার দেখেছে, যেন যুগ-যুগ দেখেছে। তার বুকে ভীষণ কাঁপন শুরু হল, গান গেল থেমে। চকিত ব্যাকুলতায় সে তাকিয়ে রইল জানলার দিকে ...টের পেল না, সে-মুখ সরে গেছে; শুধু সে দেখছে ফিকে সবুজ পর্দা, শাদা রং-লাগান লোহার শিক। শীলা ফিরে এসে পড়ায় মন দিল। সলোমন স্থির হয়ে তাকিয়ে রইল।

এবার বুদ্ধি তাকে দারুণ আঘাত হানল। সে বুঝল এই মেয়েটি তার সামনে আসছে না! বাবা-মা এর সঙ্গে তাকে পরিচয় করিয়ে দেন নি। ছেলেটির সঙ্গে দিয়েছেন। কাল বিকেলে এ-বাড়ি ঢুকতে আচমকা এর সঙ্গে দেখা হয়ে গিয়েছিল। মা আসতে মেয়েটি ত্বরিত প্রস্থান করল। তারপর সে আর একে দেখে নি। খুঁজেছে। সন্ধান পায় নি।

নামটা মনে আছে, শীলা শর্মা। সুন্দর নাম। কয়েক মাস আগে সলোমন তাকে প্রথম দেখেছিল। য়ুনিভারসিটির ছাত্র য়ুনিয়নের বাৎসরিক উৎসবে।

একটা আবৃত্তি করেছিল এই মেয়েটি। সুন্দর সতেজ স্বর, উচ্চারণ চমৎকার। খুব ভাব দিয়ে যে কথাগুলি বলেছিল তার কিছুই মনে নেই, শুধু এটুকু মনে আছে, থমথমে নীরবতার মধ্যে সে কথাগুলি বার বার মন্দ্রিত হয়ে উঠেছিল, আর বার বার সলোমন কুচিয়ো নামে একটি নিগ্রো যুবকের দেহে রোমাঞ্চ হয়েছিল। মেয়েটির পবিত্র কুমারী দেহ দীপ্ত করেছিল একখানা গেরুয়া রং-এর শাড়ি, তার সঙ্গে ঘনতর গেরুয়া রং-এর চৌলি; কটিদেশে অনাবৃত দেহাংশ থেকে বেরিয়ে আসছিল নির্মল একটি জ্যোতি। কালো কুন্তল মুক্ত প্রবাহে ছড়িয়ে পড়েছিল পিঠে; হাতে ছিল দু'খানি বালা, গলায় ভারতের সাধুরা যেমনি পরে তেমনি মালা। সেই ভাবগম্ভীর মুখ তার মনে রেখাপাত করেছিল, ভুলে গেলেও একেবারে বিস্মৃতির মধ্যে তলিয়ে যায় নি। তারপর একেবারে হঠাৎ অমনি করে দেখা হবে এই অপরিচিত বাড়ির অতিথি হয়ে প্রথম পদার্পণের অনিশ্চিত মুহূর্তে, সলোমন কি তা কখনো ভেবেছিল? প্রথমে বুঝতে পারে নি, এ-মেয়ে সে-ই! এর সঙ্গে বেশবাসে তার কোন সাদৃশ্য ছিল না। গেরুয়া শাড়ির বদলে হাঁটুর অনেক উঁচুতে তোলা ধবধবে শাদা প্যান্ট, আর শক্ত-আঁটা শাদা জামা। ঘামে-ভেজা কপালে দুরন্ত চুলের ঝটপটানি। হাতে টেনিস র‍্যাকেট, পরিশ্রমে মুখখানা লাল। অনাবৃত নির্লোম সুডোল দু'খানা বাহু; কাঁধের প্রথমাংশ পর্যন্ত উন্মুক্ত। ঝড়ের বেগে সাইকেল থেকে নেমে সে তাকিয়েছিল সলোমনের দিকে, খানিকটা কৌতূহল, খানিকটা ব্রীড়া তার দৃষ্টিতে।

বিস্মিত, স্তম্ভিত হয়েছিল বলেই অমন ব্যাপক দৃষ্টিতে সলোমন তাকে দেখেছিল। আচরণটা বোধ হয় সুভদ্র হয় নি। ভাবতে লজ্জা হয়েছিল পরে, মনকে বুঝিয়েছিল, সুযোগ পেলে মার্জনা চাইবে। সুযোগ পেল না। হয়তো শীলা শর্মা নিজেই তাকে অভদ্র ভেবে সরে দাঁড়িয়েছে, হয়তো মা-বাবা তাকে নিগ্রোর ধারে-কাছে আসতে মানা করেছেন। কোনটাই সলোমনের হৃদয়গ্রাহী নয়, দু'টো চিন্তা একসঙ্গে আক্রমণ করে তার প্রভাতী আত্মসুখ মুহূর্তে হত্যা করল। গান তো থেমে গেলই, মনটা হল পাথরের মতো ভারী। বেঁচে থাকার আস্বাদ ভয়ানক তেতো লাগল।

সেদিনটাও কাটল, কিন্তু সলোমন তার দেখা পেল না। সকালে চা খেতে-খেতে শুকদেব-সুলোচনা তাঁর গানের প্রশংসা করলেন, কিন্তু কথাগুলো কানে গেল না, মনকে খুশী করল না। শুকদেব চলে গেলেন আপিসে, সে

বাগানে একা-একা ইতস্তত বিচরণ করল। এক সময়ে কলেজের বাস এসে ফটকে দাঁড়াল, শীলা তড়িৎ-পদক্ষেপে বাসে গিয়ে বসল, অদূরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সলোমন তার মুখে পরিচয়ের কোন স্বীকৃতি পেল না। বুকের পাথরটার ওজন বাড়ল, মন কেমন দিশেহারা হল। দুপুরে শুকদেব খেতে এলেন, একসঙ্গে আহারান্তে, তাঁর গাড়িতেই সলোমন বেরিয়ে পড়ল। দিনটা কাটাল ঘুরে বেড়িয়ে। বিকেল হতে বসল গিয়ে কনট সার্কাসের একটা প্রেক্ষাগৃহে, খুন-খারাপির ছবি ছিল, তাতেও মনে দাগ কাটল না। যখন বাসস্থানে ফিরল, সন্ধ্যে অনেকক্ষণ উত্তীর্ণ। হাত-মুখ ধুয়ে ডিনারের ডাকের অপেক্ষা করল নিজের ঘরে। ডাক এল, ভালো আহার এল, কিন্তু সে এল না।

রাত্রি অসহ্য লাগল। মধ্যরজনী পেরিয়ে নিদ্রা এল, দুঃস্বপ্নে আক্রান্ত। হঠাৎ জেগে মনে হল পৃথিবীতে সে বড় নিঃসঙ্গ, অবহেলিত। মনে পড়ল বহু দূরের মা-বাবাকে, দু'চোখ জলে ভরে এল। আবার কখন ঘুমিয়ে পড়ল, জেগে দেখল বেলা অনেক এগিয়ে গেছে, শুকদেব চলে গেছেন আপিসে, বাড়ির সামনে তাঁর গাড়ি নেই। চা-খাবার খেয়ে গাছতলায় গিয়ে দাঁড়াল, যদি দেখা হয়। হল না। সারা বাড়িটা নিঃশব্দ, নির্জীব। শুধু পাখিগুলো কিচিরমিচির আলাপ করছে। রাস্তায় চলতি গাড়ির শব্দ, কুকুর ডাকছে পাশের বাড়ি। হঠাৎ মন ঠিক হয়ে গেল। এ-বাড়িতে আর নয়। এ অতিথি-সম্মান দুঃসহ।

সুলোচনা কয়েকটি চিঠি লিখছিলেন, বেয়ারা এসে দাঁড়াল, মেহমান্ সাহেব সেলাম জানাচ্ছেন! বললেন, বসতে বল্, আসছি।

সলোমন বারান্দায় ঘুরে বেড়ালো। একটু পরেই সুলোচনা এলেন।

আপনি বসেন নি যে ঘরে, মিঃ কুচিরো! দাঁড়িয়ে আছেন এমনি করে?

মাপ করবেন, আপনাকে অসময়ে বিরক্ত করছি।

সে কী কথা? আসুন, বসবেন।

আজ্ঞে না। একটা জরুরি কথা আছে।

বলুন।

আমাকে আজই যেতে হচ্ছে।

সে কী! আপনি তো এক সপ্তাহ থাকবেন!

তাই ভেবেছিলাম। কিন্তু হল না। আপনাদের সদয় ব্যবহারে আমি মুগ্ধ হয়েছি। বহুদিন আমার মনে থাকবে।

না, না, ওকথা বলবেন না। কেন আপনি হঠাৎ চলে যাচ্ছেন!

বড় দরকার হয়ে পড়েছে। আমায় মার্জনা করবেন, যদি কোন ত্রুটি হয়ে থাকে।

কী যে বলছেন! ত্রুটি তো আমাদের! তা, আপনি তো এক্ষুনি যাচ্ছেন না!

এক্ষুনি যাচ্ছি।

সে কী!

আজ্ঞে হ্যাঁ। মিঃ শর্মাকে আমার শ্রদ্ধা জানাবেন। আমি তাঁর ব্যবহারে মুগ্ধ হয়েছি।

এক্ষুনি চলে যাবেন? খেয়ে যাবেন না?

সময় নেই। আমি বড় লজ্জা পাচ্ছি। আপনি আমায় মাপ করবেন।

পিটার কাবাকু চুপ করে রইল। চিন্তার ভারে সে আক্রান্ত।

আমার যাবার ব্যবস্থা করে দাও, সামলে নিয়ে মিনতি জানাল সলোমন।

মিঃ শর্মার বাড়িতে কিছু অন্যায় কর নি তো?

অন্যায় করব আমি? তিনদিন তাঁরা আমায় স্বগৃহে স্থান দিয়েছেন। বড় বড় কথা শুনিয়েছেন। ভালো খাইয়েছেন। অথচ বাড়ির মেয়েটিকে আমার ছায়া মাড়াতে দেন নি।

ওঃ, এই কথা! পিটার বিষণ্ণ হাসল: তাতেই তোমার এত অপমান হয়েছে? তুমি গেছ একটি ভারতীয় পরিবারের জীবনযাত্রা দেখতে, তাদের মেয়ের সঙ্গে ভাব জমাতে নয়!

ভাব জমাতে? কে চেয়েছে ভাব জমাতে? কিন্তু কেন আমার ছায়া মাড়াবে না সেই মেয়ে? শুধু এজন্যে যে, আমি নিগ্রো!

না-ও হতে পারে। আর হলেই বা! তাতে তোমার জীবন নষ্ট হয়ে যাবে? দূর দেশে এসেছ লেখাপড়া শিখে মানুষ হতে। তাতে তোমার শুধু নয়, আফ্রিকার উপকার হবে। এরা তোমাকে আদর করে ডেকে এনেছে। বৃত্তি দিয়ে পড়াচ্ছে। থাকবার ব্যবস্থা করে দিয়েছে। একজন উঁচুস্তরের ভদ্রলোক নিমন্ত্রণ করে নিজের বাড়িতে অতিথির সম্মান দিয়েছেন যাতে তুমি এদেশটাকে প্রত্যক্ষ জানবার সুযোগ পাও। এসব বুঝি কিছুই নয়? সবচেয়ে

বড় হল একটি মেয়ের অদর্শন! তুমি কি তাকে না দেখেই তার প্রেমে পড়েছ?

প্রে-মে পড়েছি? আমি?

তাই তো মনে হচ্ছে! শোন, সলোমন কুচিরো, ও কাজটি ক'রো না। যদি করে থাক, চিত্তশুদ্ধি কর। নিগ্রো তার নিজের দেশের মেয়ের কাছে ছাড়া অন্য কোথাও সম্মান পায় না। মন যদি তোমার এত দুর্বল, দূর দেশে এসেছ কেন?

সলোমন মাথা নিচু করে রইল। কই? একথা তো তার মনে হয় নি! প্রেমে পড়েছে! শীলা শর্মার? সেই গেরুয়া-শাড়ি চুল-খোলা দৃপ্তকণ্ঠী মেয়েটি! সেই হাতে-টেনিস-র‍্যাকেট, সাইকেল-চেপে-ছুটে-আসা শীলা শর্মা? যাকে সে দু'বার দেখেছে, দু'টো কথা বলেছে যার সঙ্গে! তাকে সে ভালোবাসে? ভা-লো-বা-সে?

ব্যথার বদলে এ যে আনন্দ! অপমানের বদলে আত্মদানের! অন্ধকার ঘুচে গিয়ে আলো এল কোথা থেকে? মৃগ তার নিজ দেহে কৌস্তরীর সন্ধান পেয়েছে। মনের মধ্যে আবার যে গান বেজে উঠল! জীবন আবার বলল, আমি আছি। আমি থাকব।

সাত

মিঃ কাবাকু!

ঘর্মাক্ত শরীর সোজা করে বাঁ হাতে কপালের ঘাম ঝেড়ে, পিটার কাবাকু তাকাল: বলুন।

আপনি কি মাউ মাউ সমর্থন করেন?

খোলা মাঠ থেকে গরম হাওয়া সতেজ আস্ফালনে বার বার হানা দিচ্ছে। ধুলো উড়িয়ে, খড় উড়িয়ে বর্ধিত স্পর্ধায় আঘাত করছে দরজায়, টানছে মেয়েদের শাড়ি। পিটারের কোমর পর্যন্ত অনাবৃত ঘন-কালো মেহনত-সিক্ত দেহে প্রথম গ্রীষ্মের হাওয়া আরাম আনছে, কিন্তু যে প্রশ্ন করল তাকে করছে বিব্রত। পিটার হাতের কোদাল নামিয়ে, পকেট থেকে রুমাল বার করে মুখের ঘাম মুছল। তারপর স্মিতহাস্যে বলল, এ প্রশ্ন কেন?

এ প্রশ্ন করতে নেই ?

নিশ্চয় আছে। তবে হঠাৎ এ-সময়ে ? কাজের মধ্যে ?

হঠাৎ-ই মনে হল।

কিন্তু এক কথায় আপনাকে জবাব দেওয়া তো সম্ভব নয়।

তাহলে পরে বুঝিয়ে বলবেন।

তখন আপনার কৌতূহল থাকলে।

দিল্লী থেকে কিছু দূরে একখানা গ্রাম। প্রথম গ্রীষ্মের স্পর্শেই সবুজ কমনীয়তা প্রায় নিঃশেষ। দূর-প্রসারিত মাঠগুলিতে গম পাকতে বেশি দেরী নেই, আখের খেত শেষ হয়ে এসেছে। সবুজ গমের খেতে, গাছের সবুজ পাতায় সেই বর্ণহীন ধুলোর আস্তরণ, যা গ্রীষ্মকে ভয়ংকর করে, আর করে বিকৃত, ক্লান্ত। পায়ে পায়ে, গরুর গাড়ির চাকায় পথ যেন ধুলোর স্তূপ; আকাশের নীলে ধুলোর ময়লা পর্দা। এ সময় গ্রামের চেহারা দেখে ভাবা অসম্ভব যে কয়েক মাস পরেই, বর্ষাকালে, রাস্তা ডুবে যাবে জলে, প্রত্যেক ঘরের সামনে জমে উঠবে কাদা, গোবর আর নোংরা জলের কুৎসিত সংমিশ্রণ। জলের প্লাবন আসবে অদূরস্থ এক চিলতে নদী থেকে। সে নদী বর্ষায় উন্মত্ত। কিন্তু শীতে ও গ্রীষ্মে তার শীর্ণ দেহ গ্রামের একপ্রান্তে সরমে সংকুচিত।

১৯৫২ সালের ২রা অক্টোবর মহাত্মা গান্ধীর জন্মদিনে ভারত সরকার গ্রামে যে "নীরব বিপ্লব" আনবার বিরাট উদ্যোগের সূচনা করেন, দিল্লীর কাছাকাছি পাঞ্জাবী এই গ্রামখানা তার আওতায় এসে গেছে। গ্রামবাসী মেয়ে-পুরুষ, ছেলে-ছোকরা সবাই বিস্ময়ে একদিন দেখতে পেল চকচকে মোটর চেপে অচেনা মানুষ গ্রামে এসে উপস্থিত; তারা ঘুরে দেখল গ্রামখানা, পেছনে তাদের ভীড় জমাল ন্যাংটা ছেলে আর নোংরা জামা-পরা মেয়ের দল। নাকে রুমাল চেপে তারা গ্রামের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করল; গ্রামবাসীকে ডেকে রাস্তা-ঘাট, নালা, ডোবা, মাঠ-হাটের খবর নিল। একটি স্কুলও নেই শুনে অবাক হল, একটি কুয়া নেই জেনে দুঃখ পেল। সুঠাম, সবল, সোজা জাট-কৃষকের চোখে-মুখে উত্তেজনার বিজলী জ্বালিয়ে তারা বলে গেল, কয়েক মাসের মধ্যে এ গ্রামের চেহারা বদলে যাবে। নতুন রাস্তা হবে, কুয়া হবে, স্কুল, হাসপাতাল, পশু-চিকিৎসালয় হবে; ছোট ছোট শিল্প গড়ে উঠবে, চাষের জন্যে আসবে বিলিতী খাদ। নদীর বুকে বাঁধ বসবে। বর্ষায় আসবে না আর বন্যা।

আমাদের মাঠ যে যাবে শুকিয়ে?—ভাঙা গলায় খ্যাঁচ করে উঠল এক বুড়ো চাষী।

না হে না, উদার হাসি হাসলেন ধবধবে জামা-পরা, চোখে-কালো-চশমা হিন্দুস্থানী ভদ্রলোক। বর্ষার জল ধরে রাখবার জন্যে একটা রিজারভয়র করা হবে—যাতে সারা বছর তোমরা সেচের জল পেতে পার।

লালচে-চুল সুন্দরী মেয়েটির বিস্মিত চোখে নজর রেখে আর একজন বলল, ভাবছ কি? এক বছরের মধ্যে বিজলী এসে যাবে তোমাদের গ্রামে—রাতের অন্ধকার পালাবে জি. টি. রোড ধরে।

চোখ-ঢাকা ভদ্রলোক সিগারেট টানতে টানতে ভারিক্কী চালে বলল, এক বছরে বিজলী না-ও আসতে পারে, তবে দু'বছরে আসবেই।

প্রায় দু'বছর গড়িয়ে গেল, কিন্তু গ্রামের চেহারা রইল সাবেকী, পরিবর্তনের হাওয়া এল না। শহুরে লোকেদের কথায় গ্রামবাসীর বিশ্বাস কোনদিন পর্যাপ্ত নয়। কালো-কাচে চোখ-ঢাকা মানুষটির কথা গ্রামের লোক ভুলে গেল।

কিন্তু একদিন সভ্যতার কল নড়ল। গাড়ি বোঝাই করে আবার এল শহুরে মানুষ, তাঁবু খাটিয়ে মাপ-জরিপ করল তিন-চারদিন। গ্রামবাসীদের ডেকে সভা করল, সভায় দাঁড়িয়ে বক্তৃতা। তৃতীয় দিনের সন্ধ্যায় দিল্লী থেকে উপস্থিত হলেন একজন মন্ত্রী, সঙ্গে একদল পদস্থ রাজপুরুষ, কয়েকজন সাংবাদিক। গমখেতের পাশে খোলা মাঠে সামিয়ানা-ঢাকা সুসজ্জিত মণ্ডপে মন্ত্রী মহাশয় উচ্চাসনে উপবিষ্ট হলেন, একটি ফুটফুটে মেয়ের হাত থেকে গাঁদা ফুলের মালা সহাস্যে গলায় নিলেন। চারদিকের দশ-পনেরখানা গ্রাম থেকে সমাগত চাষী-খেত-মজুরদের 'ভাই' বলে সম্ভাষণ করে মন্ত্রী বললেন, এ গ্রামকে কেন্দ্র করে গঠনমূলক এক অভিনব বিপ্লবের সূচনা হবে। মহাত্মা গান্ধী যে রামরাজ্যের স্বপ্ন দেখতেন, তার ভিত্তি হল সুখী, সমৃদ্ধ গ্রাম। গ্রামগুলিকে নতুন করে গড়বার যে বিরাট পরিকল্পনা ভারত সরকার হাতে নিয়েছেন তা কার্যকরী হলে ভারতবর্ষের নতুন জন্ম হবে। দিল্লীর সন্নিকটে এই গ্রামখানাকে নতুন করে গড়ে তোলবার যে উদ্যোগ শুরু হচ্ছে, তার সার্থকতা নির্ভর করবে গ্রামবাসীর মুক্তপ্রাণ সহযোগিতায়। অতএব আমি আশা করি—

কাজ একদিন সত্যিই আরম্ভ হল। প্রাচীন গ্রাম ভীমগড় হয়ে উঠল কমিউনিটি ডেভেলপমেণ্টের অন্যতম কেন্দ্র।

পিটার কাবাকু বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়া শেষ করে কমিউনিটি ডেভেলপমেণ্টে কাজ শিখবার বৃত্তি পেয়েছিল। ভীমগড় দিল্লীর কাছে, তাই এখানে সে কর্মক্ষেত্র বেছে নিল।

ভীমগড় ব্লকে কাজ করে একটি মেয়েও। নাম পার্বতী দত্ত। এককালে স্বদেশী করত। এখন গ্রাম-সেবিকা। প্রধানতঃ, মেয়েদের নিয়ে তার কাজ। একটা ছোট স্কুল চালায়। স্ত্রীলোকদের গার্হস্থ্যজীবন সম্বন্ধে সুচারু পরামর্শ দেয়। রোগে সেবা করে। গ্রামের সবাই তাকে ভালোবাসে। সে কিন্তু থাকে নিজের মনে, নিজেকে নিজের সীমানায় অবরুদ্ধ রেখে। চতুর্দিকে তার নীরব রহস্য।

পিটার তাকে দেখে। তার কথা শোনে অন্যের কাছে। দুজন দুজনকে চেনে। জানে না।

গ্রামের নতুন-রূপ আনবার কেতাবদুরস্ত পথ নির্মাতারা বেছে নিল। গ্রামবাসীকে অন্ধকার হতে আলোয় আনতে হলে আগে চাই স্কুল। স্কুলের আগে বাড়ি। তাই সর্বাগ্রে বাড়ি উঠল। কাজের সন্ধান পেয়ে বেকার গ্রামবাসী খুশী হল, কিন্তু স্কুলে তেমন ছাত্র এল না। স্কুল শেষ হলে উঠল হাসপাতালের বাড়ি; বাড়ি শেষ হবার তিন মাস পর এল ঔষধপত্র, ছ' মাস পরে ডাক্তার। তারপর এল বর্ষা। শীর্ণ, সংকুচিত ভ্যঁয়রো নদী হঠাৎ ফেঁপে-ফুলে কুপিত হয়ে বিভীষিকার রূপে ধেয়ে এল ভীমগড়ের দিকে; রাস্তা ডুবল, মাঠ ডুবল, স্কুল ঘরের মেঝে ডুবল, হাসপাতালের ভিত ধসে গেল, চাষীর ঘরের দাওয়া পর্যন্ত জল উঠল। নতুন গ্রাম তৈরির কারিগররা দিল্লী ফিরল। রইল শুধু পার্বতী দত্ত।

বর্ষার জল নেমে গেলে, কাদা শুকলে, আবার কাজ শুরু হল। পিটার কাবাকু এল এ সময় ভীমগড়ে সরকারী কর্মীদের সঙ্গে। গ্রামে এসে একটি নিবিড় সুখানুভূতি তার অন্তর স্পর্শ করল। শুধু নিগ্রো বলে এখানে তাকে দেখে কারুর নাসিকা কুঞ্চিত হয় না। তার বিদেশী চেহারা গ্রামবাসীর কৌতূহল জাগায়; ছেলেমেয়েরা তার চতুর্দিকে ভীড় করে, আখের বোঝা নিয়ে

নিতম্ব দোলাতে দোলাতে চলতি যুবতী তাকে দেখে থমকে দাঁড়ায়। জোয়ান মরদরা এগিয়ে এসে আলাপ করে; বুড়োরা দূর থেকে নজর রাখে তার ওপর। কিন্তু যে-উপেক্ষা শহরে পিটারকে সংকুচিত করে, গ্রামে তা অনুপস্থিত। পিটারের ভয় ছিল, তাই খুশী হয়ে দেখল ভারতের গ্রামবাসী তাকে সহজে গ্রহণ করেছে। এদের ব্যবহারে নকল নেই, দৃষ্টিতে কৃত্রিমতা নেই, কথাবার্তায় সযত্নে আয়ত্ব পালিশ নেই। কোন কিছুকেই এরা সহজে মানতে চায় না; মন এদের অতীতে বাঁধা; কিন্তু পরিবর্তনের পরিপন্থী নয়। পিটার বুঝল, এ জমিতে আবাদ করলে সোনা ফলবে। তার সামান্য হিন্দী নিয়েই গ্রামের পুরুষদের সঙ্গে বন্ধুত্ব গড়তে সে লেগে গেল।

এক বুড়ো চাষীর বাড়ীর বাইরে সরু রাস্তার উপর চারপাই পেতে গুটি সাতেক পুরুষ আলাপ জমিয়েছিল। পিটার এসে দাঁড়াতে, তারা প্রথম তাকাল নিবিষ্ট কৌতূহলে, তারপর একজন চারপায়ের প্রান্ত দেখিয়ে বলল, বসুন।

খুশী হয়ে পিটার বসল।

ভাঙা হিন্দী যথাসাধ্য জোড়া লাগিয়ে কথাবার্তা শুরু করল। গ্রামের লোকেরা, সে বুঝল, সহজে শহুরে মানুষদের কাছে মন খুলতে চায় না। প্রশ্ন করলে জবাব দেয়, কিন্তু নিজে থেকে কিছু বলতে চায় না।

কিন্তু পিটারকে নিয়ে তাদের কৌতূহল অসীম। আত্ম-পরিচয় দিতে হল বহু প্রশ্নের উত্তরে। সে যখন বলল, আমি এসেছি আফ্রিকা থেকে, চাষীরা পরস্পরের মুখ-চাওয়া-চাওয়ি করল! একজন, যে পল্টনে কাজ করেছে, বলল, সে তো অনেক দূরের দেশ!

হ্যাঁ। আপনি কি করে জানলেন?

পিকচার দেখেছি আমি আফ্রিকার। যুদ্ধের সময় আপনাদের দেশের সৈন্যও দেখেছি কোহিমায়।

ওরা আমাদের দেশের নয়। আমেরিকার।

আপনার মতোই কালো।

ওরাও নিগ্রো। সব নিগ্রোই কালো।

পিটার বলল, তার দেশে মানুষের বড় দুঃখ। ভারত আজাদী পেয়েছে। তারা এখনো পরাধীন। চাষীর জমি নেই, অন্ন জোটে না। শিক্ষা নেই, স্বাস্থ্য নেই। শাদা মানুষ—ইংরেজ—তাদের মানুষ বলে মনে করতে চায় না। শাদা

মানুষের সঙ্গে তারা একসঙ্গে দোকান করতে পারে না, পোষ্ট-আপিসে তাদের জন্য আলাদা দরজা। শাদা মানুষের সঙ্গে এক সিনেমায় তারা যেতে পারে না, এক পার্কে বসতে পারে না, এক পুকুরে স্নান করতে পারে না। বলতে বলতে পিটার বুঝল দুঃখের, লাঞ্ছনার, অপমান ও অত্যাচারের সূতোগুলি তাকে বাঁধছে ওদের সঙ্গে অলক্ষ্য সহানুভূতির বন্ধনে। পিটার ও গ্রামের মানুষদের মধ্যে ব্যথার সেতুর গোড়াপত্তন হল।

বিরাট হুঁকোয় প্রকাণ্ড কলকেতে তামাক পুড়ছিল। একে একে সবাই লম্বা নল মুখে লাগিয়েঁ তামাক টানছে। নলটা ঘুরতে ঘুরতে পিটারের কাছে এলে সেও টানল। কড়া তামাকের ঝাঁঝে প্রথম একচোট কাশল, তারপর দিব্যি টেনে চলল।

আমরাও এমনি করেই গ্রামে বসে তামাক খাই। আরও বড় দল পাকিয়ে আমরা বসি।

আপনি ভারতে এসেছেন কেন? প্রশ্ন করল পল্টন-ফেরৎ রামদাস।

লেখাপড়া শিখতে।

আর এই ভীমগড়ে?

ভারতের গ্রাম দেখতে। আপনাদের জানতে।

আমাদের গ্রামে তো কিছু নেই।

আপনারা আছেন।

সবচেয়ে বয়োবৃদ্ধ চাষী গলার কর্কশ আওয়াজে পর্বতপ্রমাণ তাচ্ছিল্যের ব্যঞ্জনা আনল: বাবুজি, আমরা কিছুই নই।

আপনারাই সব, পিটার আস্তে আস্তে নিবেদন করল।—একশো জনের মধ্যে সত্তরজন ভারতবাসী গ্রামে বাস করে। গ্রামই তো ভারতবর্ষের প্রাণ। আমাদের দেশেও তাই। একশো জন মানুষের মধ্যে নব্বুইজন বাস করে গ্রামে। আপনাদের অনেক বড় বড় শহর আছে। আমাদের দেশে তা নয়। শহর খুব কম। তাই আমরা প্রায় সবাই গ্রামের লোক। আমরা শহুরে লোক নই।

বুড়ো চাষী লক্ষ্মণ স্তিমিত চোখে পিটার কাবাকুকে দেখছিল। কালো মজবুত চেহারা, কপালে নীল শিরা ফুটে উঠেছে, থ্যাবড়া নাকের নিচে মোটা ঠোঁট আর চকচকে শাদা দাঁত। নিস্তেজ চোখ ফিরিয়ে লক্ষ্মণ চারপাশের মানুষগুলিকে দেখল। খুঁজল যেন "ভারতবর্ষের প্রাণ"। দেখল, পচা নর্দমায়

ভিড় করেছে লাইন-বাঁধা বাড়িগুলির পরিত্যক্ত দৈনন্দিন জঞ্জাল, মাছি, মশা, মরা ইঁদুর। কিছু দূরে প্রায়-উলঙ্গ ছেলেমেয়েদের দল ধুলো আর ইটের টুকরো নিয়ে খেলা সাজিয়েছে; শৈশবে ওদের আর কিছু পাওনা নেই। মুখখানা কাপড়ে ঢেকে চাষী-বৌ ঘড়া নিয়ে জল আনতে যাচ্ছে এক মাইল দূরের বিশীর্ণা নদীতে, জলের সঙ্গে নিয়ে আসবে মাটি আর অসংখ্য রোগের বীজাণু। পাশের মাটির দেওয়াল ভেদ করে যে মানুষটার আর্ত গোঙানি বেরিয়ে আসছে, পনের দিন সে জ্বরে ভুগছে, যে দাওয়াই আসছে নতুন হাসপাতাল থেকে, তাতে তার বিমার সারছে না।

কর্কশ গলায় বুড়ো আবার বলল, গ্রামে কিছু নেই। সব শহরে।

শরতের সুদীর্ঘ গোধূলি। মাঠের শেষপ্রান্তে আকাশের প্রণতি। নীল আকাশ সবুজ শস্যক্ষেত্রের পায়ে লুটিয়ে পড়েছে। খেতের মাঝে মাঝে সরু পথে পিটার চলছে এগিয়ে। "গ্রামে কিছু নেই। সব শহরে।" বুড়ো লক্ষ্মণ ঠিক বলেছে। রাস্তা, যানবাহন, বিদ্যায়তন, হাসপাতাল, জীবনের সব জৌলুস, চাকচিক্য—শহরে। কিন্তু তবু গ্রাম নিঃস্ব নয়। না এখানে, না আফ্রিকায়। গ্রাম নিরাবরণ, নিরাভরণ, কিন্তু দরিদ্র নয়। আমি এখানে এসে প্রথম পেলাম মানুষের সম্মান। পেলাম নিতান্ত স্বাভাবিকভাবে। এরা আমায় নিগ্রো বলে, আমার গায়ের চামড়া কালো বলে, ঘৃণা করল না। বরং, নিজের দেশের শহুরে মানুষদের চেয়ে আমাকে একটু আপন করে গ্রহণ করল। আমার দেশের পরাধীনতার জ্বালা, মনে হল, এদের হৃদয় স্পর্শ করেছে। আমি যে অজানা দূরদেশ থেকে এদের মধ্যে এসেছি তাতে এরা উত্তেজিত। আমি ওদের সঙ্গে আহার করি, তাতে ওরা খুশী। আমি ওদের ছেলেদের সঙ্গে খেলি, তাতে ওদের আনন্দ। আমার কাছে কিনিয়ার কাহিনী শুনতে ওদের উৎসাহ।

মাঠের পথে চলতে চলতে পিটার যেন ভুলে গেল সে কিনিয়ায় নয়। চোখের সামনে ভেসে উঠল তার নিজের গ্রাম্য শস্যক্ষেত্র, যেখানে কাজ করে ওয়াচিরা, ফসল তোলে। আজও হয়তো এ সময় মাঠে বসে পিটারের পথ চেয়ে তাকিয়ে আছে ওয়াচিরা, যেখানে আকাশ নেমেছে মাঠের বুকে।

একটা পাখী উড়ে গেল পিটারের মাথার উপর। মনের ভাবনা পালাল, নেমে এল অজানা আতঙ্কের ছায়া। তাকিয়ে দেখল পাখীটিকে, শকুনি। দুরু

দুরু কাঁপল বুক। এ কী অমঙ্গলের নিশানা! দেশ থেকে খবর আসে না নিয়মমত।' মাউ মাউ বিদ্রোহের আগুন ছড়িয়ে পড়েছে কিনিয়ার গভীরে। ইংরেজের প্রতিশোধ দিন দিন আরও ভয়ঙ্কর রূপ নিচ্ছে। ছ' মাস আগেও তার গ্রাম হিংসার আগুন থেকে দূরে ছিল, কিন্তু বেশিদিন আর থাকবে না। হয়তো এখনই নেই। মোচড় দিয়ে ব্যথিয়ে উঠল পিটারের প্রাণ। আপন জনের, আপন দেশের স্পর্শের জন্য কাতর হল। আমি বহুদূরে অচেনা অজানা গ্রামের মাঠে ঘুরে বেড়াচ্ছি, আর আমার ওয়াচিরা, বাবা, মায়তো, আমার এন্‌গাথা, আমার মাগৈথা, আমার ভাই-বোন, জ্ঞাতি-বন্ধু সবাই বুঝি পুড়ে ছাই হয়ে গেল হিংসা-প্রতিহিংসার আগুনে! আমি কিসের সন্ধানে ঘুরে মরছি—কোন্ অমৃত পথের? যদি সব জ্বলে যায়, সবাই পুড়ে যায়, কাকে নিয়ে আমি নতুন গড়ব? কি হবে স্বাধীন, সতেজ, স্বকীয় কিনিয়ায়, যদি না সেখানে দেখতে পাই ওয়াচিরার হাসি, যদি আমার হাত ধরে না চলে আমার ছেলে এন্‌গাথা, যদি আমার মেয়েকে আমি চুমু না দিতে পারি? সে কিনিয়ায় আমার কি হবে, যেখানে আমার বাবা নেই, মা নেই, স্ত্রী-সন্তান-বন্ধু-আত্মীয় কেউ নেই?

শকুনটা উড়ে গিয়ে বসেছে গাছের ডালে। শ্লথগতি পিটার বোবা-চোখে পাখীটাকে পরীক্ষা করতে লাগল। আচমকা মাঠ থেকে বেরিয়ে এল উলঙ্গ একটি ছেলে, পেট মোটা, হাত-পা সরু সরু, চোখ দুটো আশ্চর্যরকম চকচকে। মাথা কামান, নাক দিয়ে সর্দি ঝরছে। পিটারকে দেখে ছেলেটা থমকে দাঁড়াল, পিটার হাসতে, ফিক করে হেসে ফেলল। মাঠে কি করছিল ছেলেটা?—পিটার নিজের মনে প্রশ্ন করল; হয়তো বাপকে খুঁজতে এসেছিল। এন্‌গাথা হয়তো এমনি করে মাকে, দাদুকে খুঁজে বেড়ায় মাঠে মাঠে, মেঠো পাখীর পেছনে ছোটে, গ্রামের ছেলেদের সঙ্গে খেলা করে…

মাঠের রাস্তা শেষ হয়েছে নদীর পারে। শীর্ণ, বিনম্র নদী, ভ্যঁয়রো। বেঁকে গেছে চাষীর হাতের কাস্তের মতো। দুই তীরে অনেকখানি শুকনো বালুভূমি, মাঝখানে সাপের মতো বাঁকা সরু নদী। স্রোত প্রায় নেই বললে হয়, জল যা নড়ছে, বুঝি শুধু হাওয়ার আদরে। নদীর ওপারে, বালুতট পেরিয়ে, আবার মাঠ। এ পারে কয়েকটি চাষী-বৌ ভীড় করেছে, কাপড় কাচছে, ভরছে ঘড়ায় পানীয় জল।

পিটার কাবাকু এগিয়ে চলল পাড় ধরে। মন উদাস, কোন চিন্তা দানা

বাঁধছে না, অলস নিরুদ্দেশ পায়ে-হাঁটা এগিয়ে চলার মধ্যে এলোমেলো মন এলোমেলো চিন্তার জট পাকাচ্ছে। দিল্লী শহর কাছে, কিন্তু তবু যেন অনেক দূরে: আশ্চর্য ভারতবর্ষের এই শহর-গ্রামের দুস্তর ব্যবধান, যা আফ্রিকায় নেই। দিল্লী থেকে কুড়ি মাইল মাত্র দূরত্ব, কিন্তু তারই মধ্যে যুগযুগান্তের ব্যবধান। শুধু বাস্তব ব্যবধান নয়, মনেরও। দিল্লীর রাজপথে বিরাট অট্টালিকার মালা, রাস্তায় হাল-ফ্যাসানের মোটর গাড়ি। মেয়েরা ফ্যাসনে পশ্চিমের সঙ্গে পাল্লা দিয়েছে। আর এই সামান্য দূরের গ্রামে গরুর গাড়ির যুগ অপ্রতিহত রাজত্ব করছে। এদেশের শহুরে মানুষরা 'গ্রামের কথা অনেক বলে, ভাবে কম; প্রবন্ধ লেখে, বিতর্কে যোগ দেয়, গ্রামকে গ্রহণ করে না। ভাগ্যিস্—কিনিয়ায় গ্রামে-শহরে এই বিভেদ গড়ে ওঠে নি! আমরা আফ্রিকার কালো মাটির কালো মানুষ, অরণ্যের আদিমতা আমাদের আছে, শহরের কৃত্রিমতা নেই। শহর গড়েছে পরদেশী শাসক—ব্যবসায়, বিলাসের জন্যে। আমরা আছি মনে-প্রাণে আমাদের গ্রামে। একদিন আমরা যখন শহর গড়ব, ভারতবর্ষের এ ভুল আমাদের এড়িয়ে চলতে হবে। আমরা শহরের মধ্যে গ্রাম আনব, গ্রামকে শহরের পোষাক পরাব। শহর ও গ্রামকে একেবারে আলাদা করে, শহরকে উচ্চাসনে বসিয়ে, গ্রামকে অপাংক্তেয় করব না।

চিন্তায় বাধা পড়ল। পিটার দেখতে পেল খানিক দূরে গাছের ছায়ায় বসে আছে একটি মেয়ে। চেয়ে আছে বিশীর্ণা ভঁয়রোর দিকে, হাওয়ায় দুলছে শাড়ির আঁচল, উড়ছে মাথার চুল। এ মেয়েটি তো সেই পার্বতী দত্ত, গ্রাম-সেবিকা! সে কেন গ্রাম থেকে এত দূরে নির্জন নদীতীরে? পিটারের সঙ্গে এর মধ্যে এক-আধটু আলাপ হয়েছে মেয়েটির; শুধু কাজের মধ্যে। পরিচয় এগোয় নি। বর্ষার প্লাবনে শহুরে কর্মীরা যখন সবাই পালিয়েছিল, এই মেয়েটি যায় নি গ্রাম ছেড়ে; গ্রামের একটি কুটিরে বাসা নিয়েছিল, চাষীর ভাগ্য নিজের ভাগ্য মেনেছিল। মেয়েটি সম্বন্ধে পিটারের কৌতূহল প্রচুর, আলাপ করবার ইচ্ছা প্রবল। অথচ এই নির্জন পরিবেশে ওর কাছে এগিয়ে যেতে পিটারের মন রাজী হল না। হয়তো নির্জনতার সন্ধানে মেয়েটি এসেছে নদীতীরের বহুদূর ব্যবধানে, এখানে অন্য কারুর অনুপ্রবেশ অবাঞ্ছনীয়। হয়তো নিগ্রো একটি পুরুষের বন্ধুত্বের আগ্রহ কদর্য অর্থ নিয়ে মেয়েটিকে আঘাত করবে! দ্বিধাজড়িত ইচ্ছা বহন করেই পিটার দেখতে পেল পার্বতীর

কাছাকাছি পৌঁছে গেছে। গতিরোধ করে অন্যদিকে পা বাড়াবার উদ্যোগ করতে, পার্বতীর আহ্বান শুনতে পেল :

মিঃ কাবাকু যে! নমস্তে।

নমস্তে।

আপনি কি করছেন নদীর পারে একা একা?

বেড়াচ্ছি। আপনি?

আমি? আমি প্রায়ই এখানে এসে থাকি। এ জায়গাটা বড় সুন্দর।

খুব।

আসুন, বসুন।

নিজের কাছাকাছি মাটির উপর স্থান নির্দেশ করল পার্বতী।

পিটার বসল।—ধন্যবাদ।

কেমন লাগছে এখানে আপনার, মিঃ কাবাকু?

ভালো। শহর থেকে অনেক ভালো।

কেন ভালো লাগছে বলুন তো!

জীবন এখানে সহজ, শান্ত। নকলের দৌরাত্ম্য নেই। নিগ্রো আমি, শহরে যেন কেমন লুকিয়ে থাকতে ইচ্ছে করে। এখানে আত্মপ্রকাশে বাধা নেই।

প্রজেক্টের কাজে আপনার কিছু লাভ হচ্ছে?

হচ্ছে বৈকি? আপনাদের মতো আমাদেরও আসল সমস্যা গ্রাম। কিনিয়া যখন স্বাধীন হবে, তখন প্রথম কাজ হবে গ্রামগুলিকে নতুন করে গড়া। আমি দেখতে চাই এ সমস্যার কি সমাধান আপনারা করছেন। আপনাদের সার্থকতা আমাদের পথ দেখাবে।

আর আমাদের ব্যর্থতা?

আমাদের সাবধান করবে। অন্য পথের সন্ধান করাবে।

ক'বছর আপনি ভারতে আছেন, মিঃ কাবাকু?

চার বছর হয়ে গেছে।

দেখেছেন দেশটাকে?

কিছু দেখেছি। বিরাট আপনাদের দেশ। বিরাট আর বিচিত্র। সারা জীবন ধরে দেখলেও এর পরিচয় পাওয়া যায় না।

ধৈর্য এখনো আপনার আছে তাহলে?

মিস্ দত্ত, আমি এসেছিলাম বিদ্যা-অর্জনে, কিনিয়ার জন্যে ভারতের শুভেচ্ছা সংগ্রহে, আর আপনারা যে-পথে স্বরাজ পেয়েছেন সে পথের সন্ধানে। ইতিমধ্যে কিনিয়ায় জ্বলে উঠল বিদ্রোহের আগুন। দেশে ফেরার পথ বন্ধ হল। ইংরেজ ভাবছে আমি ভারতবর্ষ থেকে কিনিয়ার আগুনে ইন্ধন যোগাচ্ছি। তা তো নয়! আমি ভারতবর্ষে সে জিনিসের সন্ধান করছি যাতে স্বাধীনতার পথ আগুন এড়িয়ে চলতে পারে। আর শিখছি, কেমন করে স্বরাজকে গঠন করছেন আপনারা।

শিক্ষা কতদূর এগোল—একটু হেসে প্রশ্ন করল পার্বতী।

এ প্রশ্নই তো বার বার আমি নিজেকে করছি। উত্তর ঠিকমতো পাচ্ছি না।

কেন পাচ্ছেন না?

বোধ হয় এ জন্যে যে আপনারা একসঙ্গে অনেক কিছু অনেক প্রথায় অনেক পথে করতে চাইছেন। তার মধ্যে কোন সমন্বয় নেই। হয়তো গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় এ হতে বাধ্য। কিন্তু আমি যেন কিছুর নাগাল পাচ্ছি না। যখন মনে হয়, একটা স্থির পথের সন্ধান পেয়েছি, তখনই অন্যকিছু এসে তা তছনছ করে দেয়। ভারতবর্ষ যে কি চায়, কোন্ পথে যেতে চায় তার পাকা হিসেব আপনারাই জানেন না, আমি জানব কি করে?

পার্বতী চুপ করে গেল। ইচ্ছে করেই যেন সে এ-প্রসঙ্গকে বাড়তে দিল না। দুজনের হঠাৎ নীরবতা স্পন্দিত হল মেঠো পাখীর ডাকে।

এবার আপনাকে দু'-একটা প্রশ্ন করি, মিস্ দত্ত? নীরবতা ভাঙল পিটার।

করুন।

আপনি তো স্বাধীনতার লড়াইয়ে বেশ বড় অংশ নিয়েছিলেন, না?

এই প্রকাণ্ড মিথ্যে কথাটা কোথায় শুনলেন আপনি?—একটু হেসে বলল পার্বতী।

শুনেছি, আপনি কোন এক লাট সাহেবকে গুলি করেছিলেন!

সেটা বুঝি খুব বড় কাজ হল?

আপনার ফাঁসির হুকুম হয়েছিল, এবং নিতান্ত কমবয়সী কুমারী বলেই আপনি মরেন নি, শুধু যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হয়েছিল আপনার!

আমার জীবন-কাহিনী কে আপনাকে শোনাল, বলুন তো!

এসব কথা তো সবাই জানে।

তাহলে আর জিজ্ঞেস করা কেন ?

আমার প্রশ্ন অন্য। আমি জানতে চাই, গান্ধীর যুগে জন্মেও আপনি হিংসার পথে কেন গিয়েছিলেন ? আর একটা প্রশ্ন আছে। স্বাধীনতার আগে স্বদেশ নিয়ে আপনাদের যে আশা, স্বপ্ন, আদর্শবাদ ছিল, তার কতটুকু আপনার কাছে পূর্ণ হয়েছে বলে মনে হয় ?

পার্বতী তাকিয়ে দেখল পিটার কাবাকুকে। নিজে সে সুশ্রী নয়। শ্রীর দৈন্য বয়সের সঙ্গে মেদ-সংযোগে আরও প্রকট হয়েছে। কিন্তু সামনে যে মানুষটা বসে আছে সে যেন কুরূপের প্রতিমূর্তি। তথাপি, তার চোখে জ্বলন্ত ক্ষুধা; কপালে গভীর চিন্তা দাগ কেটেছে, কথাবার্তায় সন্ধানী মানুষের ব্যাকুলতা। কাবাকুর চোখ পার্বতীকে দহন করল। এ দহন বহুদিন সে অনুভব করে নি। বহু আগে, এক বিস্মৃতপ্রায় রূপকথার অতীতে, যখন প্রত্যেক ইংরেজ-বিরোধী ভারতবাসীকেই বীর মনে হত,—এ দহন পার্বতী বার বার অনুভব করেছে তার দলের নেতাদের সান্নিধ্যে। আদর্শের দহন। বড় কিছু অনুসন্ধানের দহন। এমন আগুন যা মানুষের সত্তাকে পুড়িয়ে সোনা করে, যার তাপ ছড়িয়ে পড়ে আশেপাশে, দূরে। এ আগুন একদিন ভারতবর্ষের অনেককে সোনা করেছিল। যে আগুন একদিন পার্বতীকে জ্বালিয়েছিল, আজ যা নির্বাপিত, তারই একটা ঝিলিক সে দেখতে পেল পার্শ্ববর্তী বিদেশীর চোখে।

আমার প্রশ্নের উত্তর দিলেন না ?

আজ নয়।

বেশ তো। আর একদিন।

আপনার কথা, কিনিয়ার কথাও, আমার অনেক শোনবার আছে।

বলতে পেলে খুশী হব।

এদেশে বন্ধুবান্ধব হয়েছে আপনার ?

পরিচিত তো আছেন অনেকেই। বন্ধুও আছেন দু-চারজন।

সামাজিকতায় আমরা খুব একটা উদার নই, মিঃ কাবাকু। তা নিশ্চয় এতদিনে আপনি জানতে পেরেছেন।

সবাই আপনারা উদার নন। কিন্তু কেউ কেউ বেশ উদার। এ দেশটা, তাই বলছিলাম, বড় অমিলের দেশ!

আশা করি আমাদের সংকীর্ণতা আপনাকে খুব আঘাত করে নি।

আপনাদের ব্যর্থতা দিয়েই আপনাদের বিচার করবার বয়স আমার অনেক-দিন পেরিয়ে গেছে, মিস্ দত্ত। ভারতবর্ষ আমাকে আঘাত করে নি বললে অসত্যভাষণ হবে, কিন্তু শুধু আঘাতই করেছে বললে অকৃতজ্ঞ, মিথ্যা নিন্দা হবে।

পার্বতী একটু চুপ করে ভাবল। তারপর হঠাৎ বলল ঃ

আচ্ছা, মিঃ কাবাকু, আপনার কি মনে হয় এই নদীটা দেখে ?

মনে হয়, ভাগ্যিস এটা ছিল, তাই নদীতীর আছে, এবং তাই আপনি এখানে এসে বসতে ভালোবাসেন।

অর্থাৎ আপনার কিছুই মনে হয় না। কিন্তু আমার যে অনেক কথা মনে হয়। বর্ষায় আমি এর ভয়ানক রূপ দেখেছি। এই সরু কাস্তের মতো বাঁকা নদীর সে কী প্রচণ্ড সংহারী মূর্তি ? কোথা থেকে আসে এই প্রাণের প্লাবন, আবার কোথায় যায় নিঃশেষে ফুরিয়ে ? বোধ হয়, মানুষের, একটা গোটা দেশের, জীবনেও এমনি হয়ে থাকে। একদিন যা শুরু সামান্য ক্ষীণ ধারায়, অন্যদিন তা প্রাণ-প্রাচুর্যে, প্রবল বন্যায় দিগন্ত*পরিব্যাপ্ত ; আবার একদিন ক্ষীণ-ম্লান তার বিষণ্ণ পরিণতি !

জীবনকে বোধ হয় এ জন্যেই নদীর সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। সে বাড়ে-কমে, কিন্তু সর্বদাই চলে।

দর্শনচর্চা হয়ে যাচ্ছে, না ? জানেন নদীটার কথা মনে হলেই আমার ভীমগড়ের কথা মনে হয়। আমরা এসেছি এ গ্রামটাকে নতুন করে গড়তে, না ? তাই, মুখস্থ পাঠ অনুসরণ করে, আমরা আগে বানালাম স্কুল, তারপর হাসপাতাল। কিন্তু এই নদীর কথা কেউ ভেবে দেখলাম না। অথচ ভ্যঁয়রোকে বাগে না আনলে, এ গ্রাম, বা চারদিকের কোন গ্রাম, সুদিনের মুখ দেখবে না। ভ্যঁয়রো আমাদের সব প্রচেষ্টার ওপর বিদ্রূপ-দৃষ্টি হানবে সারা বছর, তারপর এক বর্ষায় হাজার দৈত্যের বল নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়বে ধ্বংসের নিশান উড়িয়ে। সুতরাং এ গ্রামাঞ্চলের উন্নতি নির্ভর করবে ভ্যঁয়রো-শাসনে।

আপনি ঠিক বলছেন বলেই তো মনে হচ্ছে।

অথচ এ কথাটা আমাদের কর্মীরা, তাঁদের উপরিওয়ালারা, মানছেন না। আমি এ নিয়ে অনেক তর্ক করেছি, দিল্লীতে বার বার দরবার করেছি। মন্ত্রী-মশায় বাবার বন্ধু, তাঁকেও বলেছি। ডাকসাইটে এঞ্জিনীয়ররা তাঁকে বুঝিয়েছেন এ ছোট নদী নিয়ে মাথা ঘামাবার দরকার নেই ; কয়েক বছরের মধ্যে বন্যার

উৎস যে বড় নদী, তাকে লক্ষ লক্ষ টাকা দিয়ে বাঁধা হবে, তখন ভাঁয়রোর মতো দশ-বারোটি শাখা নদীর বিষদাঁত যাবে ভেঙে। সুতরাং যতদিন সে বিরাট পরিকল্পনা কার্যকরী না হয়, ততদিন ভীমগড় ও চারদিকের গ্রামগুলি প্রত্যেক বর্ষায় ডুববে। আর ডুববে আমাদের সবটুকু উন্নয়ন-প্রচেষ্টা।

কিন্তু এঞ্জিনীয়রদের কথাটাও তো ঠিক মনে হচ্ছে। দশ-বারোটা নদী বাঁধতে গেলে খরচ হবে অনেক। তা ছাড়া বড় নদীর বাঁধ শেষ হলে, এ খরচটা নেহাত অপচয়।

আপনিও তাই ভাবছেন? প্রথম কথা, খরচ কেন হবে বেশি? গ্রামের লোকদের বোঝাতে পারলে তারাই এগিয়ে এসে নদীতে বাঁধ লাগাবে। যদি বুঝতে পারে তাদের ভালো হবে, অলস মাসগুলি প্রাণ দিয়ে তারা পরিশ্রম করবে। এ বাঁধ বানাতে একগাদা সিমেন্ট আর লোহা নাই-বা ব্যবহার হল, হোক না মাটি, গাছের গুঁড়ি, বাঁশের তৈরি এই বাঁধ। অল্প খরচে দু'-চারটে জল ধরে রাখার মাঝারি সাইজের ট্যাংকও তো আমরা বানাতে পারি। চাষীকে তাহলে গ্রীষ্মকালে সেচের জলের অভাবে শুকনো মাঠে মাথা খুঁড়তে হবে না! তারপর যখন বড় নদীতে বাঁধ পড়বে, তখন হলই না এই ছোট বাঁধের কাজ শেষ? হাজার হাজার গ্রামবাসীদের কয়েক বছর বন্যা থেকে বাঁচিয়ে যে মঙ্গল সে করবে, তার দাম কি সামান্য?

কিন্তু একটা কথা আপনি ভেবে দেখছেন না, মিস্ দত্ত। বন্যা আসে বড় নদী থেকে। কোন্ বছর সে কতটা প্রবল হবে, কেউ তা বলতে পারে না। আপনি অনেক শ্রম করে যে বাঁধ তৈরি করলেন, পরের বর্ষায় প্লাবন এমন হতে পারে যে তার প্রতিরোধ হবে সামান্য। সেজন্যেই এঞ্জিনীয়ররা নদীতে বাঁধ দেবার সময় নদীর উৎস থেকে কাজ শুরু করেন।

মানলাম। কিন্তু কবে সেই বড় নদীতে বাঁধ হবে, লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে বিরাট কিছু একটা তৈরি হবে, ততদিন এইসব গ্রামের লোকগুলি নিতান্ত নিঃসহায়ে প্রতি বছর এই সামান্য নদীটার ভয়ংকর ধ্বংসলীলার তাণ্ডব সহ্য করবে, সারা বছর ধরে আমরা যে যা তৈরি করব বর্ষার বন্যায় তো যাবে ভেসে, এটাই কি আপনি উচিত বলে মনে করেন? আপনি বিদেশী, আপনার সঙ্গে এই সামান্য ব্যাপারটা নিয়ে তর্ক করা হয়তো আমার উচিত হচ্ছে না। কিন্তু আপনি দরদী মন নিয়ে এ গ্রামে কাজ করতে এসেছেন, অন্য

কারুর চশমা দিয়ে এ সমস্যাটা আপনি বিচার করবেন না। বছরে ছ'মাস গ্রামের লোকের হাতে কাজ নেই, বা যেটুকু কাজ আছে তাতে পেট ভরে না। আমরা স্কুল করেছি, হাসপাতাল করেছি, তেলের ঘানি, আখের রস তৈরির কল এবং তাঁত বসাচ্ছি; কিন্তু সবই করছি 'আমরা', এতে গ্রামের লোকেদের কোন সক্রিয় উদ্যোগ নেই; এর কোনটাই তাদের সৃষ্টি হবে না। ওরা হাত পেতে গ্রহণ করবে, তৈরি করার আনন্দ পাবে না। গ্রামের মানুষকে নতুন জীবনের আস্বাদ দেওয়ার প্রকৃষ্ট পথ এ নয়। এই নদীটাকে গ্রামের লোকেরা দুশমন মনে করে। ওরা চিরদিন এর অত্যাচারের কাছে মাথা পেতেছে। ওরাই যে একে শাসন করতে পারে আজ তা ভাবতে পারছে না। যখন দেখবে ওদের শক্তি নদীটার চেয়ে বড়, কতখানি আত্ম-বিশ্বাস হবে ওদের বলুন দেখি? কয়েক বছরের হিসেব নিলে বোঝা যাবে বন্যার জল সচরাচর কতখানি প্রবল। সেইমতো বাঁধ দেওয়া যেতে পারে। যদি দুর্ভাগ্যবশত একবছর বন্যা অসম্ভব বেশি হয়, গ্রামগুলির দুর্ভাগ্য বর্তমানে যা, তার চেয়ে বেশি হবে না। কিন্তু সাধারণ বন্যাকে নিজের হাতে রুখবার যে আনন্দ ওরা পাবে, যে শক্তির সন্ধান পাবে, তাতে হয়তো ওদের প্রাচীন ঔদাসীন্যের আবরণ খুলে পড়বে, ওরা হয়তো সত্যিকারের সৃজনশীল উৎসাহ নিয়ে গ্রাম-সংস্কারের কাজে লেগে যাবে।

পার্বতীর কথা শুনছিল পিটার, বিস্ময়ে, আগ্রহে। যে মেয়েটি তার সামনে বসে অনুত্তেজিত বিশ্বাসে কথা বলছে, পিটার ভাবল, একদিন সে এক ইংরেজ গভর্ণরের প্রাণ নিতে গিয়েছিল! ভারতবর্ষের মুক্তির জন্যে নিজের প্রাণ সে হেলায় বিসর্জন দিতে প্রস্তুত ছিল। রং-ময়লা, মোটা-সোটা মেয়েটির চোখে কোথায় সে আগুনের ঝিলিক? কেন তার কণ্ঠস্বরে বিবাদের সুর? কালো কুচকুচে চুল শক্ত করে এঁটে কুণ্ডলী করেছে; পিঠে হলদে রং-এর ব্লাউজের মধ্যে কাঁচুলির ফিতে দেখা যাচ্ছে। হালকা সবুজ রং-এর শাড়ি, হাতে দুগাছা সরু চুড়ি। কপাল ছোট ও চাপা, চোখদুটি বড় বড়, সামান্য ফিকে; টানা সরু নাক, ঠোঁটে মৃদু গোঁফের রেখা। ভরা, চওড়া গাল নেমে এসে মিলেছে চিবুকে, সবশুদ্ধ মুখখানি পানের মতো। কথা বলার সময় চোখ দুটো ছোট হয়ে আসে; কথা বলে ধীরে ধীরে; উত্তেজনা চাপতে গিয়ে গলার একটা শিরা এক একবার ফুলে ওঠে। বাঁ হাতখানা বুকের ওপর; ডান হাত একটুকরো কাঠ মাটিতে পিষে ভাঙবার চেষ্টা করছে।

হঠাৎ পিটার টের পেল পার্বতী নীরব হয়েছে। টের পেল পার্বতী পিটারের অনিমেষ নিরীক্ষণে কৌতুক পেয়েছে।

আমার কথা শুনে অবাক্ হচ্ছেন মিঃ কাবাকু ?

না তো ! বরং মনে হচ্ছে, আপনার কথার মধ্যে বিশ্বাসের জোর আছে।

মনে হচ্ছে ? খুশী হয়ে পার্বতী বলল, তাহলে আমায় সাহায্য করুন !

আমি কি সাহায্য করতে পারি আপনাকে ?

অনেক পারেন। কমিউনিটি প্রজেক্টের লোকদের ব্যাপারটা বোঝাতে হবে। দিল্লী গিয়ে আরও দরবার করতে হবে। আপনি আমার সহায়ক হোন।

যদি কোন কাজে আমি লাগতে পারি, মিস্ দত্ত, সে আমার সৌভাগ্য। কিন্তু তার আগে, আসুন, নদীতে বাঁধ দেওয়ার ব্যাপারটা একটু ভালো করে জেনে নেওয়া যাক। দু'চারখানা বই পড়া যাক, দু'দশজন এক্সপার্টের সঙ্গে আলোচনা করা যাক। তাহলে আমরা আনাড়ী প্রতিপন্ন হব না। আমাদের প্রস্তাবও জোরাল হবে।

এইভাবে পার্বতী-পিটারের সহকর্মিতার সূচনা।

দুজনে মিলে তারা পড়ল, আলোচনা করল ; প্রশ্নের, সমস্যার সমাধানের জন্যে নদী-বিশারদ ও এঞ্জিনীয়রদের শরণাপন্ন হল। অনেক পরিশ্রমের পর তৈরি হল তাদের খসড়া পরিকল্পনা। প্রজেক্ট অফিসরদের সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনা ও বিতর্কের পর সমর্থন মিলল। এবার শুরু হল রাজদরবারে হাজির হওয়া। অনেক প্রচেষ্টায় পরিকল্পনা কমিউনিটি ডেভেলপমেণ্ট মিনিষ্টারের অনুমোদন পেয়ে পূর্ত ও বিজলী মন্ত্রণালয়ে প্রেরিত হল। সেখানে পর্বতপ্রমাণ ফাইলের মধ্যে পার্বতী-পিটারের বড় সাধের পরিকল্পনা দানা বাঁধল আর একটি ফাইলে। বিশ্রাম পেল মাসের পর মাস। তারপর নিচু ও মধ্যস্তরের প্রশাসক ও বিশেষজ্ঞদের পরিপক্ক বিচার-বিশ্লেষণের বহু ধাপ পেরিয়ে একদিন উপনীত হল মন্ত্রণালয়ের মুখ্য সচিব শুকদেব শর্মা, আই. সি. এস্-এর প্রশস্ত টেবিলে।

খোঁজ নিয়ে পার্বতী জানল, শেষ অনুমোদনের অধিকার শুকদেব শর্মার। কিছুদিন অপেক্ষা করে সে শুকদেবের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের প্রার্থনা জানাল।

মাসাধিকাল অপেক্ষার পর পার্বতী যখন নিরাশ হতে চলেছে, তখন একদিন শুকদেব শর্মা তাকে আহ্বান করলেন।

এগারোটা পঁচিশ মিনিটে সাক্ষাৎকার নির্দিষ্ট ছিল। শুকদেব পার্বতী ও পিটারকে ডেকে পাঠালেন বারোটা বত্রিশে।

ওরা যখন ঘরে ঢুকল শুকদেব একটা ফাইল দেখছিলেন। শুকদেব দাঁড়িয়ে অভ্যর্থনা করলেন।

বসুন।

ওরা বসল।

আপনি মিঃ কাবাকু?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

কমিউনিটি প্রজেক্টে কাজ করছেন আপনি?

কাজ শিখবার জন্য আপনারা অনুগ্রহ করে আমায় বৃত্তি দিয়েছেন।

ভারতবর্ষের গ্রামে গ্রামে কমিউনিটি প্রজেক্ট বিপ্লব আনছে। প্রধান মন্ত্রী বলেছেন, নীরব বিপ্লব। যে বিরাট ও অর্থপূর্ণ কাজ ভারতবর্ষে হচ্ছে, একদিন আফ্রিকায়ও তার প্রয়োজন হবে।

সেজন্যেই তো আমি এ কাজ দেখতে, জানতে ও শিখতে চাইছি।

কিন্তু আপনারা মাউ মাউ শুরু করলেন কেন, বলুন তো? হিংসার পথে কোন বড় কাজ সম্ভব নয়। আপনাদের দেশেই মহাত্মা গান্ধী প্রথম অহিংস অসহযোগ প্রয়োগ করেন। তাঁর প্রথম বিজয় তো আফ্রিকাতেই! অথচ আপনারা এখনো হিংসায় ডুবে আছেন।

আপনি মাউ মাউ আন্দোলনের সবটা হয়তো জানেন না।

যেটুকু জানি তাতেই আমার যথেষ্ট। ইট্ ইজ্ এ ফিয়রফুল আফ্যায়ার, মাউ মাউ শপথটা দেখেছেন? টেরিব্‌ল্!

একটু হেসে শুকদেব শর্মা বললেন, হিংসায় কোন কাজ হয় না, মিঃ কাবাকু। আমাদের দেশেও কিছু কিছু বিপথগামী যুবক-যুবতী এক সময় হিংসার উত্তেজনায় ক্ষেপে উঠেছিল। কয়েকজন ইংরেজকেই হত্যা করে নি, ভারতীয় অফিসরদেরও গুলি করে, বোমা ছুঁড়ে খুন করেছে। কিন্তু ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আনে নি, এনেছেন এক অহিংস অর্ধ-নগ্ন ফকির! এসব স্বল্পায়ু হিংসাবাদীরা যাদের অধম ও অপদার্থ মনে করত, স্বাধীন ভারতবর্ষ নির্মাণের গুরুদায়িত্ব আজ তারাই হাসিমুখে বহন করছে।

সিগারেটে টান দিয়ে, কান-জ্বালা পার্বতীর দিকে তাকিয়ে, সামান্য হেসে শুকদেব শর্মা বললেন, কি বলেন, মিস্ দত্ত?

আমাদের প্ল্যানটা আপনি পড়েছেন ?—আস্তে প্রশ্ন করল পার্বতী।

নিশ্চয় পড়েছি। এই দেখুন, পুরো ফাইল আমার সামনে।

আপনার অনুমোদন পেলে আমরা কাজ শুরু করে দি!

তার আগে দু'-একটা প্রশ্নের জবাব দিন।

বলুন।

আপনি রাজনীতি একেবারে ত্যাগ করেছেন ?

অনেকদিন।

গোপনে গোপনে গ্রামে কোন রাজনীতি করবেন না তো ?

গোপনে কিছু করার অভ্যাস আমার নেই।

তাই নাকি মিস্ দত্ত ? আমি তো জানতাম আপনাদের সন্ত্রাসবাদটা পুরোই গোপনে চলত!

সেদিন অন্যদিন ছিল।

আজ দিন বদলেছে ?

নিশ্চয় বদলেছে। আর তা আপনি ভালো করে জানেন।

দেখুন, মিস্ দত্ত, আপনার বাবা পুরাতন কংগ্রেস নেতা হিসাবে সবাকার সম্মানীয়। তিনি ইচ্ছে করলে আজ মন্ত্রী হতে পারতেন। কিন্তু কোনদিন ক্ষমতা, যশ, কিছু তিনি চান নি। গান্ধীজির শিষ্য হিসাবে সবাই তাঁকে শ্রদ্ধা করেন, প্রধান মন্ত্রীও। আপনি তাঁর মেয়ে। তাঁর পথ ত্যাগ করে অন্যপথে আপনি এগিয়েছিলেন। আপনার সাহস ছিল, সংকল্পের দৃঢ়তা ছিল, আপনার ফাঁসির হুকুমে একদিন কি বিরাট চাঞ্চল্য দেশে হয়েছিল আমার মনে আছে। কংগ্রেসী পতাকা-বাহক প্রত্যেকটি মেয়েকে সন্দেহের চোখে দেখতে আমাদের বাধ্য করেছিলন আপনি। আপনার জন্যে নির্দোষ অনেক মেয়ে পুলিসের হাতে নির্যাতিত হয়েছিল। আজ যদি আপনি সৃজনশীল কিছু করতে চান আমাদের সাহায্য করা উচিত। কিন্তু আপনাকে কথা দিতে হবে যে কোনরকমের রাজনীতি আপনি কোনদিন টেনে আনবেন না।

পার্বতী চুপ করে রইল। পিটার দেখতে পেল পার্বতীর গলার একটা পরিচিত শিরা কাঁপছে। ডান হাতে ছোট্ট রুমাল নিষ্পিষ্ট।

আমার বাবার কথা তুলে আমাকে বিব্রত করছেন, মিঃ শর্মা—পার্বতী জবাব দিল, ধীর কণ্ঠে।—আমি তাঁর পথে কোনদিন চলি নি, কিন্তু আমাকে সবচেয়ে বোঝেন, জানেন তিনি। এককালে একজন গভর্ণরকে গুলি করেছিলাম

বটে, কিন্তু হিংসার পথ যে সুপথ নয় জেলে বসে আমি বুঝতে পেরেছি। তা থাক। আপনাকে একটা কথা আমি দিতে পারি। রাজনীতি করার কোন ইচ্ছে আমার নেই। কিন্তু যদি কখনো হয়, শুরু করবার অনেক আগে আমি সরকারি উদ্যোগ থেকে দূরে সরে যাব।

এক শুভদিনে ভীমগড়ে ভ্যঁয়রো নদীর বাঁধ শুরু হল। দিল্লী থেকে প্রধান মন্ত্রী এসে উদ্যোগের গোড়াপত্তন করলেন। চারদিকের গ্রাম থেকে হাজার হাজার নরনারী সমবেত হল তাঁকে দেখতে, তাঁর ভাষণ শুনতে। ভ্যঁয়রোর কূল জনসমুদ্র। মাথায় পাগড়ী বেঁধে শক্ত-দেহ জাট-চাষীরা বসেছে মাটির ওপর কাতারে কাতারে; স্ত্রীলোকেরা, এক পাশে, উড়নীতে মাথা ঢেকে। আকাশ নেমে এসে জনতার সঙ্গে হাত মিলিয়েছে; এত মানুষ একত্র দেখে বিস্তীর্ণ শস্যক্ষেত্র গর্বিত হয়ে পরম আনন্দে মাথা দোলাচ্ছে। বাঁশ ও তক্তায় তৈরি সজ্জিত মঞ্চে দাঁড়িয়ে প্রধান মন্ত্রী জনতাকে নতুন ভারতবর্ষের কথা বলছেন: যে ভারত পুরাতনকে বর্জন না করে নতুনকে নিমন্ত্রণ করেছে, যে ভারত অহিংসার পথে স্বরাজ পেয়ে সহযোগিতার পথে পুনর্গঠনের প্রয়াসী। প্রাঞ্জল ভাষায় প্রধান মন্ত্রী গ্রামীণ জানতাকে গণতন্ত্রের স্বরূপ বোঝাচ্ছেন, যে-গণতন্ত্রের প্রধান শক্তি-উৎস জনসাধারণ, যে-গণতন্ত্রে জনপথ ও রাজপথে ব্যবধান নেই, জনপথ থেকে রাজপথের উৎপত্তি। এই যে বহু শতাব্দীর উপেক্ষিত, অনাদৃত, শোষিত ভারতবর্ষের গ্রামীণ জনশক্তি, প্রধান মন্ত্রী বলছেন, তার মনের অন্ধকার কেটে গিয়েছে, সে আজ আলোকের সন্ধান পেয়ে নবতর সভ্যতা গড়বার পথে পা বাড়িয়েছে। তাকে মনে রাখতে হবে কী বিরাট ঐতিহ্যের সে উত্তরসূরী। তার অতীত বড়, কিন্তু ভবিষ্যৎ হবে আরও বড়। গান্ধীজির ভারতবর্ষ পৃথিবীর সবার কাছ থেকে ভালো জিনিস হাত পেতে নেবে, কিন্তু কারুর অনুকরণ করবে না; চলবার পথ সে বেছে নেবে, তৈরি করবে নিজের মেধায়, স্বকীয় প্রত্যয়ে। কিন্তু এ পথ হবে না হিংসা ও দ্বন্দ্বের পথ, হবে সম্প্রীতি ও সহযোগিতার পথ…

বিস্তীর্ণ জনতা শুনছে নিঃশব্দ গাম্ভীর্যে। প্রধান মন্ত্রীকে দূর থেকে আরও ছোট্ট দেখাচ্ছে: ছোট্ট একটি মানুষ, শাদা ধবধবে চুড়িদার ও মাখন রং-এর আচকান, বুকে একটি রক্তিম গোলাপ, মাথায় গান্ধীটুপি, পাখীর পালকের মতো শাদা! দূরে একটা গাছের তলায় বসেছে পার্বতী। এই

বিস্তীর্ণ জনতা আর ঐ একটি ছোট্ট মানুষ, অথচ কী গভীর বন্ধন!—সে ভাবছে। এমনি ছিল ভারতবর্ষের মানুষের সঙ্গে নেতাদের বন্ধন সেই মহাযজ্ঞের দিনগুলিতে, যা আজ অতীত বিস্মৃতিতে ক্রমশঃ বিলীন।

পার্বতী জনতার এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত বার বার তাকিয়ে দেখল। মানুষ। প্রত্যেকে আলাদা, অথচ সবাই একত্র। প্রত্যেকের আলাদা মন, আলাদা অনুভূতি, আলাদা সমস্যা, সংঘাত। প্রত্যেকের দুঃখ-সুখ, স্বপ্ন-কল্পনা, বন্ধন-বিচ্ছেদ, প্রত্যয়—আলাদা। তথাপি এমন ভাবের বন্যা আসে যখন সবকিছু পার্থক্য মুছে যায়, বহু মানুষ এক হয়ে দাঁড়ায়। এক হয়ে ভাঙে, এক হয়ে গড়ে। বহু মানুষ একত্র হয়ে ভারতবর্ষের স্বাধীনতাকে বাস্তব করেছে। গান্ধীজির আহ্বানে লক্ষ লক্ষ মানুষ সবকিছু ফেলে বেরিয়ে এসেছিল, নিজেদের আলাদা করে দেখে নি। কিন্তু স্বাধীনতার পর সেই একতার বন্যা কেন হঠাৎ শুকিয়ে গেল? মেঠো হাওয়ায় প্রধান মন্ত্রীর কণ্ঠস্বর ভেসে আসছে: ভারতবর্ষের প্রকৃত শক্তি তাহলে কি? আসল শক্তি, প্রকৃত সম্পদ, আমাদের দুটি: মাটি ও মানুষ। ভারতবর্ষের মাটি সুজলা, সুফলা। তার গর্ভে অজ্ঞাত অমূল্য রত্ন, যার পূর্ণ ব্যবহারে আমাদের দারিদ্র্য দূর হবে, কৃষি বাড়বে, শিল্প গড়বে। অন্য সম্পদ মানুষ। চল্লিশ কোটি মানুষ না পারে এমন কোন কাজ নেই। চল্লিশ কোটি মানুষের শক্তি যে কত বড় আমরা এখনো বুঝে উঠতে পারি নি। পার্বতীর বুকের ভেতরটা ব্যথায় মুচড়ে উঠল। আবার সে তাকাল নিঃশব্দ জনতার শেষ প্রান্তে। আসল সম্পদ? আসল শক্তি? চল্লিশ কোটি মানুষের কথা ভেবে আমাদের মনে পুলকের শিহরণ জাগে, না আতঙ্কের ছায়া পড়ে? প্রত্যেক নবজাত শিশু আমাদের নতুন একটুকরো শক্তি, না আর একটি বোঝা?

পিটার কাবাকু প্রধান মন্ত্রীর ভাষণ শুনছিল আখ-খেতের পাশে একটা অলস গরুর গাড়ির ওপর বসে। দূর গ্রাম থেকে চাষী এসেছে দলে দলে গরুর গাড়ি চেপে; গরুগুলি বিচরণ করছে, গাড়ির সারি দাঁড়িয়ে আছে আখ-খেতের পাশে। পিটার তন্ময় হয়ে দেখছে বিরাট জনতার সাগ্রহ মনোনিবেশ, ভারতের বিশ্ব-বন্দিত নেতার সঙ্গে জনশক্তির আশ্চর্য সমন্বয়। উর্দু-মিশ্রিত হিন্দী ভাষণের অনেকখানি সে বুঝতে পারছে না, আবার মাঝে মাঝে বেশ বুঝতে পারছে। কিন্তু তার মন বার বার চলে যাচ্ছে বহুদূরের আফ্রিকায়,

তার একান্তপ্রিয় কিনিয়ায়। কী ভয়ানক অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন আফ্রিকা! এ অন্ধকার কাটবে। আমি জানি, পিটারের মনে সঙ্গীত বেজে উঠছে, আমি জানি, এ অন্ধকার কাটবে। শাদা মানুষ চলে যাবে, শুধু থাকব আমরা আর আমাদের পুঞ্জীভূত, যুগ-সঞ্চিত আকাঙ্ক্ষা। ব্যর্থতার জন্যে বাইরের কোন স্বৈরাচারীকে দোষ দেবার সুযোগ সেদিন থাকবে না। আজ ভারতবাসী যা করছে, সেদিন আফ্রিকার নিগ্রো, আরব সবাই তাই করবে: ফলাফলের কষ্টিপাথরে নেতাদের কঠিন বিচার হবে শুরু। নেতৃত্ব করবার কতটুকু পাথেয় আমরা সঞ্চয় করছি? কই আমাদের সেই নেতা যার আহ্বানে সমগ্র আফ্রিকা জেগে উঠতে পারে, যার নির্দেশিত পথে জনতা চলবে পূর্ণ প্রাপ্তির খোঁজে? অনেক সংগ্রামে নেতার সঙ্গে জনতার ভাব-সমন্বয় গড়ে ওঠে। কিন্তু ইতিহাস কি আমাদের সেই বহু-সংগ্রামের সুযোগ দেবে?

এ দিনটি পিটার কাবাকুর জীবনে মহাদিন। অনুষ্ঠান শেষ হলে এক-সময় প্রধান মন্ত্রীর নিকট সান্নিধ্য পেল পিটার। জীবনে সর্বপ্রথম বিরাট পুরুষের কাছে এল পিটার। বুকে ভয়ানক কম্পন, হাত-পা উত্তেজনায় বিবশ। হাসিখুশী প্রাণপূর্ণ মানুষটির নৈকট্যে পিটারের আত্মা কেমন যেন বিগলিত হয়ে গেল। মনে হল, সে নেই, হারিয়ে গেছে, মিলিত হয়ে গেছে অজানা এক অনন্তের সঙ্গে। প্রধান মন্ত্রী তো শুধু নয়, এই সেই জননেতা আফ্রিকার ঘরে ঘরে যাঁর সম্মান, আফ্রিকার মানুষ যাঁর কাছে অনেক আশা করে! তিনি পিটারকে প্রশ্ন করে জানতে চাইলেন কিনিয়ার কথা, জেমো কেনিয়াটার স্বাস্থ্য, আফ্রিকার অন্য দেশের কথা। খুশী হলেন পিটারকে ভারতের গ্রামে কাজ করতে দেখে, নদীতে বাঁধ-নির্মাণে পিটারের উদ্যোগে। পার্বতীকে আদর করে কাছে টেনে নিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, বাবা কেমন আছেন; বললেন, বহুদিন দেখা নেই, তবে শিগগিরই হয়তো তিনি যাবেন গুজরাটে, চেষ্টা করবেন সবরমতি আশ্রমে একটা দিন কাটাতে। হেসে প্রশ্ন করলেন, এককালের সন্ত্রাসবাদী পার্বতী কি গ্রাম-সেবিকার কাজে সত্যই আনন্দ পাচ্ছে? যদি এ কাজ সে মন দিয়ে করতে পারে এর সার্থকতা হবে অনেক বেশি। দিল্লী গিয়ে যেন পার্বতী একদিন তাঁর সঙ্গে দেখা করে। পার্বতীর বাবা তাঁদের সবার শ্রদ্ধেয়—তাঁর ব্লাড-প্রেসার এখন কেমন? হ্যাঁ, বয়স তো হয়েছেই—তাঁরা সবাই সেকালের হয়ে যাচ্ছেন। পিটারের পিঠে স্নেহসিক্ত হাত রেখে বললেন, আফ্রিকার স্বাধীনতা কালের দরজায় বার বার আঘাত করছে। সহাস চোখ-

দুটিতে গভীর বেদনা ঘনিয়ে এল। বললেন, স্বাধীনতা পাওয়ার চেয়ে স্বাধীনতা গড়ে তোলা শক্ত। তখনি একটা জাতির প্রকৃত পরীক্ষা আরম্ভ হয়।...

অনেক কষ্টে নিঃশ্বাস নিয়ে পিটার বলল, আমি বুঝতে শুরু করেছি।

এর মধ্যে একদিন নাইরবিতে একটা ঘটনা ভারতবর্ষের মনকে উত্তেজিত করে তুলল। রাত্রির অন্ধকারে পুরো নাইরবি শহর ইংরেজের সৈন্যরা চক্রাকারে ঘিরে ফেলল। ভারতীয় দূতাবাসের সম্মুখে এসে দাঁড়াল সামরিক যান; ইংরেজ সৈন্যাধ্যক্ষ দূতাবাসের অধিকর্তাকে জানাল কমিশনে কয়েকজন মাউ মাউ দস্যু আশ্রিত, তাদের গ্রেপ্তার করা হবে। অধিকর্তার প্রতিবাদ অগ্রাহ্য করে সৈন্যরা ঢুকে পড়ল দূতাবাসে, কয়েকজন আফ্রিকান কর্মচারীকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করে ধরে নিয়ে গেল। ভারতীয় কমিশনার ইংরেজ কর্তৃপক্ষের কাছে কঠিন প্রতিবাদ জানালেন; প্রতিবাদ পৌঁছল দিল্লী থেকে লণ্ডনে। কয়েকদিন পরে গভর্ণর ভারতীয় কমিশনারের কাছে মার্জনা চাইলেন। কিন্তু নিগ্রো কর্মচারীদের কোন সন্ধান পাওয়া গেল না। নাইরবির ইংরেজ-মহলে গুজব রটল ভারতীয় কমিশনার মাউ মাউ আন্দোলনের প্রতি সহানুভূতিশীল। কেউ কেউ এমনও নালিশ তুলল, মাউ মাউ ভারতবর্ষ থেকে সক্রিয় সাহায্য পাচ্ছে।

ভ্যঁয়রো নদীর তীরে বাঁধ তৈরিতে পিটার কাবাকুর উৎসাহের শেষ নেই। গ্রামের লোকেদের সঙ্গে একত্র হয়ে কাজ করতে তার আনন্দ। কোদাল হাতে নিয়ে সে মাটি কাটে, কোনদিন মাটির বোঝা টেনে নিয়ে নির্দিষ্ট স্থানে ফেলে। কালো মজবুত দেহে ঘামের ধারা, ঘাম পড়ে কপাল থেকে গালে, গাল থেকে বুকে। দেহের পরিশ্রমে মনের ঘোর কাটে, জটিল চিন্তার গ্রন্থি খুলে যায়। পিটার মনে মনে বলে, ভারতবর্ষ, তোমার নতুন-জীবন-সৌধ গড়তে কত মানুষই তো হাত লাগাচ্ছে। পশ্চিমের ধনশালী দেশগুলি তোমাকে অর্থ দিচ্ছে; তোমার চাষের প্রসারে, শিল্প গঠনে সাহায্য করছে। একদিন রুশিয়াও হয়তো তোমার শিল্পায়নে হাত লাগাবে। আমি পরাধীন অজ্ঞ আফ্রিকার নগণ্য নাগরিক। এই ছোট নদীর সামান্য বাঁধে, একটি অতি সাধারণ গ্রামের পথ-চলা রাস্তা নির্মাণে, রেখে গেলাম আমার দরিদ্র স্বাক্ষর।

হয়তো এতো বড় ভারতবর্ষের কাছে এ ক্ষুদ্র সহকর্মিতার কোন অর্থ থাকবে না, কিন্তু আমার কাছে থাকবে।

মাটি কাটতে কাটতে পিটার শুনতে পেল: মিঃ কাবাকু, আপনি কি মাউ মাউ সমর্থন করেন?

তাকিয়ে দেখল, পার্বতী। হাওয়ায় তার আঁচল উড়ছে, শক্ত করে ধরেছে শাড়ির প্রান্ত। পকেট থেকে রুমাল বার করে পিটার গায়ের ঘাম মুছে পার্বতীর দিকে তাকাল। এ প্রশ্নের জবাব এমনি করে দেওয়া সম্ভব নয়। পার্বতীর রাজনৈতিক অতীত সম্বন্ধে পিটার প্রশ্ন করে খুশীমতো জবাব পায় নি, পার্বতী ওসব কথা উঠলে চুপ করে গেছে। অথচ পিটারের রাজনৈতিক মানস সম্বন্ধে কেন তার কৌতূহল? পিটার বলল, পরে আলোচনা করবে সে, যদি পার্বতীর কৌতূহল বেঁচে থাকে। মনে মনে ভাবল, শুধু বলব না, শুনবও।

ভঁয়রো নদীর নির্জন তীরে সেই নিঃসঙ্গ গাছটার নিচে, যেখানে পিটার-পার্বতীর প্রথম আলাপ হয়েছিল, তাদের রাজনৈতিক পরিচয় হল, আরেকটি সুবর্ণ গোধূলির প্রসারিত স্তিমিতালোকে। পিটার পার্বতীকে আফ্রিকার কথা শোনাল। বলতে বলতে মন তার ভারী হয়ে এল; বার বার কণ্ঠ রুদ্ধ হল। তবু মনে হল, বলতে আমার ভালো লাগছে, বলে আমি মুক্তি পাচ্ছি। মনে হল প্রশান্ত উন্মুক্ত আকাশ আর দিগন্ত বিস্তৃত নির্জনতা আগ্রহে আমার কথা শুনছে, আফ্রিকার কথা। শুনছে ক্ষীণপ্রবাহিনী নদী। আমি যেন কোন একজনকে বলছি না, বলছি পৃথিবীর সবাইকে। পৃথিবী তার রুদ্ধশ্বাস ব্যস্ততার মধ্যেও চুপ করে আমার কথা শুনছে। যাকে উদ্দেশ করে বলছি, ভারতবর্ষের একটি কালো মেয়ে, সে যেন আমার আর সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে রহস্যময় যোগাযোগ স্থাপন করেছে। তাই আমার বলে আনন্দ, শুনিয়ে মুক্তি।

মাউ মাউ বিদ্রোহের সূচনা যখন হয় তখন পিটার কাবাকু কিনিয়ায় ছিল। কিন্তু আগুন জ্বলে ওঠবার সময় সে ভারতবর্ষে।

কেমন করে এ আগুন জ্বলেছে তা আমি জানি। কিন্তু কতখানি সে দাহন করেছে তা জানি নে। যে বীভৎস মাউ মাউ শপথের কথা শুনে আপনারা আতঙ্কিত, তার সত্যই কোন অস্তিত্ব আছে কিনা, না ইংরেজ

নিজেদের অত্যাচারের সাফাই হিসেবে ওটা তৈরি করেছে, আমার জানা নেই। কিন্তু এ কথা কবুল করব যে আফ্রিকায় নৃশংসতার শেষ নেই। শান্তির ললিতবাণী আমাদের প্রাণ এখনো স্পর্শ করে না। হিংসার বদলে হিংসাই আমরা উচিত মনে করি।

হিংসায় আপনারা ওদের সঙ্গে পারবেন কেন?

পারব না। কিন্তু হিংসা দিয়ে শুরু করতে হবে। ভারতবর্ষেও তাই হয় নি কি? গান্ধী-পথেই আপনারা স্বরাজ পেয়েছেন, এ তো ঐতিহাসিক সত্যভাষণ নয়। অনেক আন্দোলন নানা ধারায় এসে মিশেছে বিরাট সংগ্রামে, তাই আপনারা সফল হয়েছেন।

তা ঠিক। জীবনের কোন ক্ষীণ ধারাই হারিয়ে যায় না। কিন্তু, মনে রাখবেন, গান্ধীর পথে আমাদের স্বাধীনতা-প্রচেষ্টা পরিণতি পেয়েছে।

তার কারণ, গান্ধীবাদ সমুদ্র, বহু নদনদীর মিলনক্ষেত্র। সে সমুদ্র চলত তার নিজস্ব তেজে; এমনই বিরাট সে তেজ, বহু নদীর সীমিত তেজ সে সহজে হজম করতে পারত।

যারা গান্ধীবাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী তারাও গান্ধীকে প্রণাম করতো। যাদের মত ও পথ গান্ধী বর্জন করতেন, তাদের তিনি কোনদিন বর্জন করেন নি।

কিন্তু আমাদের কোন গান্ধী নেই। আমরা শুধু পথ খুঁজছি। সারা আফ্রিকাব্যাপী সংগ্রাম এখনো শুরু হয় নি। তবে, আর দেরী নেই। যে আগুন জ্বলেছে তা আর নিভবে না।

একদিন নিভবে, মিঃ কাবাকু,—মৃদুকণ্ঠে পার্বতী বলল,—একদিন নিভবে। যেদিন আপনারা স্বাধীন হবেন।

কেন? নিভবে কেন?

তাই নিয়ম। দেখুন না আমাদের দিকে তাকিয়ে। যে বহ্নিবন্যা এই সেদিনও এত বড় দেশটাকে প্লাবিত করেছিল, যে আগুনের তাপে সামান্য, সাধারণ মানুষ মহানের স্পর্শ পেয়েছিল, তার কতটুকু এখন জীবিত? ধিকি-ধিকি ক্ষীণ রশ্মি জ্বলছে যাদের প্রাণে, তারাও আর বেশিদিন থাকবে না।

যে আগুন পরদেশীকে ধ্বংস করবে, সে আগুন স্বদেশকে গঠন করবে।

নাও-তো হতে পারে! হয়তো দেখবেন দুটো আলাদা বিপ্লবের প্রয়োজন। প্রত্যেক বিপ্লবেরই গতি আছে, কোনটার বেশি, কোনটার কম। বিপ্লব নদীর

বন্যা। আজ তার ভীষণ গতি, কাল সে শান্ত, পশ্চাৎগামী। বিপ্লব ফুরিয়ে যায়। সে যে কী ভয়ানক ফুরিয়ে যাওয়া তা আপনি নিজে না বুঝলে কেউ আপনাকে বোঝাতে পারবে না।

একটা ফুরিয়ে গেলে অন্যটা আসবে। বন্যার পর তো আবার বন্যা আসে!

তাই বলে, যেটা ফুরাল, তার মৃত্যু তো কম দুঃখের নয়! তা ছাড়া. ক্রমাগত এগিয়ে যায় এমন মানুষ ক'জন? আমরা সবাই পথশ্রান্ত হয়ে আরামের বৃক্ষ-ছায়ায় বিরাম খুঁজি নে?

মিস্ দত্ত, আপনি যা বলছেন, তার মধ্যে গভীর ব্যথা লুকিয়ে আছে। সেটা কি, আমি জানতে চাই।

জেনে কি লাভ হবে?

অনেক। আমি পথিক। আমাকে সব পথের সন্ধান পেতে হবে। আলোর পথ। আঁধারেরও।

পার্বতী চুপ করে রইল। নিজের কথা বলতে দ্বিধা। চুপ করে দ্বিধাকে জয় করল। তারপর বলল: যে ব্যথার কথা বলছেন, মিঃ কাবাকু, তা হচ্ছে ঐ ফুরিয়ে যাবার ব্যথা। আমার চতুর্দিকে আমি কেবল দেখতে পাই, সব ফুরিয়ে যাচ্ছে, আগুন নিভছে, বন্যার স্রোত পালাচ্ছে। আমার বাবা সারাজীবন গান্ধীর পথে চলে এসেছেন, সেই ১৯২১ সাল থেকে। স্বাধীনতার পর গান্ধীজির সবরমতি আশ্রমে তিনি স্থায়ী আবাস নিয়েছেন, আমার মনে হয়, শেষ হবার দুঃখ সইতে না পেরে। আমি ভারতবর্ষের জন্যে কিছু করি নি; এক মহা-প্লাবনের যুগে একটি ষোলো বছরের মেয়ে কিছু না-ভেবে, না-জেনে, দুঃসাহসিক একটা কাজ করে ফেলেছিল—সে আজ আমার মধ্যে বেঁচে নেই। কিন্তু সে আগুনের আঁচ আমার মনেও লেগেছিল। বাবা গান্ধীবাদী দেশকর্মী ছিলেন, তাঁর কাজকর্ম আমার মনে হত নিস্তেজ, উত্তেজনাহীন। একদিন সুযোগ পেয়ে একটা গোপন-দলে আমি যোগ দিয়েছিলাম। কর্তৃপক্ষকে ফাঁকি দিয়ে রাত্রের অন্ধকারে অস্ত্রবিদ্যা শেখার মধ্যে যেমন ভয়ানক উত্তেজনা ছিল, তেমনি ইংরেজ শক্তিকে দেশ থেকে দূর করার স্বপ্নে ছিল মাদকতা। গান্ধী যা পারেন নি, আমার বাবা যা পারেন নি, আমি, আমরা, তাই পারব! এই পাগল-করা মন্ত্রে আমরা মেতেছিলাম।

পিটার নীরবে শুনছিল। পার্বতীর চোখে তার চোখ। পার্বতীর মনে তার মন।

লাহোরে আমরা থাকতাম। বাবা ছিলেন সরকারি কলেজের অর্থনীতির অধ্যাপক। ১৯২১ সালে গান্ধীর আহ্বানে চাকরি ছেড়ে দেশের কাজে নামলেন। পরে একটা বে-সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ হয়ে যথেষ্ট সুনাম ও সম্মান অর্জন করেছিলেন। আমি যে গোপন-দলে নাম লিখিয়েছি তিনি জানতেন, কিন্তু দু'-একবার আমাকে সাবধান করে দেওয়া ছাড়া, বাধা দেবার মতো সময়ও তাঁর ছিল না, স্বভাবও না। তিনি অবাক হলেন, আহত হলেন, যেদিন একটা ভয়ানক কাজ আমি করে বসলাম।

পার্বতী থামল। নদীর পাশ ঘিরে একপাল বক বসেছে, দু'-একটা উড়ে গিয়ে জলে নামছে। পিটার নিঃশব্দ আগ্রহে নিশ্চুপ।

ইংরেজ গভর্ণর রোজ বিকেলে শহরের প্রান্তে ঘোড়ায় চড়ে বেড়াতে যেতেন। ফিরবার সময় লাট-প্রাসাদের ফাটকের সামনে ছোট-খাট দর্শকের ভিড় জমত। একদিন এই ভিড়ে দাঁড়াল এসে ষোল বছরের একটি মেয়ে। লাট সাহেব ঘোড়ায় চড়ে ফাটকে ঢুকবার সময় শাড়ির ভেতর থেকে পিস্তল বার করে তিনবার সে মেয়েটি গুলি ছুঁড়ল। একটা গুলি লাট সাহেবের ডান বাহুতে লাগল, একটা ঘোড়ার পেটে, আর তৃতীয়টা একজন সিপাহীর গায়ে। বিরাট হৈ-চৈ হল, বিহ্বল, অবশদেহ মেয়েটিকে জাপটে ধরল কতগুলি লোক, আর এই ঐতিহাসিক মুহূর্তে সে আর একটা অদ্ভুত কাজ করল: জ্ঞান হারাল।

খুব একটা আলোড়ন হল সারা দেশে। মেয়েটির বিচার হল। তার হয়ে আদালতে দাঁড়ালেন দেশের সেরা সেরা আইনজীবী। একদিন মেয়েটির ফাঁসির হুকুম হল। আর তখন শুরু হল আর এক দফা আন্দোলন। ষোল বছরের একটি মেয়েকে ফাঁসি দেওয়ার মতো নৃশংস বর্বরতা সচেতন ভারতবর্ষ সইতে রাজী হল না। গান্ধীজি মেয়েটির দুঃসাহসিক কাজের নিন্দা করলেন, কিন্তু তেমনি নিন্দা করলেন ফাঁসির আদেশের। শহরে শহরে সভা হল, শোভাযাত্রা হল, লক্ষ লক্ষ 'প্রতিবাদ' ও 'আবেদন' বড়লাটের ওপর বর্ষিত হল। পার্বতী দত্ত নামে একটি মেয়ে হঠাৎ ভারতবর্ষে বিখ্যাত হয়ে গেল।

শুধু একজন মানুষ তার হয়ে একটিও কথা বলেন নি, তিনি তার বাবা। বাবা প্রথমদিন আমায় যখন দেখতে এলেন আমি তখন জেল-হাসপাতালে। চোখ দিয়ে তাঁর অবিরল জল ঝরল। বললেন, তুমি এ কী করেছ? তুমি যে এতদূর এগিয়ে গেছ তা তো বুঝতে পারি নি! তোমার মা বেঁচে থাকলে

তুমি নিশ্চয় এমন হতে পারতে না। (বলতে ভুলে গেছি, আমার খুব ছোট-বেলায় মা মারা যান।) যাবার সময় বাবা বলে গেলেন, তুমি মরতে ভয় পাও? কিছু না বুঝে, আমি বললাম, না। বাবা বললেন, তোমার নিশ্চয় ফাঁসির হুকুম হবে। তবে মরবে কিনা জানি না। না মরলেও তোমার চৌদ্দ বছর জেল হবে। পারবে সইতে? আমি বললাম, পারব।

পার্বতী জোরে জোরে নিঃশ্বাস নিতে লাগল। পিটার তাকিয়ে রইল আকাশ ও মাঠের মাঝামাঝি মহাশূন্যে।

আমার ফাঁসি হয় নি তা তো দেখতেই পাচ্ছেন। যাবজ্জীবন কারাবাস হয়েছিল। ইংরেজের একটা বড় গুণ, তারা সময় বুঝে থামতে জানে। আমি জেল থেকে ছাড়া পেলাম ভারতবর্ষ স্বাধীন হবার পর। জেলে বসে পড়লাম, একটার পর একটা পরীক্ষা পাশ করলাম, আমার সাধ্যমত অনেক ভাবলাম। হিংসার পথে ভারতের যে মুক্তি নেই, বুঝতে দেরী হল না। আরও বুঝলাম, ভারতের জন্যে একটা মাত্র বিপ্লবের পথ পাকাপাকি তৈরি—গান্ধীর পথ। গান্ধীবাদ পুরো মানতে পারলাম না, কিন্তু এটুকু বুঝলাম তাতে এমন কিছু শক্তি আছে যার দীপ্তিতে ছোট মানুষও মহান্ হয়, মানুষের মন থেকে ভয় যায়, লোভ যায়, অহমিকা যায়।

যখন মুক্তি পেলাম তখন ভারতবর্ষ মুক্ত। কিন্তু এমন মুক্তির কথা কি আমরা কেউ ভাবতে পেরেছিলাম? আমি জন্মেছিলাম সেই মহাদিনে, যখন গান্ধীজি প্রথম সংগ্রামের অগ্নিদীক্ষায় ভারতবাসীকে দীক্ষিত করে তুলছিলেন। সে সংগ্রামে হিন্দু-মুসলমান একসঙ্গে দাঁড়িয়ে লড়েছিল। কিন্তু, হায়, ভারতবর্ষ যখন স্বাধীন হল, হিন্দু-মুসলমান তখন ঘোরতর গৃহযুদ্ধে লিপ্ত. আর আমাদের মাতৃভূমি দ্বি-খণ্ডিত। আমাদের বিপ্লবের আগুন আর রইল না।

বাবাকে মন্ত্রী হবার জন্যে গান্ধীজি অনুরোধ করলেন। তিনি বললেন, রাজত্ব করবার জন্যে তো আপনার শিষ্য হই নি, ও কাজ আমার দ্বারা হবে না। যাঁরা দেশের ও দশের দায়িত্ব গ্রহণ করলেন তাঁদের মধ্যে পুরোনো দিনের আগুন ধীরে ধীরে নিভে গেল। এ যে কী ভয়ানক ব্যাপার তা আপনি বুঝবেন না। আজ যে গান্ধীটুপি-পরা মানুষটা পারমিটের জন্যে ঘুরে বেড়ায়, গোপনে কালো-বাজারে ব্যবসা করে, একদিন সে-ই ইংরাজের বিরাট শক্তিকে তুচ্ছ করেছিল! তার স্ত্রী-পুত্র-পরিবার ভেসে গেছে, বার বার সে হাসিমুখে কারাবরণ করেছে। তার পতন যে কত বড় ট্র্যাজেডী তা শুধু তারাই জানে যারা তার দুটো চেহারাই

দেখেছে, যারা তার ইতিহাস জানে, যারা বিচার করবার আগে বুঝে দেখতে চায়। যে লক্ষ লক্ষ মানুষ ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আনল, স্বাধীন ভারতবর্ষে তাদের চরিত্র স্খলন হল কেন? আমাদের বিপ্লব কেমন যেন চট করে নিস্তেজ হয়ে এল। তাকে দীর্ঘজীবী করে রাখতে পারতেন যিনি তিনি নিজেই আততায়ীর হাতে প্রাণ হারালেন।

চুপ করল পার্বতী। কথা যেন তার শেষ হয়েছে।

নীরবতা ভাঙবার জন্যে পিটার বলল—কিন্তু বিপ্লব তো আপনাদের ফুরিয়ে যায় নি! ভারতবর্ষকে নতুন করে নির্মাণের যে আয়োজন চলছে তার কিছুটা আমি স্বচক্ষে দেখেছি। এ প্রচেষ্টা পৃথিবীর সর্বত্র প্রশংসা পাচ্ছে। বিপ্লব তো চলছে!

—যা চলছে তা বিপ্লব নয়, উদ্যোগ। এর বিধাতা সরকার, কর্মকর্তা সরকারি কর্মচারী। এর প্রেরণা উঁচু থেকে। এ বিপ্লবে জনতার সাগ্রহ আত্মদান নেই।

দেশটা তো বড় হচ্ছে? ভারতের মান বাড়ছে, ওজন বাড়ছে।

তা জানি। দেশ বড় হচ্ছে, কিন্তু মানুষগুলি? তারা যে ছোট হয়ে যাচ্ছে? একদিন অর্ধনগ্ন আমাদের নেতা ইংরেজদের রাজার সঙ্গে করমর্দন করায় আমরা গর্বিত হয়েছিলাম। আজ কোন মন্ত্রী নগ্নপদে রাজদপ্তরে ঢুকতে গেলে বোধকরি প্রহরী লজ্জায় মাথা নত করবে। আমরা আমাদের প্রকৃত চেহারা দেখাতে চাই নে, দেখতে চাই নে। আমরা আমাদের অতীতের বেদনা, দুঃখ, ব্যথা সব ভুলতে বসেছি। একদিনের ত্যাগ আজ আমাদের ব্যঙ্গ করছে। হয়তো সবদেশেই এমনি হয়ে থাকে। একদিনকার বিপ্লব অন্যদিন মরে যায়। তার মৃত্যু যে কী সাংঘাতিক আমরা ভেবে দেখি না।

পিটার নিজের অজ্ঞাতে পার্বতীর কাছে সরে এল। চোখে চোখ রেখে বলল, মিস্ দত্ত, আপনার ব্যথা আমি বুঝতে পারছি। একটা প্রশ্ন করি। এ ব্যথাতেই কি গান্ধী শেষ পর্যন্ত দীর্ঘজীবনের আশা ত্যাগ করেছিলেন? এ ব্যথাতেই তিনি স্বাধীনতা-দিবসের কোন উৎসবে যোগ দেন নি? দূরে সরে গিয়ে হিংসায় উন্মত্ত মানুষকে শান্ত করবার কঠিন ব্রত গ্রহণ করেছিলেন?

পার্বতী ধীরে ধীরে বলল, এ ব্যথা নিয়েই তিনি প্রাণ দিলেন।

পিটার বলল, যে-বিপ্লব প্রকৃতিকে বদলাতে চায় তা নির্মম, কিন্তু সহজ।

যে বিপ্লব মানুষকে বদলাতে চায়, তা কোমল, কিন্তু কঠিন। সফলতার সন্ধান পেতে তাকে দীর্ঘপথ অতিক্রম করতে হয়, দীর্ঘকাল অপেক্ষা করতে হয়। যে আগুন আপনি ভারতবর্ষে নির্বাপিত দেখছেন, অন্যত্র তা জ্বলছে। মানুষের অগ্রগতি চলছে। চলবে। তাকে টুকরো টুকরো করে দেখলে আপনি ভুল করবেন। একদিন আফ্রিকায়ও এ আগুন নিভবে। তখন হয়তো ভারতবর্ষে জ্বলবে নতুন বিপ্লবের আগুন। আপনাদের হাত থেকে অগ্নিশিখা নিয়ে চলব আমরা, পৃথিবীর অন্য কোন দেশ থেকে অগ্নিশিখা নিয়ে একদিন চলবেন আপনারা। মানুষের প্রগতিকে এরকম ব্যাপক দৃষ্টিতে দেখলে আপনি বোধ হয় এতটা বেদনা পাবেন না।

বিস্মিত পার্বতী তাকিয়ে রইল পিটারের দিকে! গভীর নৈঃশব্দে মনের ঝড় যেন শান্ত হল। মৃদুকণ্ঠে পার্বতী বলল, একথা তো আমার আগে কোনদিন মনে হয় নি!

আমিও আগে কোনদিন ভাবি নি। আপনার কথা শুনতে শুনতে মনে হল। আমার চোখ গেল খুলে।

আমারও। মৃদু স্বগতোক্তি উচ্চারিত হল পার্বতীর কণ্ঠে। মন যেন অনেকখানি হালকা হল। বিশ্বাস ফিরে এল মানুষের অখণ্ড অগ্রগতিতে, বিশ্বাস ফিরে এল নিজের বুকে।

সন্ধ্যার হালকা অন্ধকারে মাঠের পথে তারা একসঙ্গে গ্রামে ফিরল।

আট

ভীমগড় পিটার কাবাকুর ভারতপ্রবাসের স্মরণীয়তম অধ্যায়। নদীর বাঁধ শুরু হল ফসল কাটার পর, গ্রামের লোকেদের যখন বাধ্যতামূলক কর্মবিরতি, কেন না কর্মাভাব। চার-পাঁচখানা গ্রাম থেকে আড়াই শ' চাষী লেগে গেল ভাঁয়রোশাসন পর্বে, তাদের কোলাহল-মুখরিত কর্মপ্রবাহে গ্রামগুলিতে এল নতুন জাগরণ। পিটার মিশে গেল এ জাগরণের স্রোতে। প্রথম সে অনুভব করল জীবনে, বহু মানুষকে একত্র করতে পারে যেমন ভাবের বন্যা, তেমনি কর্মের আহ্বান। প্রথমটাতে উন্মত্ততা, দ্বিতীয়টাতে সৃষ্টিশীলতা। ভাবপ্রবণ লক্ষ্যে উপনীত হবার জন্যে মানুষ যেমন মেতে ওঠে, তেমনি তাদের মাতানো

সম্ভব সৃষ্টিশীল কর্মের প্রেরণায়। প্রথম সে বুঝল, স্বাধীনতার পর অনগ্রসর দেশগুলির প্রধান কর্তব্য জনশক্তিকে সৃষ্টিশীল করা। এ কর্তব্য পালনের ওপর নির্ভর করবে স্বাধীনতার সাফল্য।

পিটার দিল্লী থেকে বেশ কয়েকজন আফ্রিকানদের নিয়ে এসে ভীমগড়ের নবমূর্তির সঙ্গে পরিচয় করাল। রাজধানীর সংবাদপত্রগুলিও একদিন সচেতন হল; ভীমগড়ের সৃষ্টিশীল উদ্যোগ টানল সাংবাদিকদের; বিবরণ ছাপা হল পত্রিকার স্তম্ভে; প্রকাশিত হল কর্মরত গ্রামবাসীদের আলোকচিত্র, তার মধ্যে একক আফ্রিকান, পিটার কাবাকু। একটি উৎসাহী রিপোর্টার কাবাকুর সঙ্গে 'বিশেষ সাক্ষাৎকারের' প্রার্থী হল; ভঁয়রোর পারে তপ্ত দুপুরে একটা গাছের নিচে পিটার অনেক প্রশ্নের উত্তরে যা বলল পরের দিন কাগজে ছাপা হল তার বিবরণ। চার বছরের বেশি ভারতে থেকে পিটার যা পায় নি ভীমগড় তাকে তা দিল। সুনাম, সুখ্যাতি শুধু নয়; ব্যবধান ঘুচিয়ে বন্ধুর সঙ্গে মানস-সংযোগ। পিটার কাবাকু আর বিচ্ছিন্ন রইল না। ভারতের একটি সামান্য গ্রামে আফ্রিকা এসে মিশল।

সহকর্মিতার বন্ধনে ধীরে ধীরে গড়ে উঠল পিটার-পার্বতীর বন্ধুত্ব। ভারতবর্ষে সর্বপ্রথম পিটার অনুভব করল সেই গভীর পরিতৃপ্তি যা আসে নারীর সহানুভূতি, সহানুভূতি থেকে। পিটারের অন্তর ধুয়ে-মুছে নির্মল হয়ে গেল। বিক্ষোভ, নালিশ আর রইল না। বার বার তার মনে গুঞ্জরিত হল, আমার ভারতপ্রবাস সার্থক হল। হৃদয়পাত্র আমার ভরল। এবার ফিরে চল আপন ঘরে। রিক্ত হাতে নয়। পরিপূর্ণ অন্তরে।

বুদ্ধি দিয়ে ভারতদর্শন হয়েছিল শুরু; অন্তর দিয়ে পিটার তা সমাপ্ত করল। বিচার-বুদ্ধি দিয়ে যাচাই করেছিল অনেকদিন, মন দিয়ে এবার করল গ্রহণ। পার্বতীর মধ্য দিয়ে ভারতের সবকিছু যেন সহজ হল। নিজের হল।

বিদেশে এসে নিঃসঙ্গ পুরুষ সঙ্গ চায়। শুধু পুরুষের নয়, নারীরও। এ সঙ্গকামনায় লালসার স্থান নেই, যদি তার পরিপূর্ণতা সহজ, সুস্থ, স্বাভাবিক পথে আসে। ভারতপ্রবাসী আফ্রিকান নিগ্রোর দেহের ক্ষুধা মেটাতে নারীর অভাব হয় না; মনের ক্ষুধা থেকে যায় অপূর্ণ। দেহের দাবী মেটাতে বারবণিতা থাকে; আরও থাকে, মাঝে মাঝে, এমন দু'-একটি নারী যারা 'উঁচু' সমাজের ঝাঁঝাল অঙ্গ। এ্যাডভেঞ্চারের সন্ধানী, নতুনের শিকারী তারা।

তা ছাড়া এমন 'ভদ্র' নারীও থাকে যারা দেহ বিক্রী করে জীবনের রসদ জোটায়।

সুস্থ, স্বাভাবিক নারীসঙ্গ হতে বঞ্চিত ভারতবাসী নিগ্রো বারবণিতার ঘরে ভিড় করে ; আয়া, ঝি, মেথরাণী জাতীয় স্ত্রীলোকদের টেনে আনে ঘরে ; দপ্তরে-কাজ-করা নির্বান্ধব রূপহীন যৌবনহীন মেয়েদের পেছনে ঘুরে বেড়ায়। যে তৃষ্ণা অমৃতপ্রার্থী, গরলে তা মেটাতে গিয়ে অন্তরে বিষপাত্র পূর্ণ হয়ে ওঠে।

ক্লেদাক্ত একটা ঘটনা পিটার কাবাকুকে দিল্লীতে টেনে আনল। বিদেশীদের জন্যে আধা-সরকারি কোন এক হস্টেলে বাস করে পাঁচটি আফ্রিকান যুবক। একরাত্রে তারা প্রতিবেশী পরিবারের আয়াকে নিজেদের ঘরে নিয়ে এসে তাদের জৈব ক্ষুধা মেটাল। স্ত্রীলোকটির চিৎকারে ছুটে এল চারিদিকের লোক, বাধল বিরাট এক কেলেঙ্কারী।

বেশ খানিকটা উত্তেজনা পাকিয়ে উঠল। হস্টেলে নানা দেশের লোকের বাস—আরব, ইরানী, ইন্দোনেশিয়ান, বর্মী, তিব্বতী। অনেকে থাকে পরিবার নিয়ে। নালিশ পৌঁছল ব্যবস্থাপক কমিটিতে, বর্বর ব্যবহারের পর, আফ্রিকানদের আর এখানে থাকা চলবে না। কর্তৃপক্ষ ঘটনাটা চাপা দিতে চাইলেন, কিন্তু পত্রিকায় প্রচারিত না হলেও, মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ল অনেকখানি।

জরুরী আহ্বানে পিটার চলে এল দিল্লী। কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথাবার্তায় ঘটনার পূর্ণ বিবরণ পেল। কথা বলল হস্টেলের অনাফ্রিকান বাসিন্দাদের সঙ্গে। আশ্বাস দিল, এ ঘটনার পুনরাবৃত্তি হবে না। তারপর বৈঠক বসল নিজেদের মধ্যে।

সমস্যাটা পিটার জানে। সে নিজেও ভুগেছে নিঃসঙ্গতার জ্বালায়, দগ্ধ হয়েছে দেহের দহনে। অমৃত-সন্ধানী পিপাসায় তাড়িত হয়ে মুখ লাগিয়েছে বিষপাত্রে। তাই পাঁচটি আফ্রিকানের মুখোমুখি বসে, তিরস্কারের ভাষা তার মুখে এল না। ভেবেছিল, তীব্র ভাষায় কুৎসিত ব্যবহারের ভয়ঙ্কর পরিণাম বুঝিয়ে দেবে অপরাধীদের। কথা যোগাল না। মন বলে উঠল, উপদেশ দেবার আগে এদের কথাটা ভেবে দেখ। যা পেয়ে তৃষ্ণাকে তুমি প্রেরণায় উত্তীর্ণ করতে পেরেছ, এদের প্রবাসী-জীবনে তা জোটে নি। তুমিও তো জান কোন্ ক্ষুধার তাড়নায় মানুষ নর্দমায় খাবার খোঁজে ?

পিটার শুধু বলল, একটু বাড়াবাড়ি হয়ে গেছে তোমাদের। ভুলে যেও না, আমরা প্রত্যেকে এদেশে সমস্ত আফ্রিকার জন্যে জবাবদিহি করছি। প্রত্যেকের স্খলন-পতনকে বিকৃত, বিরাট করে, এরা সমস্ত আফ্রিকাকে বিচার করবে।

একজন জবাব দিল, করুক। এরা এমনিতেই আমাদের মানুষ বলে মনে করে না। এদের বিচারে কি এসে-যায় আমাদের?

আর একজন বলল, তুমি তো এদের সমাজে মিশবার সুযোগ পাও। তোমার বন্ধু-বান্ধবী সব আছে। আমরা? আমাদের কথা ভেবে দেখেছ? কোন বাড়িতে আমরা নিমন্ত্রিত হই না, কোন মেয়ে আমাদের সঙ্গে মেশে না। এদের রাজপথে আমরা গাড়ি-টানা ঘোড়া, আমাদের তৃষ্ণা মেটাবার জন্যে নোংরা জলের বন্দোবস্ত।

কুৎসিত মুখের ওপর ছোট ছোট চোখ দুটো জলজল করে উঠল কথাগুলো বলতে বলতে। পিটার ছেলেটির হাত টেনে নিল নিজের হাতে।

বলল, ওয়েঙ্গো, তোমার জ্বালা আমার জানা আছে। আমিও জ্বলেছি, পুড়েছি। কিন্তু সব সময় এটুকু মনে রাখতে চেষ্টা করেছি যে এদেশে আমি কেবল কিনিয়া-আগত একজন নিগ্রো নই। আমার মধ্যে এ দেশের মানুষ গোটা আফ্রিকাকে দেখবে, জানবে। এ যেন একটা অদ্ভুত ব্যাপার। স্বপ্নের মতো অবাস্তব, রোমান্সের মতো মোহময়, অথচ দুঃসহ বেদনায় ভারী। আমরা আমাদের নিজস্ব ক্ষুদ্র জীবনের স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত। অব্যক্ত বিরাট কিছুর আমরা অবিচ্ছেদ্য অংশ। সূর্যের আলোয় শিশিরবিন্দু যেমন চিক-চিক করে, বড়-কিছুর আলোয় নিতান্ত ছোট আমরাও আজ চিকচিক করছি। সে বড়-কিছুর নাম আফ্রিকা। তার আলো পড়েছে আমাদের জীবনে, আমাদের প্রত্যেকের জীবনে। হঠাৎ আমরা একটু যেন বড় হয়ে গেছি। শত শত বছর শাদা মানুষ আফ্রিকার যে পরিচয় বাকী পৃথিবীকে দিয়েছে তারই পরিণতি এই নিগ্রো-আতঙ্ক। এ জন্যে যেমন আমরা দায়ী নই, তেমনি দায়ী নয় ভারতবর্ষের লোক। আফ্রিকা যেমন অন্ধকার তার চেয়েও অন্ধকার আফ্রিকা সম্বন্ধে বাইরের মানুষের মন। আজ পৃথিবীতে আমাদের কিছু দেবার নেই, তাই পৃথিবীর দুয়ারে আমরা হৃতমান। একদিন যখন আমাদেরও দেবার থাকবে, তখন দেখবে আমাদের মান বেড়েছে।

দেশভাইদের হস্টেলে পৌঁছে দিয়ে, বাসে বসে, পিটারের মনে একটা নাম

গুম্ফিত হল। পার্বতী। পার্বতী আমায় বাঁচিয়েছে, আমায় মুক্তি দিয়েছে। পার্বতী আমায় মানুষের সম্মান দিয়েছে, তার স্পর্শে আমার কূপ হয়েছে সমুদ্র।

কনট প্লেসে নেমে পড়ল পিটার। দু-চারখানা বই আর প্রয়োজনীয় কয়েকটা জিনিস কিনতে হবে। বই-এর দোকানে কর্মহীন সময় যেমন কাটে তেমন আর কোথাও নয়। যেমন বই দেখতে আনন্দ, তেমন মজা যারা দোকানে আসে-যায় তাদের দেখতে। মাঝবয়সী পেটমোটা ভদ্রলোকেরা মার্কিন ম্যাগাজিনের পাতা উলটিয়ে উলঙ্গ রমণীর দেহ দেখে লুকিয়ে লুকিয়ে; কলেজে-পড়া ছেলেমেয়েরা বেপরোয়া, তাদের অন্তত সাহস আছে। বই-এর দোকানে যাদের আনাগোনা তাদের মনের অনুচ্চারিত ভাবনাগুলিকে ধরে রাখবার একটা মন্ত্র আবিষ্কার হলে, পিটার ভাবে, কী ভয়ানক ব্যাপারই না হতো! আজকাল মার্কিনমুলুকে মলাটে যৌন-স্বভাব ছবি ছাড়া সস্তা পকেট-বই তৈরি হয় না। শুধু মলাটে কেন, সযত্নে তৈরি সংক্ষিপ্ত পুস্তক-পরিচয়েও তারা এমন কিছু বেছে নেবে যার মধ্যে তিনটি কথা নির্ঘাৎ বর্তমান: লাষ্ট, প্যাসন, থ্রিল। পৃথিবীর মানুষের প্রেরণা যতোই কমছে লাষ্ট বাড়ছে ততো। উন্মাদনা কমছে, তাই উত্তেজনার চাহিদা; এ্যাডভেঞ্চার নেই, তাই থ্রিলের সন্ধান। কোন কিছুতে বিশ্বাস নেই, তাই জীবন আশ্বাসহীন। সভ্যতার মাথার ওপর এ্যাটম বোমা অহরহ ধ্বংসের শাসানি দিচ্ছে, তাই বুঝি সভ্যতা হঠাৎ বেপরোয়া হয়ে লুটে-পুটে ভোগ করছে যা পাচ্ছে তাই। কেন, কিছু না পেয়ে নিজেকেই সে খেয়ে নিঃশেষ করছে।

হঠাৎ পরিচিত কণ্ঠের আওয়াজে পিটারের এলোমেলো চিন্তায় বাধা পড়ল। তাকিয়ে দেখল দোকানের একপাশে বিদেশী ম্যাগাজিনের সাজান আসনের পাশে দাঁড়িয়ে তার পরিচিতা একটি মেয়ে, সঙ্গে এক ভদ্রলোক। মেয়েটির দেহের গঠন অনেকটা পুরুষের মতো শক্ত, মজবুত। বেশি লম্বা নয়, নাক-চোখ টানা টানা, মাথায় সরু চুলের বেণী। ভদ্রলোক সুবেশ। পিটার এগিয়ে গিয়ে আলাপ করতে উদ্যত হয়ে থেমে গেল। বুঝল মেয়েটি তাকে চিনতে চাইছে না।

অথচ এই কান্তা শেঠের সঙ্গে দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ে পিটারের বেশ খানিকটা আলাপ হয়েছিল। সে আলাপ নিয়ে আলোড়নও একেবারে কম হয় নি।

পেশোয়ারী মেয়ে কান্তা শেঠ। খেলাধুলোয় পারদর্শিনী। কলেজে ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় প্রতি বছর রাশি রাশি পদক পেত কান্তা শেঠ। দৌড়ে, হাই জাম্পে, সাইকেল-রেশে এবং জিমন্যাষ্টিকস্-এ সে ছিল অপ্রতিদ্বন্দ্বী।

ক্রীড়া-প্রিয় বলেই হয়তো দেহে মেয়েলি কমনীয়তার চেয়ে পুরুষের পেশলতা বেশি। মনটাও উদার, উন্মুক্ত।

নিজেই এসে পিটারের সঙ্গে আলাপ করেছিল কান্তা শেঠ।

কলেজে নতুন নতুন পিটার নিঃসঙ্গ, সংকুচিত। সবাই তার সঙ্গে মৌখিক ভদ্র ব্যবহার করে কিন্তু আড়ালে তাকে নিয়ে হাসে। স্বভাবতই সে গম্ভীর-স্বভাব, নিঃসঙ্গতা তাকে আরও গম্ভীর করেছিল। অন্তরকে বিষণ্ণ।

ক্লাসের অবসর কাটতো লাইব্রেরীর পড়ার ঘরে। এখানে একদিন সে পড়ছিল। কান্তা শেঠ একটা বই নিয়ে মুখোমুখি টেবিলে এসে বসল।

গুড্ মর্ণিং। আপনার সঙ্গে আলাপ করতে এলাম। আমার নাম কান্তা শেঠ।

চমকিত হয়েছেল পিটার।—গুড্ মর্ণিং। আমার নাম পিটার কাবাকু।

আপনি কোন্ দেশ থেকে এসেছেন?

কিনিয়া থেকে।

যেখানে ভীষণ গোলমাল চলছে?

হ্যাঁ।

পড়তে এসেছেন?

ঠিক তাই।

কারুর সঙ্গে মেশেন না কেন?

কেউ আমার সঙ্গে মেশে না বলে।

এই তো আমি মিশতে এলাম।

ধন্যবাদ আপনাকে।

আপনি বিদেশী, আপনারই তো উচিত সবার সঙ্গে আলাপ করে নেওয়া।

আমি বিদেশী, আপনাদের উচিত আমাকে টেনে নেওয়া।

টানলে আসবেন?

নিশ্চয়ই।

এই তো টানলাম।

আমিও এলাম।

কান্তা শেঠ পিটারকে দলে টানতে চেষ্টা করেছিল। কিন্তু পারে নি। পিটারের সঙ্গে তার বন্ধুত্বটা আর সবার সহ্য হয় নি। একটা অত্যন্ত অপ্রীতিকর অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল। পিটার নিজেই সরে গিয়েছিল নিজের নিঃসঙ্গতায়। কান্তা শেঠের তাতে কোন দোষ ছিল না। সৎসাহস নিয়ে পিটারের সঙ্গে সে আলাপ করেছিল, সতীর্থদের শাসানীতে কান দেয় নি। একদিন নিজের বাড়ি পর্যন্ত পিটারকে নিয়ে গিয়ে চা খাইয়েছিল। পিটার এ সাহসী মেয়েটি সম্বন্ধে আগাগোড়া শ্রদ্ধা পোষণ করে এসেছে। মনে পড়ল, কান্তা শেঠের বিবাহের সংবাদ সে শুনেছিল কোন এক সহপাঠীর কাছে। সঙ্গের ভদ্রলোক নিশ্চয় তার স্বামী। স্বামী সঙ্গে আছে বলেই হয়তো কান্তা শেঠ আজ পিটারকে চিনতে চাইছে না।

মনে মনে পিটার হাসল। আজ আর এসব ব্যবহারে দুঃখ নেই তার। পার্বতীকে বলতে হবে আজকের ঘটনা। শুনে পার্বতী মজা পাবে। দুজনে তারা হাসবে। পথ-চলতে কাঁটার আঁচড়। তাকে হেসে উড়িয়ে না দিলে পথ-চলা অসম্ভব।

একটু রাত করে পিটার নিজের ঘরে ফিরল। অনেকদিন সে রাইসিনা হস্টেল ত্যাগ করে নতুন একটা বাড়িতে উঠে এসেছে। কার্জন রোডের ওপর তার নতুন আবাস। গাল-ভরা ইংরেজি একটা নাম আছে বাড়িটার, শুনলে মনে হয় বিরাট কোনও প্রাসাদ। আসলে যুদ্ধকালে নির্মিত প্রকাণ্ড ব্যারাক্। একদা মার্কিন অফিসরদের বাসস্থান ছিল। নামটা তাদের দেওয়া। বর্তমানে নানা লোকের আবাসভূমি। সরকারি চাকুরে, পার্লামেণ্টের সদস্য, ভারত-প্রবাসী বিদেশী। পরিবার নিয়ে যেমন অনেকে থাকে, তেমনি বাস করে এককজীবন নারী। কেউ বিবাহিতা, কারুর বা বিয়ে হয় নি, কেউ বা স্বামীর সম্পর্ক ত্যাগ করেছে। তিন-চারশো মানুষ একত্র বাস করে এ বিচিত্র বাড়িতে, যেখানকার অলিখিত নিয়ম অবাধ স্বাধীনতা। এখানে কোন সমাজ নেই। পাশের ঘরে দুপুর রাত্রে বাইরেকার স্ত্রীলোক নিয়ে প্রতিবেশী ফূর্তি করলে প্রতিবাদ করা যায় না। কোন ঘরে কেউ-বা গভীর রাত্রি পর্যন্ত একমনে পরীক্ষার জন্যে তৈরি হচ্ছে, অনতিদূরে চলছে রেকর্ড বাজিয়ে মার্কিন নৃত্য, মদো উল্লাস, তরল কণ্ঠের তীব্র আনন্দনিনাদ। এখানকার বাসিন্দারা পারস্পরিক ঔদাসীন্যের মধ্যে স্বকীয় স্বাধীনতাটুকু সযত্নে সংরক্ষণ করে। যেচে বা জোর করে কেউ কারুর সঙ্গে সামাজিকতা পাতায় না।

পিটারের ঘরখানা প্রশস্ত, আসবাব কম। সুবিধে, ঘরখানা এককোণে. একটু নিরিবিলি। সঙ্গে বাথরুম, এ আর একটা বিলাসিতা। পিটার যখন এখানে থাকে, আহার করে ক্যানটিনে। অনেকে নিজের ব্যবস্থা নিজেরাই করে নেয়। পিটার তা করে নি। খাবারের প্রতি লোভ তার কম। ওটা জীবনের একটা প্রয়োজনীয় কাজ মাত্র। তৈরি পেতেই আনন্দ।

কিছুদিন ধরে দেশের কথা ভেবে পিটারের মন বার বার বিষণ্ন হয়ে উঠছে। ওয়াচিরা ও মোয়গাই-এর চিঠি আসছে না অনেকদিন; অন্য সূত্রে খবর যা আসছে তা আদৌ শুভ নয়। বিদ্রোহের আগুন ছড়িয়ে পড়েছে পিটারের গ্রামের দিকে; ভয় হচ্ছে, তার প্রিয়জন সবাই হয়তো বিপন্ন। মনে হঠাৎ গভীর অমঙ্গলের ছায়া পড়ে, বুকের স্পন্দন থেমে যায়, হাত-পা বিবশ হয়ে আসে। পিটার মনে মনে স্থির করেছে, এবার সে দেশে ফিরে যাবে। কিনিয়ার পথ বন্ধ; ওখানে তার প্রবেশ নিষেধ। তাই অন্য পথের সন্ধান করছে। আফ্রিকার অন্য কোন দেশে যদি সে পৌছতে পারে, কোন উপায়ে কিনিয়ায় গিয়ে সে হাজির হবে। চেষ্টা করছে গোল্ড কোষ্টে যাবার অনুমতি পাবার। আশা আছে, পেয়ে যাবে। পার্বতী দিল্লী এসে তার জন্যে কয়েকজনের কাছে তদ্বির করে গেছে। আশ্বাস দিয়েছে, হয়তো কাজ হাসিল হবে।

আশ্চর্য লাগে ভাবতে কি করে পার্বতী আমার জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে গেল। তাকে ছাড়া আমার যে আর কোন কাজ হবার নেই। আমার সব সমস্যার সমাধান পার্বতীর কাছে। সে আমার জীবনের সবটুকু জেনে নিয়েছে, সহানুভূতির সঙ্গে প্রত্যেকটা সমস্যায় সে আমার সাহায্যে এগিয়ে আসে। এমন কিছু নেই আমি তাকে বলি নে, এমন আমার কোন কথা নেই যা তার কাছে তুচ্ছ। নির্মল বন্ধুত্বে পার্বতী আমায় পবিত্র করেছে। হ্যাঁ, আমি পবিত্র হয়েছি। আমার জীবনে আর গ্লানি নেই। বহুদূরের ওয়াচিরা আর অতি কাছের পার্বতী, আমার জীবনে এ দুটি নারীর দৃষ্টি পড়েছে; অন্ধকার আমার ঘুচে গেছে।

ওয়াচিরার কথা মনে হতে পিটারের কেমন আশ্চর্য লাগে। পাঁচ বছরের দুস্তর ব্যবধানে ওয়াচিরা কেমন যেন দূরে সরে গেছে। কাছে যদি-বা সে আসে, অস্পষ্ট, ছায়ার মতো, মায়ার মতো। রাত্রে বিছানায় শুয়ে পিটার ওয়াচিরার কথা ভাবে, তাকে কাছে টানতে চেষ্টা করে, কিন্তু সে যেন বহুদূর থেকে শুধু তাকিয়ে থাকে, নিকটে আসতে চায় না। যদি-বা আসে, সে যেন

রক্ত-মাংসের মানবী নয়, দূরান্তের ছায়া। আমি তোমাকে কাছে আর পাইনে ওয়াচিরা, তোমার নরম দেহের স্পর্শ পাইনে আমার শরীরে। তুমি শুধু বহুদূর থেকে আমার পানে চেয়ে থাক, তোমার দৃষ্টিতে কামনার জ্বালা নেই, শুধু বিচ্ছেদের বিষণ্ণতা। তুমি যেন বলতে চাও, তুমি আরও দূরে মিলেয়ে যাবে, আরও দূরে, যেখানে সবকিছু নিশ্চিহ্ন। আমি তোমাকে ধরতে চাই, তোমার দেহকে টেনে আনতে চাই আমার বুকে, তোমার নরম বুকে আমার মাথা রাখতে চাই। কিন্তু ছায়ার মতো একবার কাছে এসে তুমি অনেক দূরে, অনেক দূরে চলে যাও—অনেক দেশ, জনপদ, সমুদ্রের ওপারে, বিরাট সীমাহীন আকাশের ওপারে। পার্বতীকে তোমার এই দূরে পালিয়ে যাবার কথা বলেছিলাম, ওয়াচিরা; সে শুধু হাসল, আর বলল, এবার তোমার ঘরে ফিরবার সময় হয়েছে, পিটার। ওয়াচিরা তোমায় ডাকছে।

জামা-কাপড় ছেড়ে পিটার শুয়ে পড়ল। চোখে ঘুম নেই। কাছাকাছি একটা ঘরে জোর পার্টি চলেছে, শোনা যাচ্ছে নারী-পুরুষের সম্মিলত নেশার ঐক্যতান। পাশের ঘরের পেটমোটা ভদ্রলোক সিংহনাদের মতো নাক ডাকছেন, আওয়াজ দেওয়াল ভেদ করে স্পষ্ট আসছে পিটারের কানে।

উঠে একটা সিগারেট ধরাতে গিয়ে হাতের ধাক্কায় টেবিলের ওপর থেকে ফ্রেমে-বাঁধা ওয়াচিরার ছবিটা মাটিতে পড়ে গেল। তাড়াতাড়ি আলো জ্বেলে পিটার ছবিটা সযত্নে তুলল। কাচটা ফেটে গেছে! মন বড় খারাপ হয়ে গেল পিটারের। ছবিটা হাতে নিয়ে অনেকক্ষণ দেখল। হাসিভরা মুখখানা ওয়াচিরার। যুদ্ধফেরত পিটার একটা ক্যামেরা এনেছিল, তাই দিয়ে ছবি তুলেছিল ওয়াচিরার। বিছানার চাদর দিয়ে ছবি সযত্নে মুছল পিটার। টেবিলের এককোণে দাঁড় করাল। বড় নোংরা হয়ে আছে টেবিলটা, সারা ঘরটা। একদিন হাত লাগাতে হবে।

পার্বতীকে নিয়ে তুমি হিংসা ক'রো না, ওয়াচিরা। আলো নিবিয়ে পিটার চোখ বুজল। অন্ধকারে খুঁজল ওয়াচিরাকে। পেল না। শুধু ছবির হাসিভরা মুখখানি চোখে ভাসল। পার্বতী সে জাতের মেয়ে নয়। সে আমার বন্ধু, তোমার সব কথা তাকে আমি বলেছি। তোমাকে না দেখেও সে জানে, চেনে। দেখা হলেই আগে সে তোমার খবর জানতে চায়। এই যে এতদিন হয়ে গেল, তোমাদের, তোমার, কোন খবর নেই তাতে আমারই মতো তার দুশ্চিন্তা। তোমার কাছে ফিরে যাবার পথ তৈরি করছে পার্বতী আমার জন্যে। সে

নিজের জন্যে যাদের কাছে কোন কিছু চায় নি, তাদের কাছে হাজির হয়েছে আমার জন্যে, তোমার জন্যে। পার্বতীকে বন্ধু পেয়ে আমার অনেক গ্লানি কেটে গেছে, ওয়াচিরা। সে গ্লানির কথা তোমাকে লিখি নি, সে শুধু আমি জানি, আর জানেন ঈশ্বর।

জীবনে গ্লানি জমে অবমাননা থেকে, সুস্থ ক্ষুধার বিকৃত খাদ্যে নিবৃত্তির বাধ্যতা থেকে। দেহের এ্যাডভেঞ্চার পিটারকে কোনদিন বিশেষ উত্তেজিত করে নি। যৌবনে সুস্থ ক্ষুধা জমে উঠতেই তার বিয়ে হয়েছিল, সে-ক্ষুধার পরিপূর্ণ স্বাভাবিক নিবৃত্তি এনেছিল ওয়াচিরা। যুদ্ধকালে সৈনিক জীবনে দৃঢ়তার সঙ্গে বারবণিতার গৃহ সে এড়িয়ে গেছে; যে তৃপ্তির সন্ধান ছিল ওয়াচিরার দেহে তা পাবে না জেনে; রোগের ভয়ে। সৈনিক জীবনের জান্তব উত্তেজনায় নারীদেহ যে সুখ যোগায় পিটারের তা প্রয়োজন হয় নি। পল্টনে সবাই এজন্যে তাকে পরিহাস করেছে। লণ্ডনের সস্তা পল্লীতে দু'-একবার পথে-হাঁটা রমণীর পাল্লায় পড়েছে, কিন্তু ব্যাপারটা লেগেছে বিস্বাদ, ক্লান্তিকর। দিল্লীর প্রবাসী জীবনেও তেমন ক্ষুধার জ্বালা সে অনুভব করে নি। পেয়েছে, বহুদিন ধরে, নিঃসঙ্গতার, তাচ্ছিল্যের তীব্রতর জ্বালা। বন্ধুদের পাল্লায় পড়ে, নিতান্ত কৌতূহলের বশে, দু'-চারবার জি. বি. রোডের লাল-আলো ঘরে গিয়ে সে হাজির হয়েছে, কিন্তু সে পরিবেশ বেশিক্ষণ সহ্য করতে পারে নি। মাঝে-মধ্যে দুঃসহ একাকীত্ব থেকে মুক্তির জন্যে মন যে-কোন উত্তেজনার সন্ধানী হয়ে উঠেছে; কিন্তু কঠিন শাসনে পিটার মনকে দমন করেছে, যে খাদ্য তাকে তৃপ্তি দেবে না, আত্মাকে অপমান করবে, সেদিকে অন্ধের মতো হাত বাড়ায় নি।

তবু একটি রমণী তার জীবনে এসেছিল ঝড়ের হাওয়ার মতো। এই বহু মানুষের বিচিত্র বাড়িটাতেই।

মেয়েটিকে পিটার প্রথম দেখতে পেয়েছিল করিডরে। ছিপছিপে গড়ন, যৌবন প্রকট। প্রশস্ত নিতম্বের ওপর সরু কোমর, চাপা পেট। কোমরের অনেকখানি অনাবৃত। চৌলি স্তনদুটিকে প্রধান করেছে বিন্যাসের কৌশলে। রংটা ফ্যাকাশে শাদা। গলায় কালো পাথরের মালা, হাত খালি, ঠোঁট সযত্নে লাল করা, চোখে সুর্মা। ললাটে চুলগুলি ঘাড়ের নিচে নামতে পারে নি। অনাবৃত বাহু দুটি সরু, অপুষ্ট। হনহন করে হেঁটে যাচ্ছিল মেয়েটি, পিটার

একপাশে সরে দাঁড়িয়ে রাস্তা দিল। সোজা চোখের তির্যক দৃষ্টিতে সে একবার পিটারকে দেখল, এগিয়ে গিয়ে পেছন তাকিয়ে, দ্বিতীয়বার।

এরপর মাঝে মাঝে দেখা হয়েছে, করিডরে, ডাইনিং হলে, রিসেপশন রুমে। পিটার অনুভব করেছে মেয়েটির নজর, অস্বস্তি লেগেছে, কিন্তু অভিজ্ঞতা মানুষকে জ্ঞানী করে, তাই চোখাচোখি তাকায় নি। পিটার শুনেছে মেয়েটি একা বাস করে এ বাড়িতেই, চাকরি করে কোন সরকারি দপ্তরে। প্রায়ই মেয়েটির ঘরে হুল্লোড়ে পার্টি বসে, রেকর্ডে বাজে রক-এণ্ড-রোলের 'সঙ্গীত', চলে দাপাদাপি নাচ। পিটারের ঘর থেকে বেশ খানিকটা দূরে মেয়েটির ঘর, তবুও গভীর রাত্রে মত্ত হাসি, তীব্র গান, বেহায়া নাচ অন্ধকার ভেদ করে ভেসে আসে। পরের দিন পিটার দেখতে পায় মেয়েটি ব্রেকফাষ্ট খেতে ডাইনিং হলে বসেছে, সুর্মাটানা চোখের নিচে গভীর ক্লান্তি সাজের জৌলুসেও ঢাকা পড়ে নি।

একদিন রাত দশটা উত্তীর্ণ হয়েছে, পিটার টেবিলের ওপর মাথা গুঁজে একটা প্রবন্ধ লিখছে। বর্ষাকালের রাত, বাইরে টিপটিপ বৃষ্টি। সাধারণত কোলাহলমুখর বাড়িটা হঠাৎ কেমন নিশ্চুপ। টেবিলের ওপর টাইমপিসটার টিকটিক আওয়াজ বেশ একটু স্পষ্ট হয়ে পিটারের কানে বাজছে। লেখার মাঝখানে সিগারেটের প্যাকেটটা খালি হয়ে যেতে নতুন সিগারেটের খোঁজে পিটার বিছানার ডানদিকে দেওয়ালে ঝুলান সার্টের কাছাকাছি আসতে আধ-খোলা দরজার কাছে মানুষের আভাস পেয়ে চমকিত হল।

কাছে গিয়ে প্রশ্ন করল : কে?

দরজার পর্দাটা নড়ল। মেয়েলি কণ্ঠের ধ্বনি এল : মিঃ কাবাকু? আমি ঘরে আসতে পারি?

এগিয়ে গিয়ে দরজা পুরো খুলে পিটার সবিস্ময়ে দেখতে পেল, সেই মেয়েটি।

আসুন। গুড্ ইভনিং।

ঘরে ঢুকে মেয়েটি বেশ বিব্রত হয়ে পড়ল। পরনে তার সবুজ রং-এর পাতলা জর্জেট, ফিকে-সবুজ স্লিভলেস পাতলা চৌলি। একটু বেশি মেক-আপে মুখখানা কেমন যেন অলীক, হঠাৎ দেখলে মনে হয়, ঠিক জীবন্ত নয়। একহাতে কালো ভ্যানিটি-ব্যাগটা চেপে ধরা, অন্য হাতে শাড়ির প্রান্ত। ঝাঁজাল সুগন্ধ নিয়ে এসেছে মেয়েটি, যে গন্ধ নাকে ঢুকে নেশা আনে।

বস্থন, মিসেস, পিটার ভদ্রতা করল।

গোয়েল। মিসেস গোয়েল। মেয়েটি বলল। আপনার সঙ্গে কথাবার্তা হয় নি, কিন্তু আপনার কথা আমি অনেক শুনেছি।

আমার কথা? কোথায়, কাদের কাছে?

এখানেই, অনেকের কাছে। এবার মেয়েটি সপ্রতিভ হবার চেষ্টা করল। হাসি আনল মুখে, চোখে। এখানে সবাই আপনার সুখ্যাতি করে।

তাই নাকি? বিস্মিত হল পিটার। আমার তো ধারণা অধিকাংশ বাসিন্দারাই আমায় এড়াতে চায়। আমাকে জানে না তো প্রায় সবাই।

আপনি মেশেন না, তাই জানেন না। মিসেস গোয়েল পিটারের কাছাকাছি চেয়ারে বসেছে। এতক্ষণে তার বিব্রতভাব পলাতক। দেহ দুলিয়ে বলল : সবাই বলে, আপনি খুব সীরিয়স টাইপের মানুষ এবং অত্যন্ত ভদ্র। তাছাড়া আপনি অনেকের উপকার করে থাকেন।

তাই নাকি? খুশী হয়ে পিটার একগাল হাসল। তার অবর্তমানে এখানকার মানুষ তাকে নিয়ে নিন্দা-পরিহাসের বদলে প্রশংসা করে এমন দুঃসাহসিক ভাবনা তার মনে কখনো প্রশ্রয় পায় নি। মেয়েটিকে পিটারের কেমন যেন ভালো লাগল। একটু চটকদারী হাবভাব বটে, কিন্তু কথাবার্তা বেশ সরল।

কই! আমি কারুর উপকার করেছি বলে তো মনে পড়ে না।

সেটা আপনার বিনয়। সেবার আসামে ভূমিকম্পের পর আপনি ঘুরে ঘুরে রিলিফ সংগ্রহ করেন নি?

পিটার সশব্দে হেসে উঠল। ওঃ, এই মাত্র! সে তো অনেকেই করেছিল। অনেকের সঙ্গে আমিও।

তাও তো কম নয়। এই ধরুন না, আমি করি নি। আপিস করে, দশরকম ঝামেলা মিটিয়ে, মানুষের জীবনে আর সময় কোথায়?

আপনার আবার দশরকম ঝামেলা কি? আপনি তো একা মানুষ।

একা মেয়েমানুষের ঝামেলা অনেক বেশি, মিঃ কাবাকু। তাছাড়া, জীবনে দুঃখের, ব্যথার জিনিস অনেক আছে। ওসবের কথা যতো কম জানা যায় ততোই ভালো। যতটুকু পারা যায় আনন্দ করে কাটিয়ে দেবার জন্যে মানুষের জীবন। খাও, পান কর, স্ফূর্তি কর—এই হল জীবনের মটো। কি বলেন?

আপনি বলুন, আমি শুনছি। সব লোকের মটো তো এক হতে পারে না! তাহলে জীবনে কোন আস্বাদ থাকে না।

ওঃ, আমি ভুলেই গিয়েছিলাম আপনি সীরিয়স মানুষ। একটা আলগা হাই তুলল মিসেস গোয়েল, ডান হাতখানা পুরো তুলে আলতোভাবে হাইটাকে আটকাল। অনাবৃত বাহু এবং সংক্ষিপ্ত চৌলির ফাঁকে স্তনের পুরো আভাস পিটারের চোখে বর্ষিত হল।

আমাকে সীরিয়স বলে আপনি ঠাট্টা করছেন; কিন্তু স্ফূর্তি করাটাই কি জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য?

একমাত্র না হলেও, বড় একটা তো বটেই। মিসেস গোয়েল উঠে দাঁড়াল। আপনি নিশ্চয় অবাক হচ্ছেন আমি কেন এত রাত্রে আপনার ঘরে এসে হাজির হয়েছি!

তা একটু হয়েছি বইকি? আমার ঘরে এর আগে কোন মহিলা আসেন নি।

তাই নাকি? তাহলে আমি আপনার জীবনে একটা ঘটনা, বলুন?

ঘটনা তো বটেই। হয়তো দুর্ঘটনা।

মিসেস গোয়েল হেসে অস্থির। দুর্ঘটনা? তার মানে আপনি আমায় ভয় পাচ্ছেন? তা পান। কিন্তু দুর্ঘটনাকে এতো ভয় কেন?

ভয় পাচ্ছি কেমন করে বুঝলেন?

আপনার হাবভাব দেখে। খুব মজা পেল মিসেস গোয়েল। ভেবেছিলাম, আপনাদের দুঃসাহসের অন্ত নেই। আসলে কি জানেন? আজ আমার বন্ধুরা কেউ আসে নি। ঘরে বসে বসে বড় একা লাগল। একা থাকলে আমি কেমন যেন অস্থির হয়ে যাই। মনে হয় চারদিক থেকে অদ্ভুত ভয়ঙ্কর সব ছায়া এগিয়ে আসছে আমার দিকে। চোখে-মুখে আতঙ্কের ভাব ফুটে উঠল মিসেস গোয়েলের; যেন ভয় পেয়ে সরে এল পিটার কাবাকুর কাছে। একা থাকার মতো ভয়ঙ্কর আর কিছু নেই, কি বলেন?

কিন্তু একাই তো থাকেন আপনি।

না, আমি কক্ষনো একা থাকি নে। থাকতে পারি নে। সেজন্যেই আমার ঘরে রোজ পার্টি বসে—নয়তো অন্যত্র। শুধু শোবার সময় আমি একা। ডাক্তার আমাকে এমন একটা স্লিপিং ডোজ্ দিয়েছে, খাবার সঙ্গে সঙ্গে ঘুম। সবাই যখন বিদায় নেয়, কোনমতে চটপট কাপড় ছেড়ে, হাত মুখ ধুয়ে বিছানায় গা ঢেলে দি, আর টুপ করে গিলে ফেলি আমার পরম বন্ধু একটুকরো

বিষ ; তারপর স্যুইচ টিপে বাতি নেবাবার সঙ্গে সঙ্গে তলিয়ে যাই গভীর অন্ধকারে।

আজ আপনার বন্ধুরা আসে নি কেন ?

সবাই দল বেঁধে পিকনিক গেছে। দিল্লীর বাইরে। আমারও যাবার কথা ছিল। কিন্তু আপিসের 'বস্' বললেন, একসঙ্গে সিনেমায় যাবেন। তাই গিয়েছিলাম সন্ধ্যাবেলা। লোকটা কোন কাজের নয়। সিনেমায় বসেই ভয়ে অস্থির, যদি-বা কেউ দেখে ফেলে। লুকিয়ে-চুরিয়ে এক-আধটু খুনসুটি ছাড়া আর কিছু তার দৌড় নয়। ছেলেবেলার কলেজে-পড়া প্রেমিকদের মতো! সিনেমা থেকে বেরিয়ে বললাম, চল ভল্গায় যাই। বলল, বৌ-এর কাছে বলে এসেছি সাড়ে ন'টার মধ্যে ফিরব। অতো বৌ-টান থাকলে বান্ধবী নিয়ে সিনেমায় যাওয়া কেন বলুন তো! এমন রাগ হল যে তাকে কনট প্লেসে বিদায় দিয়ে ট্যাক্সি চেপে সোজা ঘরে চলে এলাম।

পিটার অবাক বিস্ময়ে মিসেস গোয়েলের কথা শুনছিল।

মিসেস গোয়েল এগিয়ে গিয়ে টেবিলের ওপর ওয়াচিরার ফটোর সামনে দাঁড়াল।

আপনার স্ত্রী ?

হ্যাঁ।

কি নাম ?

ওয়াচিরা।

বেশ নাম তো! ছেলেমেয়ে আছে ?

আছে। একটি ছেলে, একটি মেয়ে।

আদর্শ পরিবার। ক'বছর আপনি ওদের ছেড়ে আছেন ?

অনেকদিন।

এদেশে বান্ধবী আছে ?

না। বন্ধু আছেন কয়েকজন।

কোন বান্ধবী নেই ?

এখনো হয় নি।

আপনার দেশে আর কে কে আছেন ?

সবাই আছেন। বাবা, মা, ভাই, বোন।

এ্যালবাম আছে ? দেখতে পারি ?

নিশ্চয়।

পিটার তোষকের নিচে থেকে দুটো এ্যালবাম বার করল। বিছানার ওপর বসে প্রথমটা খুলতেই মিসেস গোয়েল এসে পাশে বসল। ঝুঁকে দেখতে লাগল সুদূর আফ্রিকার অপরিচিত মানুষের আলোকচিত্র। পিটার পরম উৎসাহে তাকে একটার পর একটা ছবি দেখিয়ে সবাকার পরিচয় দিয়ে চলল। একটা ছবি ওয়াচিরার, বিয়ের পর তোলা। দেহের ঊর্ধ্বাঙ্গ অনাবৃত। যৌবনের উত্তাল ঢেউ ওয়াচিরার দেহে। তাকিয়ে পিটারের সর্বাঙ্গ শিরশির করে উঠল।

ভাগ্যবান আপনি। বলল মিসেস গোয়েল।

পিটার আবেশঘন চোখে তাকাল মিসেস গোয়েলের চোখে। বড় কাছে-আসা মুখখানি। টানাটানা কালো চোখ, লাল টুকটুকে ঠোঁট। উষ্ণ নিঃশ্বাসে উঠছে, নামছে একজোড়া বুক। এ্যালবাম পড়ে রইল কোলে, সামনে ওয়াচিরার প্রথম যৌবন। পিটার দুহাতে তুলে নিল পাশের জীবন্ত মুখখানা। তুলে আনল নিজের কাছে, তারপর অন্ধ আক্রোশে তাতে মুখ লাগাল।

বিজয়িনীর গর্ব মিসেস গোয়েলের দৃষ্টিতে। কিন্তু সহজে সে নিজেকে দিল না। প্রথম বিস্মিত অস্ফুট চিৎকার বেরুল তার মুখ থেকে, তারপর কৌশলে সে নিজেকে মুক্ত করল। পিটার তাকে জাপটে ধরল সিংহের শক্তিতে, তার মুখ অসহ্য ক্ষুধার দুঃসহ তাড়নায় মেয়েটির মাথা, কপাল, কান, গাল, গলা লেহন করে একসময় মুখে এসে পৌছল। যতোই মিসেস গোয়েল নিজেকে মুক্ত করতে চায় ততোই পিটারের আক্রোশ বেড়ে গেল। সে বুঝল না, মুক্ত হতে চাইবার ছলনায় মেয়েটি তার হিংস্রতাকে প্রশ্রয় দিচ্ছে, বন্ধন থেকে বেরিয়ে যাবার কৌশল প্রয়োগ করে বন্ধনকে কঠিনতর করছে। ভীষণ দুই শত্রুর মতো চলল তাদের সংঘাত। ক্ষিপ্ত জ্বলন্ত পিটার তাকে একসময় কাবু করে আনল। কঠিন নিষ্ঠুরতার সঙ্গে আদায় করে নিল পুরো পাওনার চেয়েও বেশি। অচেতনপ্রায় তার দেহকে পরিত্যাগ করে পিটার যখন অবসাদে নিস্তেজ হল, তখন বাইরে জোর বর্ষা, মেঘের গুরু গর্জন, বিদ্যুতের কুটিল ঝলকানি।

ঝড় চলল পিটার কাবাকুর জীবনে কয়েকদিন। ভয়ঙ্কর ভীষণ সে ঝড়। দিনেরবেলা দেখা হলে মিসেস গোয়েল চোখের একটুকরো ঝিলিক ছাড়া পরিচয়ের আর কোন স্বীকৃতি দেয় না; রাত্রের অন্ধকারে সে আসে পিটারের

ঘরে ; সঙ্গে আনে তুফান। সারাদিন পিটার কোন কাজে মন বসাতে পারে না, কেমন একটা জ্বালাময় অতৃপ্তি শিরায় শিরায় নিরন্তর আঘাত করে। রজনীর নির্জনতায় নিজের জান্তব বুভুক্ষায় নিজেই সে ভয়ার্ত হয়ে ওঠে। রুদ্ধ-নিঃশ্বাসে অপেক্ষা করে দরজার পরিচিত আন্দোলনের। মিসেস গোয়েল কোন-দিন আসে বারোটায়, কোনদিন বা তারও পরে। রোজ সে নতুন করে পিটারকে ক্ষেপিয়ে তোলে, রোজ তাদের হিংস্র প্রেমের নবতর ভয়াল প্রকাশে পিটার চমকিত হয়। প্রভাত গড়িয়ে অনেক বেলায় যে-ঘুম ভাঙে তা ক্লান্তির স্তূপ। সারাদিন মনের কোণে কোণে নতুন ক্ষুধার বিষ জমে ওঠে। সে জমাট বিষ রাত্রে কঠিন, কুটীল, লালস আঘাত-প্রত্যাঘাতে পিটার উদ্‌গার করে দিতে চায়, কিন্তু পরিশ্রান্ত দেহের ক্লান্ত নিদ্রা যখন উত্তীর্ণ সকালে ভাঙে, দেখতে পায়, আরও ভারী হয়ে জমেছে গরলের বোঝা ; সারাদিনে সে বিষ আবার সর্বদেহে ছড়িয়ে পড়ে।

যে নারী রাত্রিতে তার শয্যাসঙ্গিনী, দিবসে সে তাকে স্বীকার করে না।

তুমি দিনেরবেলা আমাকে যে চিনতেও পার না।—মিসেস গোয়েলকে একরাত্রে বলল পিটার।

রাত্রিবেলা তাই এতো বেশি করে চিনতে পারি। বাঁকা হাসি হেসে জবাব দিল মিসেস গোয়েল।

আসলে তুমি আমাকে বন্ধু বলে গ্রহণ করতে চাও না।

বন্ধু হয়ে কি করবে ? যা হয়েছ তার চেয়ে কি তা বেশি ?

এতে আত্মার তৃপ্তি নেই।

আত্মা আবার কি ? ওসব শুধু কথা।

আমি নিগ্রো বলে তুমি আমায় দিনেরবেলা দূরে রাখ। তোমার বন্ধুদের সঙ্গে একত্র আমার স্থান নেই।

ওসব কথা রাখ। তোমার সঙ্গে আমার রাতের বন্ধুত্ব। তুমি আর আমি।

নিজের নামটি পর্যন্ত সে বলতে রাজী হয় নি। নাম দিয়ে কি হবে ? আমি মিসেস গোয়েল। মদনমোহন গোয়েলের স্ত্রী। বিবাহিতা স্ত্রী। তাকে আমি ত্যাগ করেছি, না সে আমায় ত্যাগ করেছে, এ প্রশ্ন অবান্তর। দুজনেই দুজনকে ত্যাগ করেছি। তবু আমি মিসেস গোয়েল। মনে কর আমি ঈভ,

আদিম রমণী। তোমার কাছে আমি ঈভ, আমার কাছে তুমি আদম। এই রাত্রের অন্ধকারে চুরি করা আমাদের স্বর্গ। 'ঈভ'-কে জড়িয়ে পিটারের মনে হত নরম একটা সাপ তার দেহের সঙ্গে লেপ্টে আছে, মুখের মধ্যে দংশন করে বার বার বিষ ঢালছে, শরীরের পাকে পাকে জড়িয়ে সবটুকু সত্তা নিঙ্ড়ে বার করছে।

এমনি করে মাস দুই কেটেছিল। প্রচণ্ড অবক্ষয়ের সুদীর্ঘ দুটি মাস। তারপর একদিন হঠাৎ যেমন পিটার বন্দী হয়েছিল, তেমনি হঠাৎ সে মুক্তি পেল। অনেক দাম দিয়ে। মনে হল, প্রাণ দিয়ে। মনে হল, আমি মরলাম। এর পরে আর আমার জীবন নেই। কিন্তু মৃত্যুর মধ্যেও মুক্তির আস্বাদে পিটারের আত্মা বাঁচল।

পর পর সাত রাত্রি মিসেস গোয়ল আসে নি। সারারাত অনিদ্র যন্ত্রণায় পিটার ছটফট করেছে। পাগল হয়েছে দেহ, ছুটে যেতে ইচ্ছে করেছে ঈভের ঘরে, সাহস হয় নি। হুল্লোড়ে নাচ-গানের আওয়াজ শুনে উড়ে গেছে তার মন, বিছানা ছেড়ে ঘরে বড় বড় পা ফেলে হেঁটে বেড়িয়েছে; যা আগে কখনো করে নি, জ্বালা নিবোতে গিয়ে বার বার মদ খেয়েছে; জ্বালা বেড়েছে আরও বেশি।

দিনেরবেলা দু'-একবার দেখা হয়েছে, কিন্তু মিসেস গোয়েলের চোখে সামান্য ঝিলিকটুকুও জ্বলে ওঠে নি।

ঈভ আদমকে অস্বীকার করেছে।

আট দিনের দিন মিসেস গোয়েল আবার এল পিটারের ঘরে। অবাক হল পিটার তাকে দেখে। প্রসাধনের জৌলুস নেই। সাধারণ একটা সিল্কের শাড়ি পরনে, মুখে বিষণ্ণ গাম্ভীর্য। বিস্মিত পিটার তাকিয়ে রইল তার দিকে, এ যেন অন্য রমণী।

ঈভ এসে পিটারের পাশে চেয়ারে বসল।

তোমার এতদিনে সময় হল? চাপা উত্তেজনায় প্রশ্ন করল পিটার।

ঈভ উত্তর দিল না। মাথা নিচু করে রইল। পিটার দেখল দু' ফোঁটা চোখের জল তার গাল বেয়ে নেমেছে।

বিচলিত পিটার এগিয়ে এসে তাকে টানতে চাইল। সাপের মতো ফোঁস করে উঠল ঈভ।

ছুঁয়ো না আমাকে! তুমি আমার সর্বনাশ করেছ!!

সর্বনাশ ? আমি ? পিটারের হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে গেল।

হ্যাঁ, তুমি ! তুমি আমাকে ধ্বংস করেছ। আমার বেঁচে থাকবার পথ রাখ নি। ঈভের চোখে আগুন।

কেন ? আমি কি করেছি ? বোকার মতো তাকিয়ে রইল পিটার।

এখনো বুঝতে পারছ না ? তুমি যে এতো নির্বোধ তা কি আমি জানতাম ? না, না, নির্বোধ তুমি নও ! তুমি শয়তান ! আমি তোমার জীবনে একটু আনন্দ দিতে এসেছিলাম। তুমি তার সুযোগ নিয়ে আমার সর্বনাশ করেছ। একটা নিগ্রোর সন্তান পেটে নিয়ে আমি বাঁচব কি করে ? মৃত্যু ছাড়া আমার উপায় নেই। আমি মরব। মরার আগে তোমাকেও শেষ করে যাব। পুলিসকে লিখে যাব তুমি আমায় ধর্ষণ করেছ।

নিগ্রোর সন্তান ! পিটারের মাথা ঘুরে গেল। ঘরটা চলন্ত রেলের চাকার মতো প্রচণ্ড কুৎসিত শব্দে ছুটল। তার সঙ্গে ছুটল সবকিছু বিছানা, আসবাব, দেয়াল, বইপত্র, আর বিরাট একটা বিষ-কুটিল সাপ।

কোন কথা জুটল না পিটারের মুখে। মাথা নিচু করে বসে রইল। মিসেস গোয়েল একটানা চালিয়ে গেল, কর্কশ রুদ্ধস্বরে, ইনিয়ে-বিনিয়ে বিপদের বিলাপ।

অনেকক্ষণ পর পিটার বলল, তুমি ঠিক জান, আমিই দায়ী ?

এ কথা তো তুমি বলবেই। তুমি নিষ্ঠুর বর্বর তাই একথা বলতে পারছ। তোমার একবিন্দু কৃতজ্ঞতা পর্যন্ত নেই। আমাকে বিপদে ফেলে এখন পালাতে চাইছ ! বিশ্বাস কর আর নাই কর, দু' মাস আর কোন পুরুষ আমার জীবনে আসে নি। সবাই আমার ব্যবহার দেখে অবাক হয়েছে। বলেছে, তুমি কি বদলে গেলে ? হায় কপাল, তোমার কাছে বিশ্বাস রাখতে গিয়ে আমার এই দশা হল ! তুমি যে এরকম করবে আমি আগেই জানতাম। মৃত্যুই আমার একমাত্র পথ। মরবার আগে তোমাকে সব বলে গেলাম। কালই পুলিস আসবে। যদি পার আজ রাত্রে পালাও।

কালই পুলিস আসবে !! তার মানে, আজই রাত্রে মরবে মিসেস গোয়েল ! সাপ মরবে বিষ খেয়ে ? তন্বী দেহটা নীল হয়ে যাবে, বরফের মতো ঠাণ্ডা ? তারপর মর্গে ডাক্তার তাকে কাটবে দীর্ঘ, তীক্ষ্ণ ছুরি দিয়ে ? কেটে দেখবে তার গর্ভে জীবনের অঙ্কুর ? সে জীবন আমার দেহ থেকে সংক্রামিত হয়েছে ঐ সর্পিল দেহে ? বিষের অঙ্কুর ?

অন্যকোন উপায় নেই ?—চিন্তার জাল ছিঁড়ে প্রশ্ন করল পিটার।

উপায় থাকবে না কেন ? কিন্তু টাকা নেই আমার।

কত টাকা চাই ?

এ ক'দিন অনেক খোঁজ করেছি। অন্তত তিন হাজার।

তিন হাজার !!

খুব কম করে। হঠাৎ কান্নায় ভেঙে পড়ল মিসেস গোয়েল। পিটার, পিটার, তুমি দাও আমাকে তিন হাজার টাকা। আমি মরতে চাই নে। তিন হাজার টাকা হলেই আমার বিপদ কেটে যায়। আমি মাসখানেকের ছুটি নিয়ে মুক্ত হয়ে আসি। দাও আমায় তিন হাজার টাকা। তাহলে আর কোন বিপদ থাকে না।

তিন হাজার টাকা ! তিল তিল করে এতদিন যা পিটার সঞ্চয় করেছে তার চেয়ে অনেক বেশি। বিদেশে কে তাকে ধার দেবে ? ব্যাঙ্কে বড় জোর হয়তো হাজার দু-এক হবে। বাকী এক হাজার ? কোথায় যাবে, কার কাছে হাত পাতবে ? কোন্ প্রশ্নে কি সদুত্তর দেবে ?

তিন হাজার টাকা আমার নেই।

কত আছে ?

হাজার খানেক ব্যবস্থা করতে পারি।

মাত্র হাজার ? তাতে তো কিছুই হবে না ? আমার নিজের এক পয়সা জমান নেই। চাইনে আমি তোমার হাজার টাকা। তার চেয়ে বল না কেন, তুমি আত্মহত্যাই কর।

দু' হাজারে হবে তোমার ? তার চেয়ে এক পয়সা বেশিও আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

খানিকক্ষণ চুপ করে রইল মিসেস গোয়েল।

কবে পাব টাকাটা।

কখন চাও।

কালই।

বেশ, কাল রাত্রে এস। পাবে।

পরের রাত্রে বারোটা পেরিয়ে মিসেস গোয়েল এল। গায়ে কেবলমাত্র ড্রেসিং গাউন জড়ান।

পিটার বাক্স খুলে এক তাড়া নোট তাকে দিয়ে বলল, দুই হাজার আছে। গুণে দেখ।

নোটগুলির চকচকে চেহারা খুশী করল মিসেস গোয়েলকে।

বলল, পিটার, তুমি আমাকে বাঁচালে।

পিটার চুপ করে রইল।

চোখের সামনে এসে মিসেস গোয়েল ঈভ হতে চাইল। দেহের সামান্য দোলায় ড্রেসিং গাউনটা কাঁধ থেকে সরে গেল। পিটার কঠিন দৃষ্টিতে একবার দেখল। সরে গিয়ে দরজা খুলল। বলল, বেরিয়ে যাও। আমার কাছে আর কক্ষনো এস না।

কুৎসিত প্রতারণার সন্দেহ পিটারের মনে প্রথম থেকেই ছায়াপাত করেছিল; নিজের নিরুপায় বিপন্ন অবস্থা উপলব্ধি করে মুখে প্রকাশ করে নি। সে সন্দেহ সহজেই মজবুত হল। মিসেস গোয়েল যেমন ছিল রইল তেমনই। ছুটি নিয়ে গেল না কোথাও। রাত্রে তার ঘরে মার্কিনী নাচের হুল্লোড় সমানে চলল। করিডরে, ডাইনিং হলে, পিটার দেখল তার নিয়মিত উপস্থিতি। পিটারের মোহ তখন কেটে গিয়েছে, যে জান্তব ক্ষুধায় তাড়িত হয়েছে এতদিন তার আত্মা, এখন সেখানে শুধু একটা বিরাট পাথরের বোঝা। গ্লানির, অপমানের, পরিশোচনার পাথর। একটা সর্পবুদ্ধি স্ত্রীলোকের ফাঁদে মূর্খের মতো ধরা পড়ে সে শুধু নিঃস্ব হয় নি, তার অন্তর দীন-দরিদ্র হয়ে গেছে। নিজেকে নিয়ে নিজের কাছে এত লজ্জা জীবনে আর কোনদিন পায় নি। আমার সব গেছে—বার বার মন তার কেঁদে উঠেছে—আমার মান, আদর্শ, তেজ, পুঁজি, সব। আবার আমাকে প্রথম থেকে শুরু করতে হবে।

মিসেস গোয়েলের প্রকৃত পরিচয় সে পেল একটি ইরানী ভদ্রলোকের কাছে। ধবধবে দুধে-আলতা রং, মাথায় প্রশস্ত টাক, লাল টুকটুকে ঠোঁট, শান্ত, ধীর মানুষটি। দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ে মধ্যপ্রাচ্য ইতিহাস পড়ান। নিচু গলায় কথা বলেন। প্রায় সর্বদাই বই-এ ডুবে থাকেন। অথচ এ বাড়ির বাসিন্দাদের সম্বন্ধে যতো খবর রাখেন ততো বোধ হয় আর কেউ নয়।

পিটার কাবাকুর সঙ্গে মহম্মদ জরলুর খানিকটা আলাপ ছিল। আফ্রিকান দেশগুলির সংস্কার, ধর্ম, সমাজব্যবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা করতে জরলু আসতেন মাঝে মাঝে পিটারের ঘরে। কখন কখন ব্যক্তিবিশেষ নিয়ে আলোচনা হত। পিটার বিস্মিত হত জরলুর তথ্য-সজাগ মনের পরিচয়ে।

জরলু একদিন পিটারকে চায়ের নেমন্তন্ন করল। কথাবার্তায় উঠল মিসেস গোয়েলের নাম। পিটার শ্বাস চেপে শুনল। জরলু বলল, মিসেস গোয়েলকে জান না? জেনে তোমার কাজও নেই! খুব সাবধান হয়ো যদি কখন পরিচিত হও। তিনদিনের মধ্যে সে তোমার সঙ্গে বিছানায় শোবে। তিন মাসের মধ্যে তোমার কাছে কয়েক হাজার টাকা আদায় করবে। আমি এখানে পাঁচ বছর আছি। আমিই জানি এরকম তিনটে ঘটনার কথা। মাদ্রাজী এক ছোকরা প্রায় পাগল হতে বসেছিল। সাবধান, সি ইজ এ স্নেক; সাপকে যেমন এড়িয়ে চল, এ মেয়েটিকেও তেমনি দূরে রেখে চলবে।

নয়

মিসেস গোয়েল জলজ্যান্ত কাঁটার মতো পিটার কাবাকুর মনে বিঁধে ছিল অনেককাল। স্তূপীকৃত আত্মগ্লানি, আত্মলাঞ্ছনার পাহাড়। নিজের কাছে দীর্ঘদিন বড় প্রতারিত মনে হয়েছে পিটার কাবাকুর। বার বার মনে হয়েছে অনেকদিনের পুরাতন মনিব অ্যাসবির কথা, প্রতারণার পুঞ্জীভূত গ্লানি বহন করে যে অ্যাসবি গিয়েছিল যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দিতে। আমি তো প্রাণ দিতে ভারতবর্ষে আসি নি, আমি এসেছি প্রাণের পাথেয়-সন্ধানে। নিজে বাঁচতে, আফ্রিকার বাঁচবার মতো কিছু পুঁজি সঙ্গে নিতে। তবে কেন আমি মূর্খের মতো দুহাত ভরে গরল পান করেছি, যে আমি অমৃতের সন্ধানী? শুধু লালসার আগুনে পুড়ে অঙ্গার হই নি, অনেকদিনের সযত্ন সঞ্চিত অর্থ ক্ষণিকের দুর্বলতায় বিসর্জন দিয়েছি। কতটুকু আমার জীবনের সঞ্চয় যা আমি এমন বেপরোয়া অপচয় করতে পারি?

এর পর পিটার স্ত্রীলোকের সান্নিধ্য পিটার দীর্ঘদিন সযত্নে পরিহার করেছে। ওরা আমায় অবহেলা করে, কেন না আমি নিগ্রো, এই থাক আমার দুঃসহ সান্ত্বনা। এ অনুভূতি আমায় কৃপণের মতো সঞ্চয়ী করবে। আমার পৌরুষের অপচয় হবে না, অবমাননা হবে না। নাই-বা পেলাম সহচরীর সমানুভূতি, প্রবাস হলই বা মাঝে মাঝে নিঃসঙ্গতায় দুঃসহ?

দীর্ঘ আত্মশাসনে পিটার গ্লানির অন্ধকার কিছুটা কাটিয়ে উঠেছিল।

বহুদিন নিজেকে ভোগবঞ্চিত রেখে মনে হয়েছিল অন্তর নির্মল হল। বুঝতে শুরু করেছিল চাওয়ার পরিণতি পাওয়াতে নয়, আরও চাওয়াতে, যে চাওয়ার শেষ নেই। না-পেয়েও যে পরিতৃপ্তির সন্ধান পাওয়া যায়, তার নাম জ্ঞান। জানতে পারার চেয়ে বড় কিছু নেই। যতক্ষণ জানি না, ততক্ষণ জ্বলি। যখন জানি, তখন হই উজ্জ্বল। দেহকে জানি নে, তাই দেহের জ্বালা; যখন আমি দেহজ্ঞানী, তখন আমার দেহে রহস্যময় তেজ। গান্ধীর আত্মচরিত পড়ে পিটার নিজেকে শাসন করতে শিখল। ধূমপান ছাড়ল। মাঝে-মধ্যে মদ্যপানের লোভ ছিল, ত্যাগ করল। জীবনটাকে সহজ, সরল করে আনল। আগে অভাববোধ জয় করতে হবে, তাহলে সবার সঙ্গে ভাব হবে। অভাব-বোধ কাটলে আমার মন থেকে হিংসা, দ্বেষ, ক্রোধ যাবে। গান্ধীর কোন অভাববোধ ছিল না, তাই তিনি ছিলেন নির্লোভ, নির্ভীক। তাই ইংরেজকে পর্যন্ত তিনি ঘৃণা করতেন না। পিটার ভাবল, আমাকেও দ্বেষমুক্ত হতে হবে। তার আগে হতে হবে প্রলোভনমুক্ত।

ভাবনা ও কার্যের বিরাট অসমন্বয় মানুষের চরিত্রকে বিচিত্র করে। কঠোর আত্মশাসনকে পিটার মনে করল আত্মজয়। জোরকৃত অনীহাকে ভুল করে চিনল নির্লোভ অতৃষ্ণা বলে। শুধু একক্ষেত্রে পিটার নিজের শক্ত বোঝাপড়া করল। নোংরায় আর মুখ দেব না, হাত লাগাব না। সুপেয় জলের সন্ধান মেলে তো তৃষ্ণা মেটাব; কিন্তু পচাই মদের প্রদাহ আর নয়। সামান্য, সীমিত, দীর্ঘাংশ-উত্তীর্ণ জীবনের বাকীটুকু করব পাথেয়-সন্ধান, পথের অবক্ষয়ে নিঃশেষিত হব না। এককথায়, বাঁচব। মরব না।

• •

পার্বতীকে না জানলে পিটারের বুকে মিসেস গোয়েল নামক বিষপাত্র সঞ্চিত থেকে যেত। পার্বতী সে বিষ দূর করল। শ্রদ্ধায়, সমব্যথায়, সমানুভূতিতে, অর্থাৎ সহজ, সুস্থ বন্ধুত্বে, পিটার প্রশান্ত হল, অন্তর হল প্রসারিত। পার্বতীর দেহসৌন্দর্য নেই, কিন্তু বলিষ্ঠ মনের ঐশ্বর্য আছে। তার মধ্যে কোনরকম কৃত্রিমতার একান্ত অভাব পিটারকেও স্বচ্ছ, নির্মল ও নির্ভেজাল করে তুলল। পার্বতীর মধ্যে সবচেয়ে যে জিনিস পিটারের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করল, তা নির্ভীকতা ও আত্মবিশ্বাস। কোন মানুষকে, কোন অবস্থাকে, পার্বতীর ভয় নেই। নিজের সঙ্গে সর্বদাই তার একটা মিতালি চলেছে। রোজ মনের সঙ্গে খোলাখুলি কথা বলে সে যেন নিজেকে নতুন করে, পূর্ণ জেনে

নিচ্ছে। পার্বতীর ভয়হীনতায় অহঙ্কার নেই; দম্ভ নেই। এর কিছুটা তার বিপ্লবী শিক্ষার উত্তরাধিকার, কিছুটা বাবার থেকে পাওয়া। গ্রামে কাজ করতে এসেছে শহর থেকে পলায়নের জন্যে নয়। শহরে জীবনের রসদ পায় নি; তাই গেছে গ্রামে।

যদি গ্রামেও না পাও?—একদিন প্রশ্ন করেছিল পিটার।

তাহলে বুঝব গলদ আমার। আমি এ দেশের মেয়ে। এখানেই আমার সবকিছু। ভারতবর্ষ বেঁচে আছে (বা মরে আছে) তার গ্রামে, এ বুলি যদি অর্থহীন না হয় তাহলে শহরে যা নেই, তা গ্রামে নিশ্চয় আছে।

কি সে জিনিস, যার সন্ধানে তুমি শহর ছেড়ে গ্রামে এসেছ?

জীবনের তাড়না।

বুঝলাম না।

বোঝবার নয়। অনুভব করবার। অনেককিছু আছে যা বুদ্ধিকে পরাস্ত করে।

বোঝাতে না পার, অনুভব করিয়ে দাও।

অনুভূতি তো দেওয়ার নয় পিটার, পাবার। আমি নিজেই কি তার অর্থ বুঝি? ভারতবর্ষকে স্বাধীন করবার জন্যে গান্ধী জীবনভোর সংগ্রাম করলেন। যেদিন ভারত স্বাধীন হল, তিনি উৎসবমুখর রাজধানীর বহুদূরে হিংসা-বিধ্বস্ত কলকাতার এক পল্লীতে হঠাৎ-পশুতে-পরিণত মানুষদের মধ্যে। ভারতবর্ষ নবজন্ম পেল, তার জন্মদাতা শান্তির, মৈত্রীর জীবনবাণী নিয়ে ঘুরে বেড়ালেন বিহার, দিল্লী, বাংলা; আহ্বান এল আর্ত মানুষের, ছুটে গেলেন পূর্ব-পাকিস্থানের নোয়াখালি। মানুষ পশু হয়ে মানুষকে কতখানি হীন, নিচ, লাঞ্ছিত করতে পারে দেখলেন গ্রামের পর গ্রামে। আমি সে দৃশ্য ভুলতে পারি নে পিটার। লাঠি-হাতে, অর্ধ-নগ্ন বৃদ্ধ চলেছেন গ্রামের পথে, রোদে-পোড়া মাঠ পেরিয়ে, নড়বড়ে বাঁশের পুল বেয়ে। বিধ্বস্ত পল্লীতে লুন্ঠিতা রমণীর লাঞ্ছনা, বিধবার ক্রন্দন, পুত্রহীনা জননীর আর্তনাদ। মানুষের চোখে-মুখে হয় কুটিল হিংসা, নয় স্থির আতঙ্ক, নয়তো বোবা বিহ্বল শূন্যতা। এদের মধ্যে তিনি জীবনের বীজ বুনলেন। কোনদিন কোন অবস্থায় যিনি পরাজয় মানেন নি, আজও তাঁর জয় হল। কিন্তু হারলাম আমরা, যারা তাঁর পথে চলতে গিয়ে, চলতে পারলাম না।

তুমি তাঁর সঙ্গে গিয়েছিলে। আমি শুনেছি। যদিও তুমি কোনদিন বল নি।

আমি তাঁর সঙ্গে যাই নি। বাবা আমাকে তাঁর কাছে পাঠিয়েছিলেন। তাঁর লোকের দরকার ছিল। আমার দরকার ছিল নতুন আশ্রয়, নতুন অবলম্বন।

তোমরা হারলে কিসে?

জীবনের শেষ অধ্যায়ে তিনি এমন মহান্ হলেন যে আমরা তাঁকে আর সহ্য করতে পারলাম না। দিল্লী বসে আমাদের চোখে ভারতবর্ষ তখন অন্যরূপ। আমরা ভাবলাম তিনি মহাত্মা হয়েই তুষ্ট থাকবেন, আরও মহান্ হবেন না। কিন্তু আমাদের তিনি নিরাশ করলেন। তাঁর মাহাত্ম্য এমন প্রসারিত হল যে আমরা ভয় পেলাম। ভাবলাম, আদর্শের বশে তিনি স্বাধীন ভারতবর্ষের স্বার্থহানি করবেন।

তুমি নিশ্চয় কোন একটা ভুল করছ, পার্বতী। গান্ধী শাসনভার হাতে নিলেন না। তাঁর ও অন্যদের দৃষ্টির প্রভেদ তো হবেই।

হয়তো করছি। কিন্তু আমার বাবাও শাসক হতে চাইলেন না। মন্ত্রী হবার জন্যে অনুরোধ এলে তিনি হেসে বললেন, ও আমার জন্যে নয়।

এর মধ্যে কি পলায়ন ছিল না?

না। একেবারেই নয়। বাবা বললেন, শাসন করবে তারা যারা অস্থিমজ্জায় শাসক। আমি সারাজীবন গান্ধীর চেলা। সেবক, শাসক নই। ও কাজ আমার নয়।

আর তুমি কি করলে?

আমি কিছুদিন গান্ধীর শুরু-করা কাজ নিয়ে পড়ে রইলাম বাংলায়, বিহারে। কিন্তু একে একে সব নেতারাই রাজপথের, বা রাজনীতি-পথের, পথিক হলেন। গান্ধীর কাজ আর এগোল না।

তাই চলে এলে শহরে?

এলাম। কিন্তু শহরে এসেও মন ভরল না। মানুষগুলি কেমন যেন বদলে গেছে, মনে হল। হঠাৎ যেন মানুষের ক্ষুধা বেড়ে গেছে ভয়ানক বেশি। বহুদিনের বঞ্চিত ভারত হঠাৎ যেন বড় বেশি ভোগী হয়ে উঠেছে। সংগ্রামী-দিনের সরল সহজ জীবন যেন বড় তাড়াতাড়ি ফুরিয়ে গেল।

আগেও একদিন তুমি এমনি কিছু বলেছিলে। সেদিনও প্রশ্ন করেছিলাম, আজ আবার করছি, অবক্ষয়টাই শুধু দেখলে? নতুন ভারতের গর্বিত চেহারা দেখলে না?

দেখলাম বৈকি! না দেখলে বোধকরি আমিও এতদিনে অন্যপথে মোড় ফেরাতাম। হয়তো নির্বাচনের বন্যায় অনেকের মতো আমিও ভেসে গিয়ে কোন প্রাদেশিক বিধান সভার পেছনের আসনগুলির একটা দখল করে নিজের মাহাত্ম্যে নিজেই মুগ্ধ হতাম। সন্ত্রাসবাদী রাজনীতিতে যাঁর মন্ত্রে ছোটবেলায় আমি দীক্ষিত হয়েছিলাম তার সঙ্গে একবার এলাহাবাদে দেখা। সেটা উনিশ-শো পঞ্চাশ সাল। সরকারি সাহায্যে গোটা-কয়েক লরী কিনে মাল সরবরাহের ব্যবসায়ে তিনি বেশ দু' পয়সা করেছেন। পারমিটের জন্যে রোজ রাজদপ্তরে হাজির হন, ঘুষ দিয়ে যাদের চরিত্রনাশ করেন বাড়ি এসে করেন তাদেরই চৌদ্দপুরুষ উদ্ধার। সরকারি বিধি-নিষেধ লঙ্ঘন করে গম, চাল পাঠান অন্য প্রদেশে। আমি অবাক হয়ে বললাম, শেষে, আপনিও স্মাগ্‌ল্ আর ব্ল্যাক-মার্কেট করছেন? বাঁকা হেসে জবাব দিলেন, যে কালের যা নিয়ম। আমি বললাম, কালটা তো ভালোই ছিল, আমরাই তাকে কুকাল করছি। তিনি বললেন, যে-কালে ঘুষ না দিলে একটা পারমিট পাওয়া যায় না তার নাম সুকাল? আমি বললাম, অন্যায় যে করে, আর অন্যায় যে সহে—। তিনি বলে উঠলেন, রাখো, রাখো, ওসব বড বড় কথা। ও এককালে অনেক শুনেছি, অনেক বলেছি।

এমন সময় তাঁর ছোট ভাই এল। এঞ্জিনীয়র সে, দামোদর ভ্যালীতে বিদ্যুতের বিরাট কারখানা নির্মাণ করছে। তার কাছে নতুন ভারতের পরিচয় পেলাম। দামোদর উপত্যকার চেহারা একদিন কি রকম বদলে যাবে বলতে বলতে সে উত্তেজিত হয়ে উঠল। আমি দু' ভাই-এর দিকে তাকিয়ে প্রভেদটা বুঝলাম। একজন মৃত ভারতবর্ষের শবে দাঁড়িয়ে শ্মশানচারী, অন্যজন নবজাত ভারতবর্ষের বিরাট ভবিষ্যতের বাস্তব সম্ভাবনায় দৃঢ়-বিশ্বাসী।

কিন্তু আমার নাড়ীর টান যে ঐ পুরাতন ভারতের সঙ্গে। আমি তো তার হঠাৎ-মৃত্যু সহজে সইতে পারি নে। একুশ বছরের যে তরুণ ছেলেটা, বিদ্যুৎ একদিন প্রাচীন ভারতবর্ষকে কিভাবে জাগিয়ে তুলবে বলতে বলতে অস্থির হয়ে উঠল, তাকে তো আমি চিনি না। আমি যাকে চিনি তিনি একদিন আমাকে বিপ্লবী করেছিলেন, একদিন যাঁর তেজের তুলনা ছিল না, আজ যিনি বিন্দুমাত্র

লজ্জা না পেয়ে ঘুষ দেন, স্মাগ্‌ল্‌ করেন, চোরাকারবার করেন। তাঁর অবক্ষয় আমাকে পীড়া দেয়।

তাই তুমি চলে এলে গ্রামে? প্রশ্ন করল পিটার।

তক্ষুনি নয়। বাবার কাছে মাস-ছয়েক কাটালাম। দেখলাম বাবাদের মতো আজীবন গান্ধীবাদীরাও গান্ধীকে দেবতা সাজিয়ে সকাল-সন্ধ্যা পুজো দিয়ে পরিতৃপ্ত। যা ছিল জীবনবেদ, তা হয়ে উঠেছে আত্মতৃপ্ত অর্চনার প্রাণহীন অনুষ্ঠান মাত্র।

হায়, হায়। তুমি এবার কি করলে?

পথের সন্ধানে বার হলাম। বড় শূন্য মনে হল নিজেকে। বড নিরাশ্রয়, নির্বান্ধব। বুঝলাম, আমার কর্তব্য আমাকেই নির্বাচনে করতে হবে। বাবা বললেন, গ্রামে গিয়ে কাজ কর। তিনি তো বলেই খালাস, কিন্তু গ্রাম কি আমি চিনি? তাই একদিন চলে এলাম দিল্লীতে।

একটু থেমে পার্বতী একবার ভাবল। হঠাৎ হাসি পেল তার। মনে পড়ল একটা ঘটনা, একটি তরুণ ছেলে, আর নিজের একটুকরো সাময়িক অর্থহীন দুর্বলতা।

বলল, দিল্লী এসে একটা মজা হল। ভাবতেও এখন হাসি পায়। কিন্তু আজ নয়, পরে একদিন বলব।

প্রধানত দুটো কারণে পিটার দেশে ফেরা মনস্থ করেছিল। প্রথম কারণটাই বড়। দেশ থেকে বহুদিন খবরের অভাবে মন তার অস্থির। এভাবে আর থাকা যায় না, এ বিচ্ছিন্নতার মধ্যে। যদি কিনিয়া পুড়ে অঙ্গার হয় সে আগুনে আমাকেও পুড়তে হবে। দ্বিতীয় কারণ, ভারতবর্ষে থাকার প্রয়োজন শেষ হয়ে এসেছে। মনে হচ্ছে, যতটুকু পেয়েছি প্রথম অবস্থানের পক্ষে যথেষ্ট।

আরও একটা কারণ ছিল, যা দ্বিতীয়ের অংশ। যতোদিন পিটারের মনে জ্বালা ছিল, ততোদিন নিজেকে নিরাপদ মনে হত। জ্ঞান, বুদ্ধি, অভিজ্ঞতা সংগ্রহের মধ্যে সতত-সজাগ একটা চেতনা ছিল নিগ্রো স্বদেশ ছাড়া আর কোথাও শ্রদ্ধা পায় না, মানুষের সম্মান পায় না। ভারতের হিতৈষী, অনুভূতিশীল বন্ধু পিটার পেয়েছিল, কিন্তু তার সঙ্গে পরিষ্কার বুঝেছিল, এদেশের মানুষ আফ্রিকার লোকেদের এখন শ্রদ্ধা করতে জানে না। সে জানত, পরাধীন

দেশের মানুষ অন্য সমাজে শ্রদ্ধা পায় না সহজে। ভারতীয় সমাজের অনেক ক্রটী-বিচ্যুতি, অপরাধের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়েও পিটারের মনে মোটামুটি এদেশ সম্বন্ধে শ্রদ্ধা ও স্নেহই সঞ্চিত হয়েছিল। কিন্তু সে জানত আগে আফ্রিকার মুক্তি, তারপর পৃথিবীর দরবারে তার সম্মানের আসন।

পার্বতীর বন্ধুত্ব পিটারের অন্তর্জ্বালা দূর করল; অতএব, তাকে সতর্ক করল। পার্বতীর সঙ্গে একত্র কাজে ও আলাপনে, একত্র অনুভূতিতে, ভারতবর্ষকে পিটার অনেকখানি চিনল এবং নিজেকেও বেশি করে জানল। বুঝতে পারল সে অনেক বদলে গেছে। ছিল কিনিয়ার নিগ্রো, হয়ে উঠেছে পৃথিবীর মানুষ। তার মন, চিন্তা, অনুভূতি ভৌগোলিক সীমানা উত্তীর্ণ হয়ে আশ্চর্য পাখা মেলেছে। উপজাতি-সমাজের প্রাচীন প্রভাব থেকে মুক্ত হতে চলেছে। স্বাধীন ভারতকে পার্বতীর মন ও দৃষ্টি দিয়ে জানতে শেখার সঙ্গে সঙ্গে আফ্রিকার অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতকেও সে নতুন করে জানতে পারছে। একটা নতুন মানুষ যেন তার চেতনার গর্ভ হতে অঙ্কুরিত হয়েছে, সে গিকুয়ু উপজাতির পিটার কাবাকু নয়, সে নতুন-জানা এশিয়া-আফ্রিকার সন্তান। পিটার বুঝতে আরম্ভ করেছে, স্বাধীনতা কিনিয়ার, সারা আফ্রিকার, সমস্যা শেষ করবে না, সমস্যার হবে শুরু। আজ সবকিছু বিদেশী শাসকের ওপর চাপিয়ে দেওয়া চলে, কাল বহু মানুষের প্রাণতৃষ্ণা আমাদেরই পূর্ণ করতে হবে। আজ যারা একসঙ্গে কাজ করছে তারাই হবে কাল আত্মকলহে লিপ্ত, আত্ম-বিদ্বেষে, সংঘাতে কলুষিত, দুর্বল। একদিন স্বারি, মোহেরেকা, রুকার বাইরে পিটার ভাবতে পারতো না; ক্রমে তার অনুভূতি গিকুয়ু থেকে কিনিয়া, কিনিয়া থেকে আফ্রিকায় প্রসারিত হয়েছিল। এবার সে আরও পরিব্যাপ্ত হল। মাঝে মাঝে মনে হত কিনিয়া যেন অনেক দূরে, বহু ব্যবধানের ওপারে। আমি যেন কোনদিন ওখানে ছিলাম না, কোনখানে কোনদিন ছিলাম না। একদিনকার অতিনিকট অনুভূতি আজ তা না হলে, কেন এত ক্ষীণ?

মনের মধ্যে হাতড়ে বুঝতে পারতো পার্বতী তার বর্তমানকে সুন্দর করেছে, তাই অতীতের টান হালকা। ভয় হত। এ দুর্বলতা প্রশ্রয় পেলে কোথায় গিয়ে শেষ হবে? যাতে পিটারের পূর্ণতা, সার্থকতা ও প্রশান্ত সমাপ্তি তা দিতে পারবে, না ভারতবর্ষ, না পার্বতী। শুধু সে মরীচিকার পশ্চাতে ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত একদিন পথের মাঝখানে মুখ থুবড়ে পড়ে থাকবে। নারীর কাছে পুরুষ যে পরিপূর্ণতা কামনা করে পার্বতী তা আমায় কোনদিন দেবে না। সে আমার

মন খুলেছে, দৃষ্টি প্রসারিত, অনুভূতি সূক্ষ্মতর করেছে। আমার বাসনা বাড়িয়েছে, তৃষ্ণা প্রখর করেছে। কিন্তু তৃপ্তির সন্ধান সে আমায় দেবে না। যে আলো সে জ্বেলেছে আমার অন্তরে, তার সন্ধান পর্যন্ত সে জানে না। এ আলো কোনদিন নিভবে না। ওয়াচিরা জানবে না, চিনবে না এ আলো। যে পিটারকে সে পূর্ণপাত্র অমৃত পান করিয়েছিল, একদিন সে দেখবে তার চোখে অন্য আগুন, অন্য বেদনা। প্রশ্ন করবে, তুমি এমন বদলে গেছ কেন? তুমি কি সেই? পিটার জবাব খুঁজে পাবে না। আমি সেই, কিন্তু পুরো সে-ই নয়। যে পিটার কাবাকু কিনিয়া ত্যাগ করেছিল সে আর ফিরে যাবে না। যে যাবে, সে শুধু কিনিয়ার নয়, সে ভারতেরও। সে পৃথিবীর।

এবার তাড়াতাড়ি ফিরতে হবে। শুধু কিনিয়ার আগুনের আহ্বান নয়। ধরা পড়ার আগে। পার্বতীকে কোনমতেই জানতে দিলে চলবে না, আমি পালাচ্ছি। এতদিনের নিকট-বন্ধুত্বে আমি একমুহূর্তের চপলতা করি নি, বুঝতে দিই নি নিজের কাঠামোয় আমি সুস্থির নই। এই হল পার্বতীর কাছে আমার প্রীতি ও শ্রদ্ধার মূল কারণ। সে জেনেছে, আমি দুর্বল নই, লোভী নই, শূন্য নই, নিঃস্ব নই। আমার আছে, তাই আমি সঞ্চয় করতে পারি—যদি না থাকতো লোভের বশে যা পেতাম তাই মুখে দিতাম। পার্বতী এটুকু জানে বলেই আমার সঙ্গে নিঃসঙ্কোচে মিশেছে। উত্তীর্ণ সন্ধ্যায় তার কুটিরে দীর্ঘকাল সে আমায় বসিয়ে গল্প করেছে। কাজের প্রয়োজনে দিল্লী যেতে সর্বদা আমাকে সঙ্গী করেছে। নিজের অনেক কথা সে আমায় বলেছে যা নাকি আর কাউকে কোনদিন বলে নি। আমাকে যে সম্মান সে দিয়েছে তার সবটুকু পুঁজি নিয়ে এবার আমি সাগরপাড়ি দেব।

দশ

ঘরে বসে পার্বতী কতগুলি জামাকাপড় সেলাই করছিল। ভীমগড়ের কয়েকটি পরিবার নিয়ে সে একটি ছোট ধরনের সঞ্চয় ভাণ্ডার স্থাপন করেছে। কুড়ি-পঁচিশটি পরিবারের সামান্য মাসিক সঞ্চয় একত্র করে তা থেকে দরকার মতো অল্প-স্বল্প ধার দেয় হঠাৎ-বিপন্ন চাষীদের। সঞ্চয়ের অনেক অভিনব ছোট

ছোট পথ সে বার করেছে। জামা-সেলাই তার মধ্যে একটা। সঞ্চয় ভাণ্ডারের সভ্য পরিবারগুলির জামা সেলাই করে সে নিজে। দর্জির প্রাপ্য ভাণ্ডারে জমা পড়ে। পাঞ্জাবের গ্রামে মেয়েরাও সচরাচর পুরুষদের মতো সার্টই পরে। কামিজ সেলাই-এর প্রয়োজন হয় না। এক-একটি পরিবারের দু'চারটে সার্ট থাকে, পুরুষ স্ত্রীলোক সবাই উল্টেপাল্টে ব্যবহার করে। প্রখর গ্রীষ্মে ও দারুণ শীতে দেহ অনাবৃত রাখা অসম্ভব; শাড়ির অব্যবহার সার্টের প্রয়োজনীয়তা অত্যাবশ্যক করে। সাধারণত মোটা ডুরে ছিটের সার্ট পার্বতীকে সেলাই করতে হয়। সে সার্ট আর ধুতি প'রে গ্রামের চাষী শহরে যায়। সে সার্ট ও পায়জামা প'রে চাষীর মেয়ে মাঠ থেকে মাথা বোঝাই করে ধানের আঁটি, আখের আঁটি ঘরে আনে।

মোটা ছিটের ওপর কলের স্থচ চালাতে চালাতে পার্বতীর মনে অনেক ভাবনা বিচরণ করছিল। গ্রামে এসে মোটামুটি মন্দ লাগছে না। যে কাজ সে করছে তাতে উত্তেজনা নেই, কিন্তু খানিকটা শান্ত প্রেরণা আছে। গ্রামের লোকেরা তাকে নিজের বলে গ্রহণ করেছে; সহজে নয়, অনেক ধৈর্য ও অধ্যবসায়ের সঙ্গে গ্রাম্য অন্তরের স্নেহ ও বিশ্বাস সে কিছুটা অর্জন করতে পেরেছে। তার সন্ত্রাসবাদী অতীত গ্রামের মানুষের কাছে পার্বতীকে খানিকটা শ্রদ্ধার পাত্রী করেছে; তার বাবার নাম অনেকের জানা, তিনি যে মন্ত্রী না হয়ে গান্ধীজির আশ্রমে লোকসেবায় নিরত থেকেছেন, এও পার্বতীকে সাহায্য করেছে। গ্রামে নোংরামির শেষ নেই, কিন্তু তার মধ্যে একটা খোলাখুলি সরলতা আছে, শহরের জটিল কুটিলতা নেই। সর্বোপরি যা পার্বতীর পক্ষে স্থসহ, এখানে একদা-নির্মল মানুষের অবক্ষয় দেখে প্রাণের মধ্যে অহরহ ব্যথা করে ওঠে না। বাবা ঠিকই বলেছিলেন, গ্রামের লোকেদের আমরা মানুষ বলে সম্মান দিই নি, তাদের অসম্মান থেকে নিজেদের সযত্নে দূরে রেখেছি, যেটুকু সহানুভূতি, দরদ দেখিয়েছি তা নিতান্তই ভাবপ্রবণ, অবাস্তব। আজ এদের কল্যাণ করতে পারার মধ্যে যে তৃপ্তি আছে, শহরে তা নেই।

অথচ, পার্বতী ভাবছিল, এরই মধ্যে দীর্ঘদিন আমার থাকা চলবে না। একটা দিন আসবে যখন এই পরিবেশে চিত্ত হাঁপিয়ে উঠবে, অন্য পরিবেশ চাইবে। ভীমগড়ে পল্লী-উন্নয়ন কাজ মন্থরগতিতে এগিয়ে চলেছে; অপচয়, অনভিজ্ঞতা, অহমিকা ও অনাচার সত্ত্বেও, কাজ যে একেবারে না হচ্ছে তা নয়। শীঘ্র নয়, খুব বিলম্বেও নয়, এ গ্রাম ছোটখাটো একটি উপনগরে পরিণত হবে।

রাস্তাগুলি পাকা হবে, বিজলি আসবে,—শহরের আর বাকী রইল কি? ইট সস্তা, তাই বেশির ভাগ লোকে এখানে এক-ইটের গাঁথনী দিয়ে কোঠাবাড়ি বানায়, বর্ষার স্বল্পতায় তার আয়ু নেহাৎ কম নয়। সেদিন খুব দূর নয় যখন ভীমগড় একটা তৃতীয় শ্রেণীর শহরের জীর্ণ বিবর্ণ পোষাক পরবে। এখনই ভ্যানে আসে ছায়াচিত্র; কয়েক বছর পর রীতিমতো খোলা আঁকাশের নিচে সিনেমা দেখান হবে। জমির দাম বাড়বে, জমি নিয়ে শুরু হবে জুয়াখেলা। দীর্ঘদিন এখানে থাকা চলবে না। তার কারণ আর কিছু নয়, শুধু এই যে, আমি মনে-প্রাণে একালের নই, অন্যকালের, যে-কাল অতীত, যার স্মৃতি বহন করছে ইতিহাসের পাতা, আর কিছু পিছু-টান মানুষের মন।

ভীমগড়ে পার্বতীর কর্মে উৎসাহ ও প্রত্যয়ের অন্যতম প্রধান অনুসঙ্গ পিটার কাবাকু। পিটার কাবাকুর কথা ভাবতে পার্বতীর আশ্চর্য লাগে। প্রথম যেদিন প্রজেক্ট অফিসারের সঙ্গে সে ভীমগড়ে এল, গ্রামবাসীর বিস্ময় ও কৌতূহল পার্বতীকেও পরিষ্কার স্পর্শ করেছিল। কি সহজেই না পিটার কাবাকু গ্রামের কাজে লেগে গেল; যেন কোন একটা অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ থেকে মুক্তির আস্বাদ পেল। দূর থেকে পার্বতী তার ঘোরকৃষ্ণ কুৎসিত মুখের অনাবিল হাসি লক্ষ্য করে বার বার অবাক হয়েছে। এমন একটা সহজ সরল চরিত্র নিয়ে এই রহস্যময় বিদেশী এসে হাজির হল যে তার সম্বন্ধে কৌতূহল পার্বতী দমন করতে পারে নি। পার্বতীকে বার বার দেখতে পেয়েও সে একবার এগিয়ে এসে আলাপ করে নি। তাতে পার্বতীর নারীহৃদয়ের কৌতূহল আরও বেড়ে গিয়েছিল। তাই ভুঁয়রোর নির্জন তীরে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে যাওয়া পিটার কাবাকুর সঙ্গে পার্বতী নিজেই আলাপ করেছিল।

বড় ভাবনাতুর ছিল তখন পার্বতীর মন। একটা পুরো বর্ষা সে ভীমগড়ের চরম দুর্গতি চোখে দেখেছে। ভুঁয়রোর তাণ্ডব থেকে গ্রামগুলিকে রক্ষা করার চিন্তা তার মনকে পরিপূর্ণ অধিকার করে বসেছিল। অথচ প্রতিপদে পাচ্ছিল সে কেবল বাধা। প্রথম আলাপেই তাই সে পিটারকে নিজের ভাবনার অংশ দিয়েছিল; সে অংশ গ্রহণ করে পিটার ক্রমে পার্বতীর বন্ধু হল। একসঙ্গে দীর্ঘদিন কাজ করে বন্ধুত্বকে তারা পাকা করেছে। বহু সময় নিকট সান্নিধ্যে তাদের কেটেছে, কথাবার্তায়, কাজে, ভাব ও অনুভূতির বিনিময়ে। অশেষ আগ্রহ নিয়ে পিটার পার্বতীর মুখে ভারতবর্ষের কথা শুনেছে, প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে পার্বতীকে ভাবিয়েছে, তার চিন্তাকে তীক্ষ্ণ করেছে, অনুধাবনকে ব্যাপক।

পিটারের সাগ্রহ অনুশ্রবণে উৎসাহিত হয়ে, পার্বতী নিজের কথা পর্যন্ত অনেক বলেছে, যা সহজে সে বলতে চায় না। তার কুটিরের বারান্দায় মুখোমুখি মোড়ায় বসে লণ্ঠনের স্তিমিতালোকে পার্বতী তার জীবনের পাতা উল্টে গেছে, পিটার শুনেছে, বুঝেছে, জেনেছে। নিবিড় নীরব সমানুভূতি তার কালো দেহের মধ্য থেকে প্রবাহিত হয়েছে পার্বতীর দেহে। পিটারের কথাও সে মন দিয়ে শুনেছে। এমন কিছু নেই যা পিটার তাকে বলে নি। শুনেছে আফ্রিকার কথা, কিনিয়ার কথা। চোখের সামনে দেখতে পেয়েছে ছায়ামূর্তির মতো অজানা, অচেনা মানুষের ছবি—বহুদূর আফ্রিকার অন্ধকার বনভূমি থেকে সাগর পেরিয়ে পার্বতীর চোখের সামনে দাঁড়িয়েছে একটি নারী, মাথার সম্মুখের অর্ধেক কামান, পেছনের কুঞ্চিত চুলে বহুধা বিনুনী, সুপুষ্ট, নরম অনাবৃত স্তনযুগল। পার্বতী জানে, এর নাম ওয়াচিরা, পিটারের পত্নী, যার সবকিছু শুনেছে সে পিটারের কাছে, যার জন্যে বুকের মধ্যে টনটনে একটা ব্যথা সে অনুভব করে মাঝে মাঝে।

পার্বতীর ঘটনাবহুল জীবনে যে ঘটনার অভাব তার নাম পুরুষ। লাহোরে পাঞ্জাবী সমাজে বড় হয়ে সলজ্জ কমনীয়তার চেয়ে তার মধ্যে বলিষ্ঠ সপ্রতিভতাই বেশি ফুটে উঠেছিল। প্রথম যৌবনে যে বিপ্লবী রাজনীতিতে সে ভিড়ল সেখানে ভাবপ্রবণতার উচ্চতম বিন্যাস। তারপর ঘটল সেই রোমাঞ্চকর ঘটনা। মরতে মরতে বেঁচে গেল পার্বতী সুদীর্ঘ কারবাসে। জেলে বসে সে দেখল একা একা, তার দেহে পূর্ণ যৌবন এল, মন হল কঠিন, শান্ত। পঠনে, মননে কেটে গেল বছরের পর বছর। প্রথম কয়েক বছর নির্জন, নির্বান্ধব সেলে, তারপর ধীরে ধীরে অন্য স্ত্রী কয়েদীদের সঙ্গে। শেষ ক'টা বছর রাজনৈতিক বন্দিনীদের মধ্যে। জেলে বসে সে বিশ্ববিদ্যালয়ের সবগুলি পরীক্ষা উত্তীর্ণ হল; চতুর্দিকের পরিবেশ যে গ্লানি রোজ জীবনে স্তূপীকৃত করে রাখত বই-এর মধ্যে তার কিছুটা অপনোদনের সুযোগ সে করে নিল। স্বভাব তার গম্ভীর হল, মন নিস্তরঙ্গ। তারপর একদিন যখন মুক্তি পেল, হঠাৎ হাজির হল জীবন্ত কোলাহলমুখর পৃথিবীর উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে; অবাক বিস্ময়ে, চাপা আতঙ্কে পার্বতী দেখতে পেল এ পৃথিবী তার অচেনা, অজানা। সে কিছু বুঝতে পারে না, কিছু চিনতে পারে না। চিনতে, জানতে সময় লাগল। কিন্তু যখন চিনল তখন জানল একালের সে নয়। সে কোন্ কালের তা কিন্তু বুঝতে

পারল না। যে মেয়ে যৌবনের চৌদ্দ বছর জেলে কাটাল, সে কোনকালের নয়, জেল-কালের। পার্বতীর জীবনে পুরুষ নামক ঘটনা ঘটল না।

যা একবার ঘটল তা ঘটনা নয়, অঘটন। বিয়ে করে ঘর-সংসার পাতবে এ ভাবনা মেয়েদের যে বয়সে আসে, তার আগেই, ভারতবর্ষকে স্বাধীন করার মহান উদ্দেশ্য একটি ইংরেজ রাজপুরুষকে হত্যাদ্বারা সম্পূর্ণ বা অশংত সফল করতে যাবার অপরাধে, পার্বতী চতুর্দশ বছরের জন্য কারাগারে গেল। সেখানে দিবসে এমন কোন সঞ্চয় হত না যা নিয়ে রজনীতে রোমান্সের স্বপ্নের আয়োজন করা যেত। জেল থেকে বেরিয়ে, প্রথম ঘোর কাটবার পর, চতুর্দিকে অবক্ষয়ের ক্লান্ত চেহারা দেখে পার্বতীর মনে যে অবস্থার সৃষ্টি হল তা বিয়ে করে ঘর বাঁধার অনুকূল নয়। বাপ সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী। আয়োজন করে বিবাহ দেবার ব্যবস্থা করার কেউ নেই। কারামুক্তির পর কোন লোভনীয় যুবক এগিয়ে এসে পাণিপ্রার্থনা করবে এমন দেহ-ঐশ্বর্য তার নেই। তদুপরি কোন যুবককেই পার্বতীর লোভনীয় মনে হল না। কোন পুরুষকেই না।

তবুও একটা অঘটন ঘটে গেল। যার কোন অর্থ নেই আজ পার্বতীর কাছে; শুধু একটা ধিকিধিকি জ্বালা মাঝে-মধ্যে স্মৃতিপথে নিয়ে আসে একখানা মুখ, একজোড়া জ্বলন্ত চোখ।

সবরমতি থেকে দিল্লী এসেছে পার্বতী, লক্ষ্যহীন শূন্য মনে। নিজের সঙ্গে চলছে সংগ্রাম। কি করবে, কোথা যাবে, দুরূহ প্রশ্নের মীমাংসা।

এমনই সময়ে আচমকা দেখা হয়ে গেল রতন খান্নার সঙ্গে। ছোটবেলার বন্ধু রতন খান্না।

লাহোরে এক রাস্তায় ছিল তাদের বাড়ি। পার্বতীর বাবা অধ্যাপক, রতনের বাবা জমিদার। অবস্থাপন্ন ঘরের সুদর্শন ছেলে রতন। পার্বতীর চেয়ে বছর তিনেকের বড়। বিরাট জমির মালিক রতনের বাবা, তাই সরকারের নিতান্ত অনুগত। রাও বাহাদুর খেতাব আছে, বাড়িময় রাজা-রাণী, সপত্নী-ভাইসরয় ও গভর্নরদের ছবি। পার্বতীর বাবা বিদ্রোহী, গান্ধীর শিষ্য। পার্বতীর বাড়িতে, অতএব, রতনের আগমন নিষিদ্ধ। তবু সে আসত। পার্বতীর বাবার প্রতি রতনের প্রবল একটা টান ছিল। প্রায়ই সে লুকিয়ে এসে বাবার ঘরে তাঁর কথা শুনত। বাবাকে পুলিস ধরে নিয়ে গেলে পার্বতীকে এসে দেখে যেত। বুদ্ধিদীপ্ত সুন্দরকান্তি রতনকে বাবা বিশেষ

স্নেহ করতেন। কথা সে বেশি বলত না, একটু লাজুক ছিল তার স্বভাব, কিন্তু পার্বতীর প্রতি গভীর মমতা সে পোষণ করত। পার্বতী যখন লাট সাহেবকে গুলি করে বসল তখন রতন নাকি ভয়ানক বিচলিত হয়েছিল। বিচারের সময় একাধিকবার পার্বতী তাকে আদালতের এককোণে বসে থাকতে দেখেছে। অনুভব করেছে তার অপলক দৃষ্টি।

সুদীর্ঘ—যেন যুগ যুগ—ব্যবধানের পর সেই রতন খান্নার সঙ্গে হঠাৎ দেখা হয়ে গেল পার্বতীর। কনট প্লেসের একটা দোকান থেকে দরকারী দু'-চারটে জিনিস কিনে রাস্তায় এসে সে বাসের জন্যে অপেক্ষা করছিল। একজন ভদ্রলোক সামনে এসে বললেন, মাপ করবেন, অপনি কি পার্বতী দত্ত?

বিস্মিত হয়ে পার্বতী বলল, হ্যাঁ। কিন্তু কেন?

আমাকে আপনি চিনতে পারেন নি। আমি রতন খান্না। লাহোরের রতন খান্না।

পার্বতী বিস্ময়ে নির্বাক হল। এই সে রতন খান্না! রোদে-পোড়া চামড়া কর্কশ, মলিন। রোগা লিকলিকে চেহারা। চোখের নিচে কালি। অথচ কি আশ্চর্য উজ্জ্বল চোখদুটি। ঐ তো সেই সলজ্জ হাসিটুকু ম্লান হলেও এখনো জীবিত। হাতের আঙ্গুলগুলি এখনো সরু, লম্বা, বাঙ্ময়। টাক পড়ে চওড়া কপাল প্রশস্ততর, চিবুকের ডান পাশে সেই পুরাতন কালো বড় তিল। হারিয়ে-যাওয়া অতীত থেকে হঠাৎ রতন খান্না এসে সামনে দাঁড়িয়ে পার্বতীকে যেন মুহূর্তে বিহ্বল করে দিল। বুকে এমন একটা রুদ্ধ আনন্দ, যা কোনদিন সে অনুভব করে নি। চোখের ওপর খেলে গেল স্মৃতি-স্নিগ্ধ লাহোর, কত পুরাতন মুখের রেখা।

রতন পার্বতীকে নিয়ে অনতিদূরে রেস্তোরাঁয় ঢুকল। দুই পেয়ালা কফির অর্ডার দিয়ে খুশীর অবসরে পুরাতনে তারা ফিরে গেল।

তোমাকে কোনদিন আর দেখব ভাবি নি, রতন বলল।

আমিই কি ভেবেছি তোমার সঙ্গে এমন করে দেখা হবে?

মাষ্টার সা'ব কোথায়?

সবরমতিতে।

সেই সুদূর গুজরাটে? স্বাস্থ্য কেমন আছে?

ভালো।

তুমি কোথায় আছ, কি করছ?

আপাতত এখানেই। করছি না কিছুই।

তোমার মতো মেয়ে কিছু না করে থাকতে পারে?

অর্থাৎ কোন একটা দুষ্কর্ম আমায় করতেই হবে?

আমার এখনো পরিষ্কার মনে আছে তোমার সেই ভীষণ দুষ্কর্মের কথা। ছোটবেলা থেকে তোমাকে দেখে এসেছি, একসঙ্গে খেলা করেছি, তুমি যে গোপনে গোপনে অমন ভীষণ হয়ে উঠেছ তা কি একটুও ভাবতে পেরেছি? যেদিন শুনলাম তুমি লাট সাহেবকে গুলী করে ধরা পড়েছ, সেদিন কী আমার বুক-কাঁপনি! বিশ্বাসের একেবারে বাইরে মনে হয়েছিল কথাটা, বিশ্বাস হতে কেমন যেন বোকা হয়ে গেলাম।

হাসতে হাসতে পার্বতী বলল: বোকা হবে কেন?

বোকা হব না? এখন তুমি বেশ মোটা-সোটা হয়েছ। তখন সরু ছিপছিপে ছোট্ট মেয়ে, বেশি কথা বলতে না, বেশির ভাগ সময়ই নিজমনে কি যেন ভাবতে। আমার মা বলতেন, পার্বতীর মা নেই, বাবা স্বদেশী করে শুধু জেল খাটল, তাই ও অমন গম্ভীর। দেখা হলে একটু হাসতে, দু'-চারটে মামুলী কথা বলতে, তারপর কেটে পড়তে। তুমি যে তলে তলে দারুণ এক বিপ্লবী হয়ে উঠলে এ কি কেউ ভাবতে পেরেছি আমরা? তুমি আমাদের সবাইকে অমন বোকা বানাতে পারলে, আর আমরা বোকা হব না?

নিজের কথা রতন খান্নার মুখে শুনতে বড় ভালো লাগল পার্বতীর। কিন্তু এ তো তার নিজের কথা নয়। যে মেয়েটির কথা রতন বলছে সে অন্য কেউ, রূপকথার কোন মেয়ে, তার বহুদিন মৃত্যু হয়েছে, কিংবা সে বোধ হয় কোনদিন ছিল না।

রতন বলছে, জেলে তোমাকে দেখতে যাবার বড় ইচ্ছে ছিল। কিন্তু কি করে হবে? বাবাকে তো বলা যায় না! রাও বাহাদুর তাহলে হয় হার্টফেল করতেন, নয় আমাকে ত্যাজ্যপুত্র। কিন্তু কোর্টে তোমার বিচারের সময় অনেকদিন আমি গেছি। যাতে কেউ না দেখে সেজন্যে এককোণে ভিড়ের মধ্যে গা লুকিয়ে বসেছি। জনাকীর্ণ হত তোমার বিচারের আদালত। অত মানুষের মধ্যে তোমাকে যেন অদ্ভুত মনে হত। তুমি দাঁড়িয়ে থাকতে কাঠগড়ায় আর ক'টি যুবক-যুবতীর সঙ্গে। সবচেয়ে ছোট তুমি। আমি কেবল হাঁ করে তোমার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতাম। তোমার মুখে কোন অনুভূতির সামান্যরকম রেখাও খুঁজে পেতাম না। উকিলদের তর্কাতর্কি, সাক্ষীর সাক্ষ্য,

জেরা, জজ সাহেবের আদেশ, কোনকিছুর একবিন্দু বোধকরি তুমি বুঝতে পারতে না। নিশ্চল, নিশ্চুপ তোমার সে মুখখানা এখনো আমার চোখে ভাসে। শুধু যেদিন তোমার বাবা আসতেন, তুমি ব্যাকুল হয়ে উঠতে। তোমার চোখের জল গাল বেয়ে ঝরত। তোমার বাবা সইতে পারতেন না। কিছুক্ষণ বসে থেকে উঠে চলে যেতেন।

শুনতে শুনতে পার্বতীর চোখ ছলছল করে উঠল। দাঁতে ঠোঁট কামড়ে বলল, আমার কথা থাক। এবার তোমার কথা বল।

আমার কথা। আমার কথা শুনে তোমার ভালো লাগবে না।

লাগবে। তোমার বাবা কোথায়?

ছাদের ওপরে তাকিয়ে রতন বলল: স্বর্গে। স্বেচ্ছায় যান নি। মুসলমানেরা পাঠিয়েছে।

বল কী?

তুমি তো সে নৃশংস ইতিহাসের কথা কিছু জান না, তুমি সুখী। মুসলমানদের দোষ কি? নৃশংসতায় আমরাও কম যাই নি। আমি নিজের হাতে যা করেছি তুমি শুনলে আমার ছায়া মাড়াবে না। লাহোরে আমাদের দিকটায় আগুন এমন হঠাৎ ও বেশি জ্বলে উঠল যে আমরা সামলাতে পারলাম না। বাবা মারা পড়লেন। বাকী আমরা কোনমতে পালালাম। বাড়ি, গাড়ি, জমি, ধন, সব গেল। পথে মা মারা গেলেন জ্বরে, শোকে। বাকী আমরা এগিয়ে এলাম। রেল গাড়ির ছাদে বসে মানুষকে লম্বা পাড়ি দিতে দেখেছ? অমনি করে আমরা দুশো মাইল এলাম। তারপর ছোটবোন উষা গেল। না, মরল না। হারিয়ে গেল। খোঁজবার সময় নেই। প্রাণ নিয়ে পালাতে হবে! দুভাই এক বোন একদিন আমরা স্বাধীন ভারতে এলাম। আমি, মদন ও সীতা। এলাম দিল্লীতে। থাকবার স্থান নেই, খাবার নেই, কাজ নেই। অবশ্য জুটে গেল। এক মন্ত্রীর বাড়ির আস্তাবলে আমরা স্থান পেলাম। আস্তাবল অবশ্য আগে ছিল, সাহেবদের কালে। এখন আউট-হাউস। সীতা এক কনট্রাকটারের নেক-নজরে পড়ে চাকরি পেল। এখন সে বেশ ভালোই আছে। কনট্রাকটার সর্দারজীর প্রাইভেট সেক্রেটারী, অর্থাৎ ব্যক্তিগত সম্পত্তি। মদন বোম্বাই চলে গেল। সেখানে চাকরি করছে। আমিই পড়ে রইলাম দিল্লীতে।

পার্বতী চেয়ে রইল রতনের দিকে। বড়লোকের আদরে-পালিত, বিলাসী

ছেলে ছিল রতন খান্না। ভালো ভালো জামা-কাপড় পরত, গভর্ণমেণ্ট স্কুলে যেত গাড়ি চেপে।

তোমাদের জমিজমা, টাকাপয়সা সব গেছে?

সব। রতন বলল। তবে কিছু হয়তো পাব। পূর্ব পাঞ্জাবে জমি খানিকটা পেয়েছি। জীবনে চাষ করি নি, তাই চাষীদের দিয়ে দিয়েছি! শুনছি, একদিন ক্লেম্ পাব। কয়েক হাজার টাকা নিশ্চয় পাব। লাহোরে বাড়িটা বেচবার তালে আছি। কোনদিন হয়তো পারব। কিন্তু সে যে কবে তার ঠিক নেই।

বিয়ে কর নি?

না। ঐটুকু জীবনে এখনো বাকী আছে।

চাকরি করছ?

নিশ্চয়। জান তো, লেখাপড়ায় কোনদিন মন ছিল না। দপ্তরে কাজ করে খেতে হবে কোনদিন কি ভেবেছি? একটা আপার ডিভিশন কেরানীর কাজ করছি। মন টিঁকছে না। ভাবছি কিছু একটা ব্যবসা খুলব। পথ খুঁজছি। পার্ট টাইম একটা সাইকেল কোম্পানীর সেলস্‌ম্যানের কাজও করি। ছোটখাট একটা সাইকেল তৈরির ব্যবসা করব ভাবছি। কিন্তু অনেকটা টাকা লাগবে। প্রাণপণ সঞ্চয় করছি, কিন্তু আয় তো সামান্য!

কফির পয়সা চুকিয়ে তারা রাস্তায় নামল। রতন বলল, তোমার সঙ্গে আবার দেখা হবে তো পার্বতী?

নিশ্চয় হবে। তুমি চাইলেই হবে।

কোথায় আছ।

একটি বান্ধবীর কাছে। কুইন্সওয়েতে ওয়াই. ডব্লু. সি. এ।

কাল আসব?

কখন?

বিকেল সাড়ে পাঁচটায়?

এস।

পরের দিন রতন খান্না এল ছ'টার একটু আগে। পার্বতী চাপা আগ্রহে প্রতীক্ষা করে নিজের কাছে নিজে লজ্জায় আনত হয়ে পড়েছিল। জীবনের কোন একটা অভিনব রহস্য যেন রতনের চতুর্দিকে ঘিরে আছে, যার আকর্ষণ

দুঃসহ, যে আকর্ষণ পার্বতীর জীবনে আর কখনো আসে নি। রতন এসে হাজির হল, পার্বতী প্রথম তার মুখের দিকে তাকাতে পারল না, বুকের অস্থিরতা গোপন করতে নীরবতার আশ্রয় নিল। তারা দুজনে গিয়ে বসল কনট প্লেসের গোল পার্কে, কাঠের চেয়ারে। রাস্তা থেকে রতন কিনল কাঁচা মুলো, দুজনে তাই বসে বসে খেল পরমানন্দে। রতন দেশবিভাগের পরে পাঞ্জাবের বুকে বয়ে-যাওয়া কুটিল প্রভঞ্জনের কথা পার্বতীকে শোনাল। শুনতে শুনতে পার্বতীর দেহ হিম হয়ে এল, কখনো বা মাথায় চড়ল রক্ত। রতন আরও শোনাল তাকে মৃত্যুর সঙ্গে জীবনের নিষ্ঠুর সংগ্রামের কাহিনী। যাট লক্ষ মানুষ বাঁচবার আশায়, জীবনের দুর্নিবার তৃষ্ণায় পাকিস্থান ছেড়ে ভারতে এসেছিল, যে ভারত-পাকিস্থানে এই তো সেদিন, এই তো অনেক, অনেকদিন, কোন ভেদ ছিল না। তারা শুধু নিজের দুঃসাহসটুকু সম্বল করে, শুধু বাঁচবার জলন্ত তাড়নায় কী করে নতুন জীবনের রসদ আদায় করল শুনতে শুনতে পার্বতীর বুক গর্বে ভরে উঠল। মানুষ তখনই শ্রদ্ধার যখন সে মৃত্যুকে জয় করে জীবনের প্রতিষ্ঠা করে। যখন সে স্রষ্টা, সংগঠক, নির্মাতা। ভারতবর্ষের লক্ষ লক্ষ মানুষ যে পরাজয় স্বীকার করে নি; দুঃখে, বিপদে, শোকে ভেঙ্গে পড়ে নি; যা গেছে তাকে যেতে দিয়ে নতুন করে গড়তে পেরেছে, তার অপূর্ব কাহিনী শুনে দেশকে পার্বতী আর একবার নতুন করে শ্রদ্ধা করল। রতন খান্না এই নতুন বিজয়ী জীবনের একটি প্রদীপ। তাকে বড় ভালো লাগল পার্বতীর।

কথা বলতে বলতে খুক্ খুক্ কাশে রতন খান্না। এক একবার মনে হয় সামান্য কাশির ভেতরে বড় ব্যথা; ঝুঁকে পড়ে শ্বাস নেয়। কাশি থামলে চোখে ক্লান্তি নেমে আসে।

তোমার এরকম বিশ্রী কাশি হয়েছে কেন?—প্রশ্ন করে পার্বতী।

চার বছর আস্তাবলে কেটেছে। স্যাঁতসেঁতে দেয়াল। মেঝে নেই বললেই হয়। কিছুদিন ঘুরে ঘুরে জর হত। এখন আর হয় না। কাশিটা আছে। শিগ্‌গিরই সেরে যাবে।

ওষুধ খাচ্ছ?

নিশ্চয়। শরীরটাকে ঠিক না করতে পারলে ব্যবসা করব কি করে?

তুমি এখন আছ কোথায়?

ঠিক যে কোথাও আছি তা নয়। আস্তাবলে নিশ্চিন্ত ছিলাম। ভাড়া দিতে হত না। কিছু টাকা জমাতে পারলাম। কিন্তু দেহটা ধর্মঘট করে বসল। ডাক্তার বললেন, আস্তাবল ছাড়তে হবে। সরাসরি বাড়ি পেতে অনেক দেরী। কিছুদিন বিনয় নগরে একখানা ঘর নিয়ে থাকলাম। সেটাও ছাড়তে হল। এখন লোদী কলোনীতে একখানা ঘর পেয়েছি মাস কয়েকের জন্যে। একা মানুষ, কোন অসুবিধে নেই।

খাও কোথায়?

হোটেলে। দুপুরে আপিসের ক্যান্টিনে। খাওয়ার কোন কষ্ট নেই।

তোমার দেখছি কোন কিছুতেই কষ্ট নেই।

শুধু শরীরটা ছাড়া। জানই তো ছোটবেলা থেকেই আমি তেমন সবল নই। বাবা অনেক যত্নে রাখতেন। পার্টিশনে বড ধকল গেল। তারপর সেই স্যাঁতসেঁতে আস্তাবল! শরীরের আর দোষ কি বল?

প্রায়ই একসঙ্গে বেড়াতে যায় রতন ও পার্বতী। পার্কে বসে গল্প করে। রেস্তোরাঁয় চা কিংবা কফির পেয়ালা নিয়ে ঘণ্টা কেটে যায়। রাস্তায় ঘুরতে ঘুরতে খায় কাঁচা মূলো, কাঁচা টমাটো, কাটা ফল। পার্বতীর ভালো লাগা বেড়ে চলেছে। রতনের বাঁচবার আকাঙ্ক্ষায় সে বিস্মিত। জীবনের কাছে কিছুতেই সে হারবে না। ক্যাম্প-কলেজে সন্ধ্যাবেলা পড়তে যায়। বি. এ. পাশ করেছে, এম. এ. পড়ছে। পাশ করলে চাকরিতে উন্নতি হবে। ভবিষ্যতের স্বপ্নে বিভোর রতন। বাপের সব গেছে, তার আবার সব হবে। ক্লেমের টাকা পেলে বাড়ি কিনবে। একতলায় বাস করবে, দোতলা ভাড়া দেবে। টাকা জমিয়ে জমি কিনবে। কিনবে সস্তায়, বেচবে চড়া দামে। এর মধ্যেই এক প্লট জমি সে কিনেছে। দশ বছর পর কেনা দামের বিশ গুণ বেশিতে বেচবে। অভাবে জীবন নষ্ট। অর্থ চাই, বাড়ি চাই, গাড়ি চাই। চাকরিতে উন্নতি না হলে ছেড়ে দিয়ে কেবল ব্যবসা করবে। কথা বলতে বলতে কেবল কাশে রতন, অথচ এ নিয়েও তার দুশ্চিন্তা নেই। কাশিটা সারছে না? অনেক কম কিন্তু আগের চেয়ে। সেরে যাবে শিগ্‌গির।

একদিন রতন বলল, আমার ঘরে যাবে পার্বতী? দেখবে আমি কেমন করে বাস করি?

পার্বতী রাজী হল। বলল, আমার সন্ধ্যাবেলা কাজ আছে। বেশিক্ষণ থাকতে পারব না।

হেমন্তের মৃদু-শীতল একটা ছুটির দিন। বিকেল তখন পাঁচটা। রতন পার্বতীতে তার ঘরে নিয়ে এল। লোদি কলোনির দু-কামরা ফ্ল্যাটের একখানা ঘর। যার ফ্ল্যাট সেও একা থাকে। তার আর রতনের দুখানা ঘর। পাশাপাশি অনেকগুলি ফ্ল্যাটের কমন স্নানাগার, পায়খানা। এগুলোর চলতি নাম 'চামরি'। রতনের বন্ধু ছুটির দিনে রোহ্‌তক গেছে নিজে বাড়িতে। পার্বতীকে নিয়ে রতন এনে ঘরে বসাল। একটা কাঠের শক্ত চৌকি, বিছানাপাতা। নীল বেড-কভারটা দু'চার জায়গায় ফুটো। দুখানা মোটা মোটা কাঠের চেয়ার। এককোণে ছোট্ট একটা টেবিল, তার ওপর পাঠ্য-পুস্তক। টেবিলের ডান কোণে কাঁচের ফুলদানিতে একগুচ্ছ কাগজের ফুল, ধুলোয় বিবর্ণ। দেয়ালে পেরেক ঠুকে দড়ি টানিয়ে তার ওপর ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে পায়জামা, তোয়ালে, গেঞ্জি, কাচ্ছা। পেরেকের ওপর ঝোলান হ্যাঙ্গারে দুটো ট্রাউজার, একটা সার্ট। ঘরের দরজায়, জানলায়, নীল দোসুতির পর্দা।

চেয়ারে বসে পার্বতী ঘরের চারিদিকে চোখে বুলাল। স্বচ্ছলতার কোন চিহ্ন নেই। রতন খান্নার স্বপ্ন যত সুদূরপ্রসারী, বাস্তব ততো ম্লান। পৃথিবীব্যাপী অপচয়ের যুগে সে নিজেকে বঞ্চিত করে সঞ্চয়ী। সবরকম আরাম ত্যাগ করে, ভবিষ্যতের জন্যে তিল তিল উদ্বৃত্ত সঞ্চয় করছে।

পার্বতীকে বসিয়ে রতন্ন বাইরে গেল, একটু পরে ফিরে এল ঠোঙা ভরতি সামোসা ও দু' গ্লাস চা নিয়ে।

বলল, গরীবের বাড়ি, তোমার আপ্যায়নটা নিতান্তই সামান্য হল।

আমাকে এসব কথা বলা বৃথা। তোমার অতীত আমার অজানা নয়।

কিন্তু আমার বর্তমান তুমি জান না। আমার ভবিষ্যতও না।

তুমি তো অনেক বলেছ।

তাই বুঝি? তবু মনে হয় কিছুই যেন তোমাকে বলি নি।

আর বলে কাজ নেই, তোমার বর্তমানের পরিচয় তো দেখতেই পাচ্ছি

কি দেখছ?

এই তো ছেঁড়া নোংরা বেড-কভার, জীর্ণ সার্ট, পুরোনো প্যাণ্ট।

আর যা পরে আছি?

একজোড়া মোটামুটি চলবার মতো স্যুট।

একলা মানুষের এর চেয়ে বেশি কি চাই ?

এককালে তুমি খুব সৌখিন, খুব কায়দা-দুরস্ত ছিলে, মনে পড়ছে।

সে যখন বাবার পয়সা ছিল।

নিজের পয়সায় ভালো করে থাকতে নেই ?

আছে। কিন্তু আমি যদি সবটুকু রোজগারই ব্যয় করি, তাহলে ব্যবসা করব কি করে ? সঞ্চয় না করলে মূলধন পাব কোথায় ?

কিন্তু, সঞ্চয় করতে করতে নিজেকে যে অপচয় করছ !

শোন পার্বতী, আমাকে জমাতেই হবে। তুমি দিল্লীর সমাজ জান না। এখানে মানুষের শুধু দুটো পরিচয়। পদ ও অর্থ। হয় তুমি সরকারি দপ্তরে উচ্চপদে আসীন, কিংবা ধনী ; তাহলে দিল্লীতে তুমি মানুষ। তোমার পদ নেই, ধন নেই, তুমি মানুষের নিচে। সমাজে তোমার স্থান নেই। তুমি লেখক হও, কবি হও, শিল্পী হও—তোমার যতই গুণ থাকুক, যতই না কেন তুমি সৎ, পরোপকারী, আদর্শবান, তুমি মানুষ নও, যদি তোমার পদ বা ধন না থাকে। আজ যদি আমি হাল মডেলের গাড়ি হাঁকিয়ে রাজপথে বিচরণ করতাম, মাসে একটা বিরাট চোখ-ঝলসান পার্টি দিতাম, যাতে আসতেন মন্ত্রীরা, সুপ্রিম কোর্টের জজেরা, উচ্চপদের রাজপুরুষরা, আমি হতাম মানুষ। আমার মূর্খতা, আমার চরিত্রহীনতা আমার লোকঠকানো চোরাকারবার, আমার ট্যাক্স ফাঁকি দেবার দশরকম কৌশল, আমার মাতলামি, ব্যভিচার কোন কিছুই আমাকে অমানুষ করত না। দরিদ্র মানুষের দিল্লীতে স্থান নেই। ধনী, অতএব, আমাকে হতেই হবে। যা গেছে, তা আবার পেতে হবে। তার উপায় একমাত্র সঞ্চয় করা। আগে সঞ্চয়, পরে ব্যবসা।

পার্বতী তাকিয়ে রইল রতন খান্নার দিকে। আশ্চর্য চকচকে ওর চোখ দুটো, যেন জলছে। মাথার লালচে পাতলা চুল অবিন্যস্ত। গায়ের রং পাংশু, রক্তের পরিষ্কার অভাব। সরু বাহুতে সাদা চামড়ার ওপর শিরার নীল রেখা।

ভবিষ্যত গড়বার আগে বর্তমানটাকে দেখতে হবে তো ?—পার্বতী মৃদু হেসে বলল।

দেখতে তো হবেই ! জবাব দিল রতন খান্না।—বর্তমান আর জীবনে কতটুকু। নিমেষেই সে অতীত হয়ে যায়। এই ধর না, আজকের দিনটা। তুমি আমার ঘরে আসবে ভেবে সকাল থেকে মনটা উচ্ছ্বসিত ছিল। ছোটবেলা

থেকে তোমার কথা কতো ভেবেছি, তোমাকে কতো বড় করে দেখেছি। আজ তোমাকে আমার দরিদ্র আবাসে আনতে পারব ভেবে মনটা উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল। কিন্তু ঐ দেখ, সূর্য অস্ত যেতে বসেছে, আজকের দিন শেষ হবে এখুনি। যা ছিল বর্তমান, তা হবে অতীত। আমরা সবাই তো বেঁচে আছি আগামী দিনের জন্যে, ভবিষ্যতের জন্যে। বর্তমানের চেয়ে ভবিষ্যৎ চিরদিন বড়।

পার্বতী তাকাল খোলা জানলার বাইরে নীল আকাশের দিকে। ছোট্ট ঘরের পক্ষে আশ্চর্য বড জানলাটা, অনেকখানি আকাশ, অনেকখানি আলো এনে দেয়। রতন খান্নার জীবনটা কেমন যেন অলীক মনে হচ্ছিল, কাশির ঠনঠনে আওয়াজে কেমন একটা ভয়ের ইঙ্গিত। তাই খোলা আকাশের দিকে তাকাতে পার্বতীর বড় ভালো লাগল। চেয়ার ছেড়ে উঠে সে জানলার কাছে গিয়ে দাঁড়াল।

রতন এগিয়ে এল পাশে। বলল, তোমার কাছে একটা প্রস্তাব আছে পার্বতী।

কৌতূহল দেখিয়ে পার্বতী প্রশ্ন করল: কিসের প্রস্তাব?

তুমি কি চাকরি করবে?

কেন? চাকরি আছে তোমার খোঁজে?

না। আমার মতো কেরানীর খোঁজে চাকরি থাকবে কি করে?

তবে?

তুমি আমার সঙ্গে ব্যবসা কর।

ব্যবসা!

হ্যাঁ। তুমি আর আমি। পার্টনারসিপ বিজনেস!

হাসি পেল পার্বতীর।

ব্যবসা আমি বুঝিনে। তাছাড়া আমার অর্থ নেই।

ব্যবসা তুমি সহজেই বুঝে নেবে। পয়সা তোমাকে দিতে হবে না।

তাহলে আমি পার্টনার হব কি করে?

বলছি, শোন। আমি ক'দিন ধরে ভাবছি সাইকেলের কারখানা করা হবে না। অনেক টাকা দরকার, প্রচুর মেহনত। অন্য একটা প্রস্তাব আছে আমার। আমি আমাদের কুটির-শিল্পের নানারকম জিনিস বাইরে রপ্তানী করতে চাই। বিশেষ করে আমেরিকায়। সেরা সিল্কের শাড়ি, নানা ধরনের পিতলের

জিনিস। এসবের খুব কদর মার্কিন দেশে। তুমি আমাকে সাহায্য করতে পার।

কি করে?

আমার চাই রপ্তানীর পারমিট। কিছু ডলারের বন্দোবস্ত। গভর্ণমেণ্ট থেকে কিছু ধার। তোমাকে মন্ত্রীরা অনেকেই চেনেন। তোমার বাবাকে সবাই শ্রদ্ধা করেন, এমন কি প্রধান মন্ত্রী পর্যন্ত। তুমি যদি আমার সঙ্গে ব্যবসায় নামো, যদি চেষ্টা কর, তাহলে সহজেই আমরা পারমিট, লাইসেন্স, ধার সবকিছু পেতে পারি।

হঠাৎ পার্বতীর মুখে কোন কথা ফুটল না। এমন প্রস্তাব যে হতে পারে সে ধারণা করে নি। হাসি পেল পার্বতীর। রতন খান্নার দোষ নেই। চলতি মানে সে সবকিছু বিচার করছে। অনেক পুরাতন রাজনৈতিক কর্মী পারমিট বা লাইসেন্সের পিছনে ঘোরে, পার্বতী কেন করবে না? তার বাবাকে সবাই শ্রদ্ধা করে, সে শ্রদ্ধা ভাঙিয়ে কেন সে নিজের জীবন গুছিয়ে নেবে না? যে বেদনা, যে আদর্শবাদ, যে অনাস্থা তার বাবাকে রাজপথ থেকে বহুদূরে সবরমতি আশ্রমে নিয়ে গেছে তা রতনের অজানা। যে ব্যথা পার্বতীকে জনপথে নিজের জন্যে সামান্য একটু অর্থপূর্ণ স্থানের সন্ধানে বার করেছে তাও রতন জানে না। রতনের জ্বলন্ত চোখের কাতর কাকুতি দেখে পার্বতী পরিষ্কার ভাষায় তাকে নিরাশ করতে পারল না। কেন যেন বুকে ব্যথা বাজল। কথা বলতে বলতে রতনের সেই কাশি, যার আঘাত তার বুকে বাজে, তাকে আরও নরম করল।

শুধু বলল: ভেবে দেখব।

না, পার্বতী! ভেবে দেখবার কিছু নেই। তোমাকে করতেই হবে। তুমি আমার জীবনের ঘোর অন্ধকারে আলোর মতো আবির্ভূত হয়েছ। তোমাকে সঙ্গে পেলে আমি আর কিছু চাই নে। আমার সব আছে—উৎসাহ, পরিশ্রমের ইচ্ছা, কিছু অর্থও; শুধু নেই এমন কেউ যে আমাকে ঠিকমতো সাহায্য করতে পারে। তুমি যদি যোগ দাও, আমার কোন সমস্যা থাকবে না। প্রত্যেক মন্ত্রী আমাদের সাহায্য করবেন। এমন কিছু নেই যা আমরা করতে পারব না। তুমি আর আমি বড় একটা ব্যবসা গড়ে তুলব। মস্ত বড় আপিস হবে আমাদের। দুজনে আমরা ডিরেক্টর। মস্ত গাড়ি হবে। আবার আমি বাড়ি

তৈরি করব, হাল ফ্যাসানের বাড়ি। আমার যা গেছে তার চেয়ে অনেক বেশি হবে।

পার্বতী রতনের মুখের দিকে তাকাতে পারছিল না, চেয়েছিল আকাশের দিকে। হঠাৎ তপ্ত নিঃশ্বাস পড়ল কানের নিচে, চমকে দাঁড়াল পার্বতী। টের পেল না কি করে, কি ভাবে, রতন তাকে জড়িয়ে ধরেছে। ধরা পড়ল রতনের শক্ত আলিঙ্গনে। উত্তপ্ত দুটি হাত তার গাল দুখানি আবৃত করল, জলন্ত দুটি ঠোঁট স্পর্শ করল তার চোখ, কপাল, গাল, গলা, শেষে অধর। জীবনে পুরুষদেহের এমন জলন্ত স্পর্শ পার্বতী পায় নি, কেমন একটা মাদকতা তাকে বিহ্বল করল। সে বুঝল অন্যায় হচ্ছে, এক্ষুনি এক ঝাপটায় এই রুগ্ন, তপ্তদেহ পুরুষটাকে সরিয়ে দেওয়া উচিত, যার সঙ্গে তার জীবনের কোন মিল হতে পারে না; কিন্তু দেহ তার বিবশ, প্রতিরোধের শক্তি ক্ষীণ। পা কেঁপে উঠল, নিস্তেজ হল, দেহ চাইল আশ্রয়। এলিয়ে পড়ল সে রতন খান্নার দেহে। রতনের গাল পার্বতীর গালে লাগল, কী গরম সে গাল, কী ভয়ানক তার তাপ! রতন পার্বতীকে আরও কাছে টেনে আনল। উত্তেজিত, কম্পিত তার হাত পার্বতীর বুক স্পর্শ করল। শিউরে উঠল পার্বতী। পার্বতীর সমস্ত দেহে অভিনব বেদনার হিল্লোল বয়ে গেল, একটু সামান্য প্রতিবাদ সে করতে পারল না, কোন একটা দানবীয় ঝড় এসে তার মদালস দেহকে রতনের দেহের সঙ্গে মিলিয়ে দিতে চাইল। রতন হল সমুদ্রের মতো উন্মত্ত, পার্বতীর বিবশ ভারী দেহকে সবলে টেনে বিছানায় নিয়ে যেতে চাইল। দেহের তাপ আরও বেড়ে গেল, মুখ পাণ্ডুর হল, নিঃশ্বাস বন্ধ হল রতন খান্নার। কিন্তু নিরস্ত হল না। পার্বতীর জ্ঞানহীন, বুদ্ধিহীন দেহকে প্রাণপণে টানতে লাগল।

এইবার বিধাতা চাবুক মারলেন পার্বতীকে!

খুশ-খুশ কাশি রতন খান্নার গা-সহা হয়েছিল। হঠাৎ কোন অজানা অন্ধকার থেকে প্রচণ্ড কাশি তাকে অস্থির করে দিল, পার্বতীকে ছেড়ে দিয়ে কাশিতে ভেঙে পড়ল রতন। অব্যক্ত যন্ত্রণায় বুকে হাত চাপল। মুখে এক-বিন্দু রক্ত নেই, কপালে ঘাম। আবার এল কাশির প্রচণ্ড ধাক্কা, রতন খান্নার মুখ দিয়ে প্রবল বেগে উঠে এল—রক্ত!

সে রক্ত পড়ল বিছানায়, বালিশের ওপর শাদা ঢাকনায়। কালচে, বিবর্ণ রক্ত।

পার্বতী অজ্ঞান হতে হতে জ্ঞান ফিরে পেল। যার জ্বালাময়ী ক্ষুধার আগুনে চরম নির্বুদ্ধিতায় সে কুমারী দেহ আহুতি দিতে যাচ্ছিল, তার বুক চিরে রক্ত ঝরছে, যক্ষ্মার রক্ত! যে তাপকে পার্বতী প্রেমের দহন ভেবে বিবশ হয়েছিল, যে আশাবাদী স্বপ্নের বিন্যাসে তার মন চঞ্চল হয়েছিল, যে জীবন-তৃষ্ণা পার্বতী অপরাজিত মানবাত্মার জয়ের দুরাকাঙ্ক্ষা ভেবে খুশী হয়েছিল, তার পেছনে ক্ষয়রোগের মরণ-প্রদাহ! ঘৃণায়, ভয়ে পার্বতী সঙ্কুচিত, শক্ত হয়ে গেল। আমি তো মৃত্যু চাই নে, ক্ষয় চাই নে, পচে-মরা জীবন চাই নে, আমি চাই সুস্থ, বলিষ্ঠ জীবন! তবে কিসের প্রলোভন আমায় এমনি করে অচেতন করছিল? একটা মানুষ তিল তিল করে মৃত্যুর পথে হেঁটে চলেছে, আমি তার অন্তঃসারশূন্য ভিতরটাকে একবার দেখতে পাই নি, নির্বুদ্ধি শিশুর মতো বেলুনের বাইরের জৌলুস দেখে ভুলে চলে এসেছি!

লজ্জায় দুঃখে, ঘৃণায় পার্বতী অস্থির হল। কোনমতে বেশবাস সম্বৃত করে হনহন করে বেরিয়ে গেল একেবারে রাস্তায়। সামনে একটা ট্যাক্সি পেয়ে সটান চলে এল বান্ধবীর ঘরে। কোনদিকে না তাকিয়ে ঢুকল স্নানঘরে। বহুক্ষণ ধরে নিজেকে ধুয়ে-মেজে সাফ করল পার্বতী। দেহের যেখানে যেখানে রতন থাপ্পার দেহ লেগেছে বার বার সাবান ঘষল। আধ ঘণ্টা স্নান করে সে যখন বেরুল, বান্ধবী বলল, কি পার্বতী, তুমি যে এসেই হনহন করে স্নানঘরে ঢুকলে?

বড় নোংরা লাগছিল, নেয়ে-ধুয়ে সাফ হলাম।

এগার

এত সহজে অবশ্য পার্বতী সাফ হল না! বড় প্রতারিত, অপবিত্র মনে হল নিজেকে অনেকদিন। এত সহজে আত্মবিস্মৃত হবার জন্যে বার বার নিজেকে ধিক্কার দিল। তবে কি আমি পুরুষলোভী হয়ে উঠেছি? আমার মন উপবাসে কাতর, চাপা ক্ষুধায় আর্ত! আমার বুকে লুকান কামনার তরঙ্গ? নাকি আমি পুরুষ চিনতে অক্ষম, আলেয়া আমার কাছে আলো? নিজেকে বার বার চিরে চিরে পরীক্ষা করল পার্বতী। বয়স কম হয়নি, দেহে রূপ নেই, পুরুষের চোখে ঝিলিক আনার মেয়ে আমি নই। এককালে পুরুষের কাছ থেকে

কোন কিছু চাইবার ছিল না, নিজের মধ্যে ছিলাম সম্পূর্ণ। এখন চাইবার মতো পুরুষ নেই! হয় অন্তঃসারহীন; নয়, জীবনের জৌলুস সম্ভোগে আত্মবিস্মৃত। সমাজে, দেশে, এ কি পরিবর্তিত মূল্যায়ন! এর মধ্যে আমার স্থান কই?

পার্বতী বুঝতে পারল রতন খান্না কেন তাকে আকর্ষণ করেছিল। রতন তার ভবিষ্যতের স্বপ্নে পাগল, আর পার্বতীর লোভ ছিল একটুকরো জীবন্ত অতীতে। রতন একটা হারান ঐশ্বর্যের স্মারক। তার মধ্যে পার্বতী নিজের বাল্য, কৈশোর ও প্রথম যৌবনের বিলুপ্ত অতীতকে হঠাৎ যেন ফিরে পাচ্ছিল। দেখছিল তার শান্ত সৌম্য গুরু-গম্ভীর বাবাকে, সুন্দরী স্নেহময়ী মাকে, যাঁর মুখখানাও তার ভালো মনে নেই, ছেলেবেলার পরিবেশকে। রতন যক্ষ্মা বুকে জমিয়ে জলন্ত দৃষ্টিতে দূর ভবিষ্যতের দিকে স্থিতদৃষ্টি; পার্বতী তাকিয়েছিল অতীতের দূরান্তে। দুটোই সমান মিথ্যে, সমান মরীচিকা।

রতন খান্নার অনেক পরে যে পুরুষের নিকট সান্নিধ্যে পার্বতী নিজেকে পুনরায় আবিষ্কার করল তার নাম পিটার কাবাকু। রতন খান্নার সঙ্গে কোন মিল নেই। মসীকৃষ্ণ কুরূপ চেহারা, বিদেশী, নিগ্রো। লোহায় যেন তৈরি তার দেহ, শক্ত, মজবুত। ভ্যঁয়রো নদীর বাঁধে গেঞ্জি-মাত্র-দেহ সে যখন কাজ করছে, তার সবল মাংসপেশী সুস্থ পরিশ্রমে নেচে উঠেছে বার বার। রতনের মতো লিকলিকে ফ্যাকাশে নয় পিটারের শরীর। সূর্যের দাক্ষিণ্যে গভীর কালো। রতন হারান ঐশ্বর্যের ব্যথায় অস্থির, পিটার নতুন সম্পদের অন্বেষণে পরিব্রাজক। রতন শুধু নিজেকে প্রতিষ্ঠা করবার জন্যে স্বপ্নাতুর, পিটারের কাম্য, লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, তার জন্মভূমির আত্মপ্রতিষ্ঠা। নিজের কথা সে ভাবে না; সবচেয়ে বড় সাধ তার আফ্রিকার স্বাধীনতা সংগ্রামের সফল পরিপূর্ণতা। রতন খান্না ছিল একাকী, নির্বান্ধব। পিটারের সব আছে—স্ত্রী, সন্তান, বাবা-মা, ভাই-বোন, সমাজ, দেশ। রতনের মতো মূল-ছাড়া সে নয়। তাই তার আদর্শে বাস্তব বলিষ্ঠতা; স্বপ্নে সুস্থ প্রত্যয়। বিদেশী বলে তাকে অনেক কিছু বলা যায়, বিদেশী বলেই সে অমন করে প্রাণখুলে নিজের কথা বলতে পারে। দীর্ঘ সময় পার্বতী তার সঙ্গে একা কাটিয়েছে; কখনও পিটার তার হাত ধরেছে—গ্রামের পথে চলতে ডোবা, উঁচু টিপি সে পিটারের হাত ধরে অতিক্রম করেছে, কথা বলতে বলতে পিটার গায়ে হাত দিয়ে তার মনোযোগ

আকর্ষণ করেছে। কিন্তু সে নিতান্ত স্বাভাবিক, বন্ধুত্বের সচরাচর স্পর্শ। কোনরকম সামান্য স্খলন পিটারের কোনদিন হয় নি। অথচ কথায় সে বার বার জানিয়েছে, পার্বতী তার জীবনে কতখানি। বলেছে, তুমি আমার ভারত-প্রবাস পূর্ণ করলে। তুমিই সর্বপ্রথম ভারতের নারী, যার কাছে আমি মানুষ হিসেবে বন্ধুর সম্মান পেলাম। নিগ্রো বলে তুমি আমায় ঘৃণা করলে না, ভয় করলে না, সন্দেহ করলে না। মিসেস গোয়েল আমাকে লুঠ করেছিল, তুমি আমায় পূর্ণ করেছ। তোমার কাছে আমি যা শিখেছি, যা পেয়েছি তার তুলনা নেই। ভারতবর্ষ ছেড়ে গেলে যদি কোনকিছুর জন্যে আমার বুকে ব্যথা বাজে, সে শুধু তোমার জন্যে।

আর কিছু পাও নি তুমি ভারতবর্ষে?—পার্বতী হেসে প্রশ্ন করেছে।—তাহলে তুমি তো বিশেষ কৃতজ্ঞ নও।

পেয়েছি, অনেক পেয়েছি। অন্তত অনেক কিছুর আভাষ পেয়েছি। সবটুকু বুঝতে পারি নি। ধরতে পারিনি। বিদ্যা পেয়েছি, বন্ধুত্ব পেয়েছি। আবার তার সঙ্গে ঘৃণা, অবহেলা, ভয়, সন্দেহ। পেয়েছি আপ্যায়ন, পেয়েছি উপেক্ষা। গান্ধীর দেশে, নেহেরুর দেশে এসে যদি আমি রিক্তহাতে ফিরে যাই তাহলে অপরাধ আমার। কিন্তু এ পাওয়ার মধ্যে ফাঁক আছে। আমার বুদ্ধির ফাঁক, গ্রহণ করবার অক্ষমতা। বিবেক সোম টাগোরের কবিতা পড়ে শুনিয়েছিল, 'আফ্রিকা' কবিতার ব্যাখ্যা শুনতে শুনতে আমি কেঁদে ফেলেছিলাম। কিন্তু সে কান্না এখন শুকিয়ে গেছে। অপরাধ টাগোরের নয়, আমার! কিন্তু তোমার বন্ধুত্বে কোন ফাঁক নেই। এটুকু আমি পেয়েছি পুরোপুরি! এর অর্থ বুঝতে আমার কষ্ট হয় নি। আমি হৃদয় দিয়ে গ্রহণ করেছি। কাব্যের উচ্ছ্বাসের মতো শোনাচ্ছে, তবু সত্যি।

পার্বতী বুঝতে পেরেছে পিটারের মধ্যেও যা তাকে সবচেয়ে বেশি আকর্ষণ করে তার মধ্যে নিজের অতীতের প্রতিধ্বনি রয়েছে। এ সেই আগুন, যা একদিন আমাকে, আমাদের জ্বালিয়েছিল। 'আফ্রিকা' বলতে আজ এ লোকটা যেমন উত্তেজিত, 'ভারত' বলতে এককালে আমরা তাই ছিলাম। ভারত আমার, জননী আমার, ধাত্রী আমার, আমার দেশ! আজ আর আমরা এ কথা বলিনে, এ গান গাই নে। ওরা বলে, ওরা গায়। ওরা আফ্রিকা-মাতাল, আমরা যেমন একদিন ছিলাম ভারত-মাতাল। আফ্রিকার মাটি চুম্বন করে শেষ নিঃশ্বাস ফেলার বাসনায় পিটার দেশে ফিরে যাচ্ছে। আমাদের নেতা

একদিন হাজার হাজার সৈন্যকে বলতে পেরেছিলেন, ভারতের মাটি চুম্বন করে প্রাণ দিতে পারলে তোমরা ধন্য হবে। সে ভারতের মাটি এখন পরের পদানত নয়, মুক্ত। কিন্তু তাকে আমরা চুমু খাই নে। এরা আফ্রিকার মাটিকে চুমু খায়। যে পথে আমরা কাল চলেছি, সে পথে এরা আজ চলছে। সমুদ্র, পাহাড, সভ্যতা, ভাষা, দেশাচারের সব ব্যবধান সত্ত্বেও ওরা আর আমরা—পিটার আর আমি—পরস্পরকে বুঝতে পারি।

প্রগাঢ় বন্ধুতার মধ্যে পিটার পার্বতীর সম্পর্ক সীমাবদ্ধ। পার্বতী পিটারের চোখে দেখে নি সেই ঝিলিক যা রতনের চোখে সে বার বার দেখেছে। নারী সহজেই বুঝতে পারে পুরুষ তাকে কামনা করছে কি না। পার্বতী পিটারের চোখে কামনা দেখতে পায় নি। দেখেছে শ্রদ্ধা, প্রীতি। পিটার বার বার বলেছে, তোমার মধ্যে এমন কিছু একটা আছে যা পুরুষকে শান্ত করে, লোভী করে না। রতন খান্না কিন্তু শান্ত হয় নি, লোভী হয়েছিল। পার্বতী দু'-এক সময় ভেবেছে, এ বিদেশী মানুষটাও যদি একদিন রতন খান্না হয়ে ওঠে, আমি করব কি? রতনের মুখে তাকিয়ে পার্বতীর অন্তরে যে পুলক হয়েছিল, পিটারের সান্নিধ্যে কোনদিন তা হয় নি। কিন্তু পিটারের কাছে নিজের, আত্মজনের, কিনিয়ার, আফ্রিকার কথা শুনতে শুনতে অসহ্য একটা বেদনা পার্বতীর বুক ভেদ করে উঠে এসেছে, মনে হয়েছে, কেউ যদি তাকে চেপে ধরে তবে যেন এ ব্যথার উপশম হয়। কিন্তু সে-কেউ যে পিটার, তেমন কোন ভাবনা তার মনে জাগে নি। রতন পার্বতীকে সতর্ক করে গেছে, সহজে আর সে ধরা পড়বে না। অন্তত, কি করছি না জেনে আমি আর কিছু করব না। এখন আমি পুরুষের চোখে তাকিয়ে বুঝতে চেষ্টা করি তার অভিসন্ধি কি। একা সে আমার কাছে এগিয়ে এলে সতর্ক অপেক্ষায় থাকি, এর পরে সে কি করবে! আচমকা, আমার অজ্ঞাতে আমাকে বিবশ একমাত্র যক্ষ্মারুগী রতন খান্নাই করে গেল। অন্য কোন পুরুষের সে সৌভাগ্য হবে না। পিটার যদি কখনো এগিয়ে আসে, আমি তৈরি থাকব। গ্রহণে না প্রত্যাখ্যানে? তা জানি না। শুধু জানি আমি সতর্ক, তৈরি থাকব।

বারো

পিটার গল্প করছিল ইংলণ্ড-প্রবাসের।

পার্বতী প্রশ্ন করল: আলেক অ্যাসবির টাকা দিয়ে কি করবে?

এখন থাকুক যেমন আছে। বেশি টাকা তো নয়। যদি কোনদিন সুযোগ আসে ওর সঙ্গে আঁরও কিছু যোগ করে আফ্রিকান ছাত্রদের উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থা হতে পারবে।

যোগ করবে কে?

তেমন লোকের অভাব হবে না। ইংরেজই অনেকে এগিয়ে আসবে।

অ্যাসবির জীবনটা বড় বিচিত্র। গল্পের মতো মনে হয়।

সব জীবনই তো গল্প। তাছাড়া, ইংরেজ জাতটাই বিচিত্র।

বিচিত্র বলেই বড়।

তোমরা অবশ্য ইংরেজদের একটু বেশি বড় করে দেখ। আমরা অতটা দেখি নে। তবু মানতেই হবে যে বড় জাতের উপযুক্ত গুণ ও দোষ ওদের প্রচুর।

ধরো, ইংরেজ তোমাদের দেশে বর্ণবিদ্বেষের বিষ ছড়িয়েছে। আবার ইংরেজ মেয়েই আফ্রিকান স্বামী বেছে নেয়।

আফ্রিকায় নয়, ইংলণ্ডে।

তা হোক।

তেমনি ফরাসী মেয়েও তো আফ্রিকানের হাতে হাত মিলিয়ে প্যারিসের রাজপথে ঘুরে বেড়ায়। পর্তুগীজ মেয়েরা নিগ্রোর সঙ্গে প্রকাশ্যে প্রেম করতে লজ্জা পায় না।

অর্থাৎ, ইংরেজ মেয়েদের তুমি এজন্যে বিশেষ বাহবা দিতে রাজী নও।

না। একটা কথা তোমায় বলি। য়ুরোপের শাদা-চামড়া মেয়েদের কালো বা তামাটে চামড়ার প্রতি একটা বিচিত্র আকর্ষণ। ওরা যতই সভ্য হচ্ছে, ততই আদিমতার প্রতি একটা গোপন লোভ বাড়ছে। নিগ্রোকে ওরা আদিম মনে করে। ভাবে, শাদা মানুষের চেয়ে নিগ্রোর কাছে দেহসুখ বেশি পাওয়া

যাবে। পাওয়া যাবে তেমনি একটা কিছু যা প্রথম পুরুষ প্রথম নারীকে দিয়েছিল।

একটি ছেলেকে জানি, জার্মেনীতে মেয়েরা তাকে পাকড়াও করে তার গায়ের রং সত্যিই তামাটে কি না পরীক্ষা করে দেখেছিল।

এ বিষয়ে অবশ্য ভারতীয় মেয়েদের কোন কৌতূহল নেই।

কালোতেও নেই, শাদাতেও নেই।

শাদার প্রতি আকর্ষণ আছে। যাই বল না কেন, তোমরা ভয়ানক বর্ণ-সচেতন!

নিশ্চয়। পার্বতী হেসে বলল। সেজন্যেই তো আমার বিয়ে হল না।

সত্যি পার্বতী, আমি মাঝে মাঝে ভাবি তোমার বিয়ে হল না কেন?

হাসি চেপে নকল গাম্ভীর্য দেখিয়ে পার্বতী বলল, ঐ যে বললাম, আমি কালো ও কুরূপা বলে।

পিটার গভীর গলায় বলল, তুমি তো কুরূপা নও।

তবে কি আমি সুন্দরী?

নিশ্চয়।

তোমার দৃষ্টির প্রশংসা করতে পারছি নে, পিটার। এমন একদেশদর্শী চোখে তুমি ভবিষ্যতে শাসন করবে কি করে?—পার্বতী জীবনে এই প্রথম শুনল পুরুষের চোখে তার রূপ আছে। একটা অদ্ভুত অবাধ্য আনন্দ খেলে গেল তার মনে।

তুমি বার বার বলো না আমি একদিন শাসক হব। কিন্তু, পার্বতী. তুমি নিজেও নিশ্চয় জান তুমি মোটেই রূপহীন নও।

আমিও জানি? তাই নাকি?—পার্বতী জোরে হেসে উঠল।

তোমার রং কালো। কিন্তু তোমার মুখখানা সুন্দর। তোমার চোখ দুটি বুদ্ধির, মননের দীপ্তিতে উজ্জ্বল। তোমার কপালে চিন্তাশীল মনের পরিচয়। তোমার নাকে, ঠোঁটে দৃঢ় সঙ্কল্পের ইঙ্গিত। চিবুক তোমার নরম, সহানুভূতি ও স্নেহশীল মনের ছাপ। তুমি সোজা হয়ে চল, তোমার পদক্ষেপে আশ্চর্য নির্ভীকতা, আত্মবিশ্বাস। তোমার দেহ সুস্থ, বলিষ্ঠ যৌবন। তুমি সোজা ভাষায় সহজ কণ্ঠে কথা বল, তোমার কথায় বোঝা যায় চিন্তা তোমার কত পরিষ্কার। কোন কপটতা, জটিলতা তোমার চরিত্রে নেই। তুমি লোভী নও, জীবন থেকে পালাতে চাও না, সংগ্রামের জন্যে সর্বদাই

তুমি তৈরি। তোমার চরিত্রে, চাল-চলনে চমৎকার শালীনতা। তোমাকে দেখলে মনে হয়, তুমি সাধারণ মেয়ে নও। কোনরকম চপলতা তোমার উপস্থিতিতে বিন্দুমাত্র প্রশ্রয় পায় না। তবু তুমি সুন্দর নও?

মুগ্ধ হয়ে শুনছিল পার্বতী। যেন সে বসে আছে একা, তার ঘরের বারান্দায়, গ্রীষ্মের ধূসর সন্ধ্যায়। আকাশ বহুদূরে শস্যপূর্ণ মাঠের শেষে বিদায়ের নতি জানাচ্ছে। একটু পরেই আর তাকে দেখা যাবে না। অন্ধকার নেমে আসছে নিঃশব্দে, সলজ্জ নববধূর মতো। আকাশের গায় দু'-একটা তারা মিটমিট করছে। একে একে গ্রামের পুরুষ ঘরে ফিরছে। মাঠ থেকে ফিরছে মেয়েরা শেষ-বোঝা মাথায় করে। চাষীর বৌ জল নিয়ে ঘরে ফিরছে। ছেলেমেয়েরা দিনের খেলা সাঙ্গ করে যার যার বাড়ির পথ ধরেছে। অসংখ্য অজানা পোকার গুঞ্জনে কেমন একটা বিষণ্ণ ঐক্যতান। রাত-কি-রানীর গন্ধ ভেসে আসে মৃদু সান্ধ্য বাতাসে।

পার্বতী শুনছিল পিটারের কথা। কিন্তু পিটার যে মুখোমুখি বসে আছে, সে ভুলে গিয়েছিল। মনে হচ্ছিল, দিনান্তের নীরব নির্জন মুহূর্তে বাতাস বুঝি তাকে বলে যাচ্ছে কথাগুলি। পার্বতীই কি মনে মনে এসব কথা কোনদিন ভাবে নি? ভাবে নি, আমার এত আছে, তবু কেন আমি একা, তবু কেন আমি নিঃস্ব? তবু কেন মনে হয় আমি ফুরিয়ে গেছি, আমার কিছু পাবার নেই, কিছু দেবার নেই? কেন মনে হয় আমার জীবন দিল্লীর গ্রীষ্ম-দুপুরের মতো মৌন, নিজের জ্বালাময় নির্জনতায় সম্পূর্ণ?

পিটার কথাগুলি বলছিল আনমনে, ঠিক পার্বতীকে লক্ষ্য করে নয়। তা না হলে কিছুতেই সে বলতে পারত না। আজকের নিদাঘ দিনের শেষে, শুকনো গরম সন্ধ্যায়, কেমন একটা অবাস্তবতা। পার্বতী বসে আছে চোখের সামনে, বেতের চেয়ারে, হাতের ওপর একটি গাল ন্যস্ত। পিটার দেখতে পাচ্ছে তার মুখের একাংশ, তার দুটি চোখ। পার্বতী ছাই রং-এর একটা তাঁতের শাড়ি পরেছে, কালো রং-এর ব্লাউজ। তাকে বেশি কালো দেখাচ্ছে। কিন্তু পিটার পার্বতীর কালো দেখছে না, দেখছে আলো। এ আলো পার্বতীর ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে পিটারের মনে লেগেছে। এ আলো শুধু পার্বতীর নয়, পিটারেরও। এ আলোতে পার্বতী যেন কিছুটা অলীক, অবাস্তব, পার্বতী অনেকখানি রহস্য। পিটার পার্বতীর মধ্যে যা দেখেছে, পার্বতীকে যেমন

জেনেছে, নিজের কাছেই যেন নিজে বলছে। পার্বতী শুনছে কি শুনছে না, তাতে লাভ লোকসান নেই।

নীরবতা নামল সন্ধ্যায় অন্ধকারের হাত ধরে। কথা শেষ হলে পিটার বুঝল, আর কিছু বলার নেই। আমি সব বলে ফেলেছি, যা কোনদিন বলবো ভাবি নি, তাও। হয়তো পার্বতী ভুল বুঝবে, হয়তো রাগ করবে। হয়তো আমি উচিতের সীমা লঙ্ঘন করেছি, আবার আমার পতন হয়েছে।

পার্বতীকেই নীরবতা ভাঙতে হল। হাসি টেনে সে বলল, তুমি যে এত স্তুতি করতে পার জানতাম না।

পিটার চুপ করে রইল।

পার্বতী বলল: কিন্তু কি জান? এত কিছু সত্ত্বেও আমার বিয়ে হল না।

তুমি বিয়ে করতে চাও নি বলে।

তাই নাকি? বিয়ে করতে চাইব কখন? চাইব কাকে?

তুমি কাউকে ভালোবেসেছ, পার্বতী?

অর্থাৎ কারও প্রেমে পড়েছি কি না?

পড়েছ?

রতন খান্নার কথা একবার মনে হল পার্বতীর। হাসি পেল। বলল, না, ওসব আর হল না।

তুমি তো এখনো কাউকে ভালোবাসতে পার, বিয়ে করতে পার।

হয়তো পারি। কিন্তু ও কাজটা, কি জান, একা একা হতে চায় না।

পিটার কৌতুকের ধার-কাছ দিয়ে গেল না। তার কণ্ঠস্বর ভয়ানক গম্ভীর। যেন বিরাট ঝড় বহন করছে, শাসন করছে, বুকের মধ্যে।

আমি জানি কোথায় তোমার বাধে। এমন পুরুষ তুমি পাও না যার কাছে নিজেকে দিয়ে পূর্ণ হতে পার।

পার্বতীকে নীরব দেখে পিটার বলল: একটা কথা জিজ্ঞেস করি, যদি অনুমতি দাও।

বল।

আমি যদি অবিবাহিত হতাম, যদি তোমাকে বিয়ে করতে চাইতাম, তুমি রাজী হতে?

প্রশ্নটা চাবুকের মতো পার্বতীর গায়ে বিদ্ধ হল। হঠাৎ মাথা টনটন করে উঠল, চোখ জ্বালা করতে লাগল। বুকের নিঃশ্বাস আটকে গেল।

পিটার হারিয়ে ফেলল নিজেকে।—আমি নিগ্রো, বহুদূর আফ্রিকায় আমার বাস। তোমার আমার জীবনে কোন মিল নেই। আমি বিবাহিত, সন্তানের জনক। ওয়াচিরা আমার অনেক স্নেহ, অনেক ভালোবাসার স্ত্রী। আমি কয়েক সপ্তাহ পরেই দেশে ফিরে যাব পার্বতী। কিন্তু মানুষ কি বিস্ময়কর জীব। তার বিকাশের যেন শেষ নেই। একটা মানুষের মধ্যে অনেক মানুষ লুকিয়ে থাকে। সে জানাতেও পারে না। আমিই কি কোনদিন ভাবতে পেরেছি, পিটার কাবাকু এক নয়, একাধিক? আজ জানি, পিটার কাবাকু ভারতবর্ষে পাঁচ বছর আগে এসেছিল, তোমার সংস্পর্শে এসে সে অন্য পিটার কাবাকু হয়েছে। তার দৃষ্টি খুলেছে, মনের আকাশ নতুন দিগন্ত স্পর্শ করেছে, নতুন অনুভূতি, নতুন স্বপ্ন তার বুকে বিপ্লব এনেছে। এ পিটার কাবাকুর জন্মে পূর্ণতা নেই, পার্বতী। আমি একে বুকের মধ্যে চেপে চলে যাচ্ছি, যেখান থেকে এসেছিলাম, সেখানে, এ আমার একান্ত নিজের। সারা জীবন বিরাট বোঝা হয়ে এ আমার বুকের ওপর চেপে থাকবে, আমায় দুঃখ দেবে, ব্যথা দেবে। যাবার দিন এগিয়ে আসার আগে, মাঝে মাঝে বড় ইচ্ছে হয় পার্বতী, তোমাকে জিজ্ঞেস করি এ নতুন পিটার কাবাকুকে তুমি স্বীকার কর কিনা, মান কিনা সে তোমার নিজের সৃষ্টি, তাই একান্তভাবে তোমারই। তুমি এটুকু সম্মান তাকে দিতে রাজী আছ?

অন্ধকারে দুজনে দুজনকে পুরো দেখতে পেল না। পার্বতী দেখল, একখণ্ড কৃষ্ণ পাথরের মতো নিশ্চল, স্থির বসে আছে পিটার, শুধু অন্ধকারে জ্বলছে তার চোখ। পিটার দেখল পার্বতী অচঞ্চল, শান্ত, একখণ্ড কৃষ্ণ মেঘের মতো, হাতের মধ্যে নুয়ে পড়েছে মাথা, মাথা থেকে খসে পড়েছে চুল।

হঠাৎ পার্বতী উঠে দাঁড়াল। কোথা থেকে অস্বাভাবিক কাঠিন্য এল তার কণ্ঠে। বলল, তোমাকে তো তোমার বাবা আর একটা বিয়ে করতে তাগাদা দিচ্ছেন। বরং সোজা প্রস্তাব কর না, দ্বিতীয় বৌ হয়ে আমি তোমার সঙ্গে আফ্রিকা যেতে রাজী আছি কিনা।

বিহ্বল, বোবা হয়ে তাকিয়ে রইল পিটার।

পার্বতী বলে চলল, ভেবেছিলাম শেষরক্ষা তুমি করতে পারবে। পারলে না। লোভ তোমার ধরা পড়ে গেল। ভুলে গেলে ওয়াচিরা বসে আছে তোমার প্রতীক্ষায়। যা সুন্দর ছিল, তাকে নোংরা করলে। আমাকে অপমান

করলে। নিজের অসম্মান করলে। এর পরে, হয়তো একদিন একলা পেয়ে, আমায় আরও অপমান করতে চাইবে।

অন্ধকারে প্রবল হাওয়ার মতো বেরিয়ে গেল পিটার কাবাকু। পার্বতী শুধু তার ভীষণ গতি টের পেল। দেখল, অন্ধকার রাস্তা ভেদ করে চলেছে পিটার, আহত পশুর মতো।

পার্বতী দেখল, ছায়া মেলাল অন্ধকারে। ঘরে গিয়ে বাতি জ্বালল। দুটি মেয়ে পড়তে আসবে এক্ষুনি।

তের

বিবেক সোম বলল, জন, এই হচ্ছে আমার আফ্রিকার বন্ধু, পিটার কাবাকু, যার কথা তোমায় অনেক বলেছি।

জন মিলার পিটার কাবাকুকে করমর্দন করল।

আপনার সঙ্গে পরিচিত হয়ে আনন্দ পেলাম।

আমিও, জবাব দিল পিটার।

আপনার কথা আমি সোমের কাছে অনেক শুনেছি। অথচ এতদিন আমাদের দেখা হয় নি।

বিবেক বলল, কি করে হবে? তোমরা দুজনেই ভারত-দর্শনে ব্যস্ত। আর কিছু দেখবার সময় কি তোমাদের আছে? জনের যদি-বা আছে, পিটারের তো একেবারেই নেই।

আমার অন্তত তোমাকে দেখবার সময় আছে, ফোড়ন কাটল জন মিলার।

আমাকে কেন, অনেককেই দেখবার সময় তোমার আছে। বেশি আমায় উসকিয়ো না, হাটে হাঁড়ি ভাঙব। সুরমা যে ভাবে মিলার সাহেব ভাজা মাছ উল্টে খেতে জানে না, তার জ্ঞান চক্ষু খুলে যাবে।

সবতাতেই আমাকে তোমার একবার জড়ান চাই, প্রতিবাদ করল সুরমা।

তোমাকে জড়িয়েই তো বেঁচে আছি, চুপি চুপি বলল বিবেক।

পরিবেশ নয়া দিল্লীর রাজপথে কোন এক আরব দূতাবাসের বিস্তীর্ণ সবুজ প্রাঙ্গণ। একটি আরব রাজ্যের জাতীয় দিবস উপলক্ষে সান্ধ্য অনুষ্ঠান।

বৈদ্যুতিক রং-বেরং আলোকমালায় প্রাসাদোপম দূতাবাস সুসজ্জিত। শহরের বেশ কিছু স্ত্রী-পুরুষ নিমন্ত্রিত হয়ে এসেছেন, তাঁরা বহু দেশের মানুষ। শাদা, কালো, তামাটে, হলদে। রাষ্ট্রদূত সপত্নীক গেটের পাশে দাঁড়িয়ে সবাইকে স্বাগত করছেন। এক পাশে উঁচু একটা স্থানে বিশেষ সম্মানিত অতিথিদের বসবার ব্যবস্থা, কয়েকজন মন্ত্রী, কিছু উচ্চপদস্থ রাজপুরুষ সেখানে বসে, বা দাঁড়িয়ে, কথাবার্তা কইছেন। বাকী সবাই ছোট ছোট দল বেঁধে জটলা করছে। নানা ভাষার বিচিত্র কলরবে প্রাঙ্গণ মুখরিত। বিদেশিনীরা এসেছেন হাল ফ্যাসনের পোশাক পরে, কারুর বক্ষদেশ অর্ধেক অনাবৃত, কারুর বা পিঠ। পশ্চিমী বিদেশিনীরাও গহনা পরেছেন, রোমে গেলে রোম্যান হতে হয়, ভারতে এলে ভারতীয়। মহিলাদের মুখ থেকে কেবল বিস্ময়সূচক চাপা ধ্বনি নির্গত হচ্ছে। তাঁরা প্রত্যেকে প্রত্যেককে দেখে বিস্মিত হচ্ছেন, প্রত্যেকের পোশাক দেখে, আভরণ দেখে, হাবভাব দেখে। সুবেশ বিদেশীরা ঘুরে ঘুরে মেয়েদের সঙ্গে ভাব জমাচ্ছে। ভারতীয় পুরুষরা বার বার তাদের শূন্য গ্লাস ভর্তি করে যাচ্ছে। কেউ কেউ সহধর্মিনীদের সঙ্গে এনেছেন, তাঁরা বিমুগ্ধ নয়নে স্বামীর মদ্যপানজনিত আনন্দ নিরীক্ষণ করছেন। কয়েকজন মহিলা, যাঁরা প্রত্যেক দূতাবাসের প্রত্যেক অনুষ্ঠানে অবশ্য নিমন্ত্রিত, বিদেশীদের সঙ্গে গাল-গল্পে জমে আছেন। একজন শিখ সঙ্গে এনেছে একটি ক্যামেরাম্যান; ঘুরে ঘুরে এক একজন এ্যামবাসাডারের সঙ্গে যেচে আলাপ করছে, আর ক্যামেরাম্যান একটি করে ফ্ল্যাসস্ট্ নিচ্ছে। দুদিন পরেই সর্দারজী রাজধানীর দশটি এ্যামবাসাডার যে তার একান্ত 'ইয়ার' তা প্রমাণ করতে পারবে।

এসব অনুষ্ঠানে নিমন্ত্রিত হবার কোন সুনির্দিষ্ট মাপ-কাঠি নেই। সাধারণত, সমাজের উঁচু ও মাঝারি স্তরের মানুষরা নিমন্ত্রণ পেয়ে থাকেন। দূতাবাসের কমার্শিয়াল কাউন্সিলারের সঙ্গে বিবেক সোমের বন্ধুত্ব, তাই মিঃ ও মিসেস সোম নিমন্ত্রিত। জন মিলার শহরের অনেককেই চেনে, সে তো নিমন্ত্রণ পাবেই। পিটার কাবাকু দিল্লীর আফ্রিকা-সঙ্ঘের সেক্রেটারী, তাই তার নিমন্ত্রণ।

প্রাঙ্গণের একপাশে আরাম চেয়ারে ওরা চারজন বসে গল্প করছিল, ক্রমে ক্রমে আরও কয়েকজন এসে জুটল: একটি অত্যন্ত সুদর্শন সিরিয়ান যুবক—অমিশ্র আর্য চেহারা—এক মার্কিন দম্পতি, একটি বর্মী মেয়ে, মিলারের

বান্ধবী, এবং জনা দুই ভারতীয়, সোমের পরিচিত। পুরুষদের হাতে গরম পানীয়, মেয়েদের হাতে নরম।

সিরিয়ান যুবকটি জনপ্রিয়। বদলি হয়ে বর্মায় যাবার হুকুম এসেছে। সে বর্মী মেয়েটির কাছে রেঙ্গুণ সম্বন্ধে তথ্য আহরণ করছে।

এমন সময় অদূরস্থ একটি রমণী জন মিলারের দৃষ্টি হরণ করল। দীর্ঘাঙ্গী, দেহের বর্ণ গজদন্তশুভ্র, আকর্ণবিস্তৃত চোখ, সূক্ষ্ম, সুগঠিত নাক। নিচু-কাটা চৌলিতে পিঠের ও কাঁধের অনেকখানি অনাবৃত। চৌলি ও নীবিবন্ধের মাঝখানে কটিদেশের প্রখর দীপ্তি।

তোমার সঙ্গে বসলেই কেবল রাজনীতি কপচাতে হয়। গলা একেবারে শুকিয়ে গেছে। বেয়ারাটা পর্যন্ত অনেকক্ষণ এমুখো হচ্ছে না। যাই, একটু মুখ বদলে আসি।—জন মিলার উঠবার উপক্রম করল।

উনি হচ্ছেন কে, জন ?

কার কথা বলছ, বিবেক ?

যার অনাবৃত পৃষ্ঠদেশে এতক্ষণ তোমার চোখ বিচরণ করছিল।

তুমি ভয়ানক অসভ্য, ঘোরতর মিথ্যেবাদী। ভুলে যাচ্ছ যে মিসেস সোম রয়েছেন এখানে।

ভুল করলে হে জন মিলার। সুরমা যে সঙ্গে রয়েছে সেটাই তো কিছুতে ভুলতে পারছি না। পারলে, তোমার মতো আমিও ইতস্তত বিহার করতাম। তাছাড়া, সুরমা কি তোমার স্বভাব-চরিত্র জানে না ?

জানেন বৈকি ? জানেন, আমি একটি নিষ্কলঙ্ক কুমার। কি বলেন মিসেস সোম ?

আপনি যেন একটু বেশি জোরে প্রতিবাদ করছেন। সুরমা বলল।

হাসতে হাসতে সোম যোগ দিল, তুমি যে নিষ্কলঙ্ক তাতে আমাদের সন্দেহ নেই। কোন কলঙ্কই তোমাকে স্পর্শ করে না। সে কথা থাক। এবার বল, নারীটি কে ?

একদা ছিলেন প্রিন্সেস উমা, এখন মিসেস বাজপাই।

তোমার সঙ্গে পরিচয়টা—

ঘনিষ্ঠ এবং অনেকদিনের। আচ্ছা, তোমরা বস, আমি একটু ওদিক হয়ে আসি। মাপ করবেন, মিসেস সোম। মিঃ কাবাকু, আপনার সঙ্গে পরে গাল-গল্প করব। আমিও যাচ্ছি আপনাদের আফ্রিকায়। না, না, এক্ষুনি নয়। দু'

চার বছর পর। ততোদিনে এশিয়া ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। আফ্রিকা হবে সরগরম। তখন আমি হাজির হব আপনাদের দেশে। তাই আপনার সঙ্গে বন্ধুত্বটা পাকা করতে হয়। আপনাকে আমি খুঁজে নেব, সেজন্যে ভাববেন না। সোম, তুমি এখান থেকে সোজা বাড়ি যাবে, না অন্য কোথাও?

সুরমা যখন সঙ্গে আছে তখন পথ সীমাহীন নয়।

আমরা একজন বন্ধুর বাড়ি যাব, সুরমা বলল। দরিয়াগঞ্জে।

পিটার কাবাকুকে বিবেক গাড়িতে তুলে নিল। যাবার পথে নামিয়ে দেবে কার্জন রোডে।

তোমাকে বড় বিষণ্ণ লাগছে আজ, পিটার। যেতে যেতে পার্শ্ববর্তী কাবাকুকে প্রশ্ন করল বিবেক।—তোমার শরীর ঠিক আছে তো?

শরীর ঠিক আছে, ধন্যবাদ।

তবে তুমি মন-মরা কেন?

ও এমন কিছু নয়।

তোমাদের ভীমগড়ে গ্রামের কাজ কতদূর এগোল?

বাঁধটা প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। রাস্তা তো তৈরি।

বাঃ, তুমি কি রোজই যাও?

অনেকদিন যাই নি।

পার্বতী কেমন আছেন?

যতদূর জানি ভালোই আছেন।

দেশের খবর পাচ্ছ?

অনেকদিন কোন খবর নেই।

ও, তাই তোমার মন এত খারাপ?

কিছুদিন হল বিদ্রোহের আগুন আমাদের গ্রামের দিকে ছড়িয়ে পড়েছে। ইংরেজ গ্রামের পর গ্রাম জালিয়ে দিচ্ছে। তাই বড় ভাবনা হয়।

তোমার ফিরে যাবার কিছু ঠিক হল?

এবার যাব। কিনিয়ার পথ বন্ধ। আমার প্রবেশ নিষেধ। তাই গোল্ড কোষ্ট যাব। ওখান থেকে কোনমতে কিনিয়ায় পৌছতে পারব।

আর কিছুদিন থেকে যাও না কেন?

অনেকদিন তো হল। মনটা বড় অস্থির হয়ে উঠেছে।

কবে রওয়ানা হতে পারবে ভাবছ?

বুঝতে পারছি না। তবে তৈরি হচ্ছি। যাতে সুযোগ এলেই বেরিয়ে পড়তে পারি।

দুঃখ করে বিবেক সোম বলল, তুমি যাবেই, ধরে রাখা যাবে না তোমাকে। কিন্তু তোমার অভাব আমাদের মনে বিঁধবে।

তার চেয়ে বেশি বিঁধবে আমার, সোম। তোমার মতো বন্ধু জীবনে বেশি হয় না। আচ্ছা, এসে গেছি। ঐ গাছটার নিচে আমায় নামিয়ে দাও। ধন্যবাদ। নমস্তে মিসেস সোম। সোম, আবার দেখা হবে।

হঠাৎ পালিয়ো না যেন। যাবার আগে খবর দিয়ো, পিটার।

নিশ্চয়, নিশ্চয়।

ফটকের মধ্যে ঢুকে, লন পেরিয়ে, পিটার প্রথমে গেল রিসেপ্সনিষ্টের টেবিলে।

কোনও চিঠিপত্র আছে, মিঃ বাত্রা?

নির্দিষ্ট খোপ থেকে অল্পবয়সী ছেলেটি দুখানা চিঠি, একখানা ম্যাগাজিন ও একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা বার করল।

হাতে নিয়ে পিটার বলল, ধন্যবাদ। কোন মেসেজ?

না।

বারান্দায় দাঁড়িয়েই পিটার চিঠি দুখানা দেখল। একখানা বোম্বাই থেকে এক বন্ধুর। অন্যখানা কলকাতা থেকে, তারই দেশের একটি ছেলের।

ওয়াচিরার চিঠি আজও আসে নি। আজও নেই কিনিয়ার খবর।

বড় অবসন্ন, নিস্তেজ, ক্লান্ত মনে হল কাবাকুর। বড় নিঃসঙ্গ, একান্ত একেলা। মনে হল, তার চতুর্দিকের সর্বকিছু যেন অচেনা, অজানা, ভয় ও সন্দেহের কালো ছায়া। আমি কে? কোথাকার আমি এ কোথায় এসেছি? আমি কি কোনদিন কোথাও সত্যিকারের ছিলাম? না, আমি শুধু ভেসে বেড়াচ্ছি, প্রথম বর্ষার হালকা মেঘের মতো? আমার যেন কেউ কোথাও নেই। আমার দেশ নেই, স্বজন নেই, সমাজ নেই।

আংশিক মন নিয়ে পিটার চিঠি দুটো পড়ল। বোম্বাই থেকে লিখেছে সুরেশ লিমায়ে, ওখানকার একটি পত্রিকার নিউজ এডিটর। বোম্বাইতে আলাপ হয়েছিল, খানিকটা বন্ধুত্বও। কিনিয়ায় গোলমালটা আবার পাকিয়ে

উঠেছে, তাই একটি প্রবন্ধ লেখার অনুরোধ। দু'চার দিনের মধ্যেই। প্রবন্ধ লিখব আমি কিনিয়ার ওপর? কিনিয়া আমায় ভুলে গেছে, আমাকে আর তার প্রয়োজন নেই। যে আগুনে কিনিয়া পুড়ছে সে আগুনে আমি পুড়ছি না—ওয়াচিরা তা ভুলতে পারে নি, তাই সে আমাকে ভুলেছে। আমার প্রবন্ধে কিনিয়ার কোন প্রয়োজন নেই।

কলকাতা থেকে লিখেছে তার স্বদেশী একটি ছেলে। বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন পড়ছে। ওখানকার আফ্রিকান ছাত্র সঙ্ঘের সেক্রেটারী।

চিঠি পড়ে পিটারের বুক কেঁপে উঠল। সর্বশেষ যে খবর কিনিয়া থেকে সে পেয়েছে তা রীতিমতো অশুভ। মাউ মাউ-এর বহ্নিবন্যা পিটারদের গ্রামের দিকে বেশ ভালোভাবে ছড়িয়ে পড়েছে। সন্ত্রাসবাদী একটা দলকে আশ্রয় দেবার অপরাধে ইংরেজ জ্বালিয়ে দিয়েছে কয়েকটি গ্রাম, আবার কয়েকজন আফ্রিকান সরকারের সঙ্গে সহযোগিতার অপরাধে নৃশংসভাবে মারা পড়েছে মাউ মাউ-দের হাতে। গ্রামের নামগুলি সে জানতে পারে নি; আশ্বাস দিয়েছে হয়তো পিটারের গ্রাম এখনো অক্ষত। জানিয়েছে গ্রামাঞ্চল থেকে শত শত মানুষের পলায়নের নির্মম কাহিনী।

চিঠি হাতে নিয়ে পিটার নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে রইল অনেকক্ষণ। বারান্দায় বিজলীবাতির আলোর ঝলকানি লক্ষ লক্ষ পোকাকে প্রলুব্ধ করেছে। তাদের অন্ধ আত্মাহুতির একটা করুণ আর্তনাদ পিটার যেন শুনতে পেল। এমনি করে আগুনের শিখায় জীবনের আহুতি চলেছে কিনিয়ায়। কিসের উন্মত্ত নেশায় শত শত মানুষ ঝাঁপিয়ে পড়ছে মৃত্যুর দাবানলে। জীবন হঠাৎ মরণের গৌরবে মহান হয়ে উঠেছে। মরতে পারার আনন্দে মানুষ মেতেছে। বড কিছুর জন্যে জীবন দেবার উন্মাদ আনন্দে তারা আত্মবিস্মৃত। নিরস্ত্র, দরিদ্র, অজ্ঞ, অজ্ঞাত মানুষের দল এগিয়ে চলেছে মুক্তির পথে। পথ বন্ধুর, দুর্গম। তারা মুখ থুবড়ে রাস্তায় পড়ছে, উত্তরগামীদের এগিয়ে যাবার আহ্বান জানিয়ে।

ঐ শহীদ মিছিলের মধ্যে পিটার দেখতে পাচ্ছে তার বাবা, মায়তো, ভাই-বোন, স্ত্রী, পুত্রকন্যা। ওরাও চলছে। কিনিয়ার মুক্তিপথ ওরা নির্মাণ করছে। ওয়াচিরাকে সে পেয়েছিল এক চরম লাঞ্ছনার মুহূর্তে। সে লাঞ্ছনা ওয়াচিরার নয়, কিনিয়ার। কিন্তু পিটার জানে, সে ওয়াচিরা আর নেই। জীবনের আগুনে পুড়ে ওয়াচিরা কঠিন হয়েছে। বহুবার সে দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে

বলেছে, যদি সুযোগ আসে অপমানের প্রতিশোধ নেব। পিটারকে দু'বাহুতে শক্ত করে বেঁধে বলেছে, তুমি কিনিয়াকে মুক্ত কর, ঐ বর্বর লোকগুলোকে তাড়াও, তাহলে আমার আত্মা মুক্তি পাবে। একদিন এন্‌গাথাকে নিয়ে দুজনে খেলা করছিল। পিটার বলছিল, বড় হয়ে তোমার ছেলে কি করবে? ওয়াচিরা চুপ করে রইল। দু'-তিনবার প্রশ্ন করায় দৃষ্টিকে গাঢ়, কণ্ঠস্বরকে কঠিন করে বলল: ওর মার অপমানের প্রতিশোধ নেবে। ওয়াচিরা কি শেষে নিজেই প্রতিশোধের পথে নেমেছে? তার ভূলুণ্ঠিত দেহ কিনিয়ার রাস্তায় কি আবার পড়ে আছে?

এ কী অলক্ষুণে কথা আমি সব ভাবছি? পিটার নিজেকে সামলে নিল। আমি অধীর, উতলা, অধৈর্য হয়ে কি করব? প্রাণ দেবার চেয়ে বেঁচে থাকা কত বেশি কঠিন! মৃত্যু তো মুক্তি! কিনিয়ার স্বাধীনতার জন্যে যারা মরছে তারা বাঁচবে। আমার মতো যারা নিরুপায় বেঁচে আছে তাদের তিল তিল মৃত্যু যে কত নির্মম তার ইতিহাস কে জানবে? আমাকে স্থির হতে হবে, স্থির থাকতে হবে। বইতে হবে, সইতে হবে। আমি কেন অমঙ্গল ভাবব? আমি তো অমঙ্গলের উপাসক নই! আমি চাই মঙ্গল, কল্যাণ, শান্তি, মুক্তি। আমি আমার দেশের মুক্তি চাই, আর তার সঙ্গে ইংরেজেরও মুক্তি। আমি চাই কিনিয়ার কল্যাণ, আফ্রিকার মঙ্গল—যার মধ্যে নিহিত ইংরেজের কল্যাণ, তারও মঙ্গল। আমাকে সাহসে বুক বাঁধতে হবে।

ঘরে এসে পিটার জামা-কাপড় ছেড়ে স্লিপিং স্যুট পরল। আজ আর ডাইনিং রুমে গিয়ে খেতে ইচ্ছে নেই। খাবারই কোন ইচ্ছে নেই। মাথা ধরে আছে, দেহে বিপুল অবসাদ, মনে ক্লান্তি। চেয়ারে দেহটাকে বসিয়ে পিটার ভাবল, সহজে এখন ঘুম আসবে না। মাঝে মাঝে আজকাল রাত্রিটাকে বড় ভয় হয়। ঘুম পলাতক, অথচ এলোমেলো চিন্তা ছাড়া জীবন নিঃসঙ্গ। একবার মনে হল জামা-কাপড় পরে বেরিয়ে যাই—কনট প্লেসে কোন একটা সিনেমায় ঢুকে রাত বারোটায় ফিরে আসি। কিন্তু মাথাটা ব্যথা করে উঠল, দেহ হল দ্বিগুণ ভারী। টেবিল থেকে বই তুলে নিয়ে পাতা ওলটাতে লাগল। একটা অক্ষরেও মন বসল না, চোখের সামনে ছাপান লাইনগুলি আঁকা-বাঁকা সর্পিল গতিতে পরস্পরের সঙ্গে হুড়োহুড়ি লাগিয়ে দিল। চোখটা হঠাৎ ঝাপসা হয়ে এল।

কাঁদতে পেরে পিটার যেন মুক্তি পেল। চোখের জলে তার গাল ভেসে

গেল, জামা ভিজল। অনেক কান্না অজ্ঞাতে জমা হয়ে ছিল, অনেকখানি ভার নিয়ে সে বেরিয়ে গেল।...

দরজায় মৃদু আঘাতে পিটারের নীরব কান্না রহিত হল। রুমাল দিয়ে মুখ-চোখ মুছে কান পাতল শব্দের পুনরাবৃত্তির জন্যে। খানিকক্ষণ কোন আওয়াজ নেই। তারপর আবার মৃদু আঘাত। পিটার উঠে প্রথম গেল বাথরুমে। চোখ-মুখ ধুয়ে ফিরে আসতে তৃতীয়বার মৃদু করাঘাত শুনতে পেল। এগিয়ে গিয়ে দরজা খুলে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

তুমি! খানিকক্ষণ পরে কথা ফুটল পিটারের মুখে।

আমি। আস্তে নিবেদন করল পার্বতী।

তুমি এখানে, এত রাত্রে!

উপায় কি বল? দুবার এর আগে এসে গেছি। তোমার পাত্তা নেই।

একা এসেছ?

আমার আবার সঙ্গী কোথায়?

এখন ফিরবে কি করে? থাকবে কোথায়?

তুমি বেশ লোক বটে। মৃদু হেসে পার্বতী বলল।—এখনো দরজায় দাঁড়িয়ে আছি। ঘরে পর্যন্ত ডাক নি। প্রশ্ন করছ যাব কি করে?

তুমি আশ্চর্য মেয়ে! জান, আমি নিগ্রো? আমার ঘরে এত রাত্রে একা তোমার আসতে নেই?

তাই নাকি? সর, আগে একটু বসি। তারপর দেখব তুমি কতটা ভয়ঙ্কর।

পিটার হেসে ফেলল: এস। আবার বলল, তোমার কি অপবাদের ভয় নেই, পার্বতী?

নিশ্চয় আছে। কার না থাকে?

তাহলে—

দেখা যাক। তোমার ঘরে জল আছে? একটু জল খাব।

বিক্ষিপ্ত জামা-কাপড় বিশৃঙ্খল ঘরখানার শ্রীহীনতা পিটারকে সঙ্কুচিত করল। বলল, বড় নোংরা হয়ে আছে সবকিছু। তুমি এ চেয়ারটায় বস।

পার্বতী হেসে বলল, আমার ঘরও যে খুব পরিষ্কার থাকে তা নয়। তবে তোমার চেয়ে অনেক ভালো।

যে একা-পুরুষ ছবির মতো ঘর সাজিয়ে রাখে, সে লোক সুবিধের নয়। তাকে সর্বদা এড়িয়ে চলবে।

কিন্তু তাই বলে আমি তোমার নোংরা ঘর সাফ করতে বসব না। এ কাজটা আমাদের উপন্যাসের নায়িকাদের জন্যে। তারা ছেলে-বন্ধুর ঘর গুছিয়ে দেবার জন্যে রুদ্ধনিঃশ্বাসে প্রতীক্ষা করে।

তোমাকে ঘর গোছাতে হবে না। তুমি আজ গোছাবে, কালই আমি আবার নোংরা করে ফেলব।

পার্বতীকে গ্লাসে করে জল দিল পিটার। একটা চেয়ার থেকে বই-কাগজ সরিয়ে বসল। তারপর পার্বতীর চোখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করল : ব্যাপার কি পার্বতী?

অর্থাৎ, আমি কেন এসেছি?

প্রশ্নটা অবান্তর নয়।

এক এবং অদ্বিতীয় প্রশ্ন। কিন্তু উত্তর দেবার আগে আমারও কিছু জিজ্ঞাস্য আছে।

জিজ্ঞাসা কর।

আজ কতদিন তুমি ভীমগড় যাও নি?

সাতচল্লিশ দিন।

কেন?

জনস্বার্থের খাতিরে এ প্রশ্নের জবাব দেওয়া হবে না।

এতদিন তুমি কি করেছ?

ইতস্তত বিহার ও আত্ম-সমীক্ষা।

দেশের খবর কি?

আগুন ছড়িয়ে পড়ছে।

ওয়াচিরা এবং আর সবাই ভালো ও নিরাপদ তো?

জানি না। শুধু জানি আমাদের গ্রাম নিরাপদ নেই।

এ খবর কবে পেলে?

আজই। একটু আগে।

ওঁরা সবাই অন্যত্র চলে গিয়েছেন হয়তো।

হতে পারে। আবার নাও হতে পারে।

পার্বতী বলল, তুমি আপনজনের কথা ভেবে কষ্ট পাচ্ছ, তোমার দুঃখ দূর

করবার ক্ষমতা আমার নেই। এ ব্যথা তোমাকে বহন করতেই হবে। যে পথে পা বাড়িয়েছ তার দক্ষিণা বড় কঠিন। তার জন্যে বন্ধুবান্ধব ত্যাগ করে শুধু অসহায় দুশ্চিন্তাটাকে প্রশ্রয় দেওয়াটাই কি পুরুষের মতো হল ?

পিটার চুপ করে রইল।

নীরবতা ভেঙে পার্বতী আবার বলল: তোমার প্যাসপোর্ট হয়ে গেছে।

তাই নাকি ? জাহাজে বুকিং ?

তাও হয়ে গেছে। আগামী মাসের আঠারই।

ধন্যবাদ, পার্বতী। তোমার সাহায্য ছাড়া আমি যেতে পারতাম না।

তোমার যাত্রাপথ তৈরি করে দিলাম পিটার—ভারী গলায় বলল পার্বতী। যাবার আগে একদিন এস।

পিটার চুপ করে রইল। হঠাৎ অর্থহীন প্রশ্ন করে বসল, তুমি ভালো আছ পার্বতী ?

আমার দেহটা এত মজবুত যে আমি সর্বদাই ভালো থাকি।

দেহটাই তো মানুষের সব নয়!

মনটাও ভালোই ছিল। তুমি সেদিন তচনচ করে দিলে। চীনেমাটির দোকানে ষাঁড় ঢুকল। তচনচ করে দিয়েই হনহন করে পালাল। আর ও-মুখো হলে না।

বড অন্যায় করে ফেলেছি। সত্যি বলছি পার্বতী, ওসব কথা আমি একেবারেই বলতে চাই নি। কেন যে বললাম, কি করে যে বেরিয়ে গেল, বুঝতে পারলাম না।

পার্বতী নীরবে তাকিয়ে রইল।

তুমি রেগে গেলে। বললে, আমি নিজের অসম্মান করেছি, তোমার অপমান। ঈশ্বর জানেন, পার্বতী, আমি কোনদিন নিজেকে ছোট হতে দিই নি। নিগ্রোকে জীবনে অনেক অপমান কুড়ুতে হয়। আমিও কুড়িয়েছি। কিন্তু অন্তরে আমি নিজের কাছে ছোট হই নি। এটুকু অ্যাসবিও জানত। মিসেস গোয়েলের কথা তোমায় বলেছি। অমন করে প্রতারিত হয়েও আমি ছোট ব্যবহার করি নি। নিজের স্খলনে আহত হয়েছি, বিষের জ্বালায় নীরবে জ্বলেছি, নিজেকে শাসন করেছি। যাতে আবার মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারি।

ধীরে ধীরে পার্বতী বলল, তুমি সেদিন বড় আঘাত পেয়েছিলে। তোমাকে ব্যথা দিয়ে আমিও ব্যথা পেয়েছি। আমায় মাপ কর তুমি।

সে আঘাত যে কী সাংঘাতিক তা তুমি বুঝবে না, পার্বতী। মেয়ে-ঘেঁষা পুরুষ আমি নই। ওয়াচিরাকে কি পরিবেশে বিয়ে করেছি তুমি জান। ভারতবর্ষে এসে বুঝতে পেরেছিলাম এদেশের মেয়েরা আমাদের সঙ্গকে গৌরবের মনে করে না। আমাদের এড়াতে চায়। অনেক নিগ্রো এদেশে মেয়েদের সঙ্গে ভাব জমাতে গিয়ে লাঞ্ছিত হয়েছে, ভালোবেসে পুড়ে অঙ্গার হয়েছে। আমি যথাসাধ্য মেয়েদের সঙ্গ এড়িয়ে চলেছি। বিশ্ববিদ্যালয়ে যে দুঃসাহসী পেশোয়ারী মেয়েটি সবার ঠাট্টা বিদ্রূপ অগ্রাহ্য করেও আমার সঙ্গে মিশত, তার কথাও তোমাকে বলেছি। হঠাৎ একদিন একটা উড়ো চিঠি পেলাম। তাতে লেখা, কান্তা শেঠের সঙ্গে ছাড়, নয়তো তোমাকে বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়তে হবে। অবাক হলাম, দুঃখও হল। কান্তা শেঠের চেয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল্য আমার কাছে অনেক বেশি। মিস শেঠকে চিঠিটা দেখালাম। উনি তো রেগেমেগে আমাকে ভাইস-চ্যান্সেলারের কাছে নিয়ে যাবেন। আমি বুঝিয়ে বললাম, দূরদেশে এসেছি শিক্ষার জন্যে, ভারত-সরকারের দাক্ষিণ্যে। আমার উচিত সবাকার সঙ্গে মিলেমিশে চলা। সব গোলমাল এড়িয়ে চলা। তারপর কান্তা শেঠের সঙ্গে একদিনও মিশি নি। কিছুদিন আগে বই-এর দোকানে তাকে দেখলাম। সঙ্গে একটি পুরুষ, মনে হল তার স্বামী। সে আমাকে দেখেও দেখল না। এর পরে তোমাদের দেশে যে স্ত্রীসঙ্গ আমি পেয়েছি তাতে অমৃত ছিল না, ছিল বিষ। মদ খাওয়ার মাদকতা, বেঁচে থাকার আনন্দ নয়। কিন্তু সে নোংরা আমার মনকে স্পর্শ করে নি। পথ চলতে পায়ে ধুলো লাগে, সে ধুলো মনে দাগ কাটে না।

বুঝেছি।

সেদিন সন্ধ্যায় তুমি বুঝতে পার নি। তাই বলতে পেরেছিলে আমি তোমায় অপমান করেছি। ভারতবর্ষে সর্বপ্রথম এবং সর্বশেষ বান্ধবী আমার তুমি। মনে করে দেখ আমি তোমার সঙ্গে যেচে আলাপ করি নি। ভাঁয়রো নদীর নির্জন তীরে গাছের নিচে বসেছিলে তুমি, তোমায় দেখে আমি পাশ কাটাবার তালে ছিলাম। তোমার অনেক কথা শুনেছিলাম, তোমাকে জানবার আগ্রহ ছিল প্রচুর, কিন্তু চেপে রেখেছিলাম মনে সে আগ্রহ। তুমিই প্রথম কথা বলেছিলে, আলাপ করেছিলে। প্রথম প্রথম তোমাকে আমি এড়াতে

চাইতাম, হয়তো তুমি আমার দ্বিধা ও সঙ্কোচ বুঝতে পেরে আমায় কাছে ডেকে গল্প করতে। তারপর একটা যৌথ কাজের প্রেরণা ও উত্তেজনা আমাদের একত্র করল। ভঁয়রো নদীর বাঁধ তোমাকে আমাকে বাঁধল। আমরা বন্ধু হলাম। এ-যে আমার কাছে কত বড় পাওনা তা তুমি বুঝবে না পার্বতী। একে বিদেশী, তায় আমি আফ্রিকার নিগ্রো, তোমাতে আমাতে কোন মিল নেই; আমার সঙ্গে তোমার বন্ধুত্ব নিয়ে কেউ কেউ বিদ্রূপ ও বক্রোক্তি করেছে। সেসব তুমি উপেক্ষা করেছ। আমার সঙ্গে একা ঘণ্টার পর ঘণ্টা তোমার কেটেছে, তোমার বিশ্বাস আমার মনকে সুস্থ, বলবান, স্বচ্ছ করেছে। ভারতবর্ষকে আমি অনেকের মন দিয়ে, চোখ ও বুদ্ধি দিয়ে দেখতে চেয়েছি। কিন্তু তোমার কাছে এদেশের যে পরিচয় পেয়েছি তার তুলনা নেই। তোমাকে না জানার আগে ভারতবর্ষ আমার অন্তর, আমার আত্মা স্পর্শ করে নি, শুধু আমার বুদ্ধি ও বিচারকে স্পর্শ করেছিল। তোমাকে এত কথা বলছি শুধু এজন্য যে তুমি জানবে আমার কাছে তোমার বন্ধুত্বের দাম কতখানি! কোন সাময়িক দুর্বলতায় আমি এ সম্পদ হারাতে চাই নে।

চেয়ারের ওপর মাথা রেখে চোখ বুজে পিটার কথাগুলি বলছিল। ধীরে ধীরে, ওজন করে, ব্যথায় ভিজিয়ে। শুনতে শুনতে পার্বতী উঠে দাঁড়াল। চুল খুলে পড়েছে পিঠে, সারাদিনের দৌরাত্ম্যে শিথিল। শাড়ির আঁচল টেনে কোমরে বেঁধেছে। কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম। বুকের ভেতর যে কম্পন, বাইরে তার সামান্য প্রকাশে বুক জোরে জোরে উঠছে, নামছে। টেবিলের ওপর পেল ওয়াচিরার একটা ফ্রেমে-বাঁধানো ছবি, বই-এ, কাগজে প্রায় ঢেকে গেছে। এগিয়ে এসে টেবিলের একটা অংশ সাফ করে যত্ন করে বসাল ছবিটাকে। তারপর পিটারের মাথার পাশে দাঁড়িয়ে কপালে হাত রাখল।

পিটার চোখ বুজে চুপ করে রইল।

এবার আমি যাব, পিটার।

কোথায় যাবে?

বেশি দূরে নয়। ওয়াই. ডব্লু. সি. এ.-তে আমার একটি জানা মেয়ে আছে। তার কাছে।

বলে রেখেছ?

সে জানে আমি শহরে। এখানে রাত কাটাতে হলে তার কাছেই থাকি। সে অবাক হবে না আমি হাজির হলে।

রাত অনেক হয়েছে। পিটার হাত ঘড়ি দেখল। চল তোমায় পৌঁছে দি।

না। আমি একাই যাব। তুমি আমাকে একটা ট্যাক্সিতে বসিয়ে দাও।

এত রাত্রে একা ট্যাক্সিতে যাবে?

পার্বতী একটু হাসল।

পিটার উঠল। দুজনে দাঁড়াল মুখোমুখি। পার্বতী হাত বাড়িয়ে পিটারের হাত গ্রহণ করল। বলল, আমায় ক্ষমা কর।

পিটারের মুখে ভাষা এল না।

পার্বতী বলল, কবে আসছ?

পিটার শুধু বলতে পারল: আসব।

চোদ্দ

নিদারুণ দুঃসংবাদ এল পাঁচদিন পর।

মোয়গাই-এর চিঠি এল অনেক ঘুরে দূর-প্রবাসী পুত্র পিটার কাবাকুর হাতে। চিঠি লিখেছিল মোয়গাই দু' মাস আগে। সে চিঠি লুকিয়ে পাঠান হয়েছিল নাইরবিতে একজন লোকের সঙ্গে। নাইরবি থেকে অন্য লোক তা নিয়ে গিয়েছিল মাদাগাস্কারে। সেখান থেকে ডাকযোগে এল নিউ দিল্লীতে পিটার কাবাকুর হাতে। চিঠি পড়ে পিটার জানল ওয়াচিরা নেই। আহুতি দিয়েছে সে নিজেকে কিনিয়ার মুক্তি-দাঁবানলে। শুধু ওয়াচিরা নেই তা নয়। পিটারের দুভাই নিহত হয়েছে, একভাইকে নিয়ে গেছে ধরে। মোয়গাই আহত। তার গ্রামের একখানা বাড়িও আস্ত নেই। গ্রামবাসী সব পালিয়েছে। তাদের সঙ্গে পালিয়েছে মায়তো, মোয়গাই, এন্‌গাথা, মাগেথা।

অনেকদিন থেকেই আগুন এগিয়ে আসছিল আমাদের গ্রামে, মোয়গাই লিখেছে। আমরা তো আত্মরক্ষার জন্যে তৈরি হচ্ছিলাম। এর মধ্যে একরাত্রে জেল-পলাতক চারজন গিকুয়ু গ্রামে আশ্রয়প্রার্থী হল। আশ্রয়প্রার্থীকে তো ফেরান যায় না। তাই তারা আশ্রয় পেল। দুদিন পরে শত শত সৈন্য-পুলিস গ্রামের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। প্রশ্ন করে সেই চারজন লোকের কোন সন্ধান না পেয়ে ভয়ানক রেগে গেল তারা। শুরু হল ভীষণ অত্যাচার। জোয়ান

পুরুষদের বেঁধে নিয়ে গেল, প্রহার করল বেদম, বাড়িতে উৎপাতের অন্ত রইল না।···একদিন একদল সৈন্য এসে তোমার এক ভাইকে মারধোর করল, আমাদের সবাইকে অনেক প্রশ্ন, বেশির ভাগই তোমাকে নিয়ে। তুমি ভারতবর্ষ থেকে মাউ মাউ আন্দোলন চালাচ্ছ, প্রত্যেক মাসে প্রচুর অর্থ পাঠাচ্ছ, অস্ত্র কিনে গোপনে কিনিয়ায় পৌঁছাচ্ছ—তারা বলে গেল। আবার এল দুদিন পরে। সারা বাড়ি তচনচ করে তল্লাস হল। প্রত্যেক বাড়ির জমান ফসল বাজেয়াপ্ত হল। তিন-চারদিন পরে আবার এল কয়েকটা সৈন্য—দুটো শাদা, দশটা কালো। এল বেশি রাত্রে। ওয়াচিরা ছেলেমেয়ে নিয়ে তোমার ঘরে শুয়েছিল, সে-ঘরে তাদের হামলা শুরু হল। বাড়িশুদ্ধ আমরা সবাই বেরিয়ে এলাম। কিন্তু সবাইকে লাঠির ঘায়ে, সঙ্গীনের ভয় দেখিয়ে খেদিয়ে দেওয়া হল। ওরা বলল, তোমার ঘরে তল্লাস করবে, ওয়াচিরা ছাড়া আর কেউ থাকতে পারবে না। তল্লাস চলল। আমরা সবাই নিজেদের ঘর থেকে দমবন্ধ করে দেখছি, প্রত্যেক ঘরের সামনে দুটো কালো সৈন্য অস্ত্র তুলে দাঁড়িয়ে আছে।···হঠাৎ পিস্তলের আওয়াজ ও ওয়াচিরার চিৎকার এল বাতাস বিদীর্ণ করে, আর তার সঙ্গে পুরুষের বিকট আর্তনাদ। মুহূর্তে কি হল বলতে পারব না, আমরা সবাই ছুটে বেরিয়ে এলাম, আশপাশ থেকে আরও লোক ছুটে এল। গিয়ে দেখলাম, ওয়াচিরা ও একটা শাদা সৈন্যের দেহ মাটিতে লোটাচ্ছে। ওয়াচিরা মরেছে পিস্তলের গুলীতে, আর শাদা সৈন্যটা, তুমি ওয়াচিরাকে আত্মরক্ষার জন্যে যে ছুরিটা দিয়েছিলে, তার আঘাতে। সে পিশাচ নিশ্চয় ওয়াচিরাকে আক্রমণ করেছিল, তাই ওয়াচিরা তার বুকের মাঝখান থেকে পেট পর্যন্ত দু-ফাঁক করে দিয়েছে। সাবাস মেয়ে! আমাদের সবার মুখ সে রেখেছে। মাটিতে পড়বার আগে শাদা সৈন্যটা গুলী করতে পেরেছিল, তোমার সন্তানদের বাঁচাতে গিয়ে ওয়াচিরা সে গুলী নিজের পিঠে গ্রহণ করে।···এ ঘটনার পরে সাতদিন ধরে গ্রামে আগুনের বন্যা বয়ে গেল। গ্রামে যে ক'জন জোয়ান অবশিষ্ট ছিল, তারা বাধা দিতে তৈরি হল। একদিন একটা ছোটখাট লড়াই হয়ে গেল।

সে লড়াইয়ে, পিটার জানল, গ্রামের কুড়িজনের প্রাণ গেছে, তার দুই ভাই-এরও। সারা গ্রাম ওরা দিয়েছে জ্বালিয়ে। যারা ধরা পড়ে নি তারা পালিয়েছে অন্য গ্রামে। মোয়গাই আহত দেহে অবশিষ্ট আপনজন নিয়ে দশ মাইল দূরে একটি গ্রামে আশ্রয় নিয়েছে। তার দুই ছেলে মরেছে, এক ছেলে বন্দী, তারও

মৃত্যুদণ্ড নিশ্চিত। তার ফসল গেছে, জমি গেছে। মোয়গাই লিখেছে, কি ভয়ানক অভিশাপ যে লেগেছে সারা দেশে তা আর কি বলব! তুমি দূরে ভালো আছ। আমাদের জন্যে ভেব না। ওয়াচিরার জন্য বেশি শোক করো না। স্ত্রীলোকের জন্য বেশি শোক করলে পুরুষমানুষের ইজ্জৎ থাকে না। তোমার ছেলেমেয়েকে প্রাণ দিয়ে আমরা রক্ষা করব। এখন তুমি ও তোমার ছেলেই বংশের একমাত্র ভরসা। বাকী সব তো গেল···

চিঠিটা পিটার পেল সন্ধ্যাবেলা, দিনান্তে ঘরে ফিরে। পার্বতীর সঙ্গে সাক্ষাতের পর মন হাল্কা হয়েছিল। ফিরে যাবার আয়োজন সম্পূর্ণ করছিল পিটার। যাবার আগের নানাজাতের কাজকর্মে ব্যস্ত কাটছিল দিনগুলি। আফ্রিকান ছাত্রদের যে সমিতির চার বছর সে সভাপতি থেকেছে, তার অবর্তমানে এর পরিচালনার পুরো বন্দোবস্ত করা; বহুদিনের পরিচিত বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে সাক্ষাতকার; দু'তিনটি সংবাদপত্রের সঙ্গে আফ্রিকায় ফিরে গিয়ে লেখা পাঠাবার ব্যবস্থা। এর মধ্যে পার্বতীর সঙ্গেও সে দেখা করতে পারে নি।

দিনান্তে ঘরে ফিরতে রিসেপ্‌সনিষ্ট পিটারের হাতে মোয়গাই-এর পত্রখানা দিল। চিঠিটা দেখে পিটারের আত্মা নিস্তব্ধ হয়ে গেল। হৃৎপিণ্ড গেল থেমে, রক্তচলাচল হল বন্ধ। শরীরে একবিন্দু গতি রইল না। হাতে চিঠিটা স্থির হয়ে রইল, চিঠির উপর চোখ। পা দুটো অবশ। পিটার দেখতে পেল চিঠিতে মোয়গাই-এর হাতে লেখা তার নাম, ডাকটিকেট মাদাগাস্কারের, ঠিকানা অন্য কারুর লেখা। প্রাণের মধ্যে বুঝতে পারল: দারুণ দুঃসংবাদ বহন করে এনেছে এই পত্র। ওয়াচিরা চিঠি লেখে নি! চিঠির ওপর ওয়াচিরার হাতে লেখা তার নাম নেই!

চিঠিটার ওপর নজর জমাট হয়ে রইল, খুলবার মতো শক্তি সাহস এল না। কেন এল এই ভয়ঙ্কর চিঠি? অন্ধকারে পিটারের অন্তর ঢেকে গেল, নিভে এল চোখের আলো। কেন এল, এল কেন এই পত্রযাত্রার প্রাক্কালে? কেন সে যেতে পারল না অন্ধকারের মধ্যে আশার ক্ষীণ আলোর রশ্মি নিয়ে?

বারান্দায় দাঁড়িয়ে পিটার চিঠি পড়ল। সবকিছু মাথায় ঢুকল না। শুধু জানল ওয়াচিরা নেই। ওয়াচিরা নেই।

পত্রটা পকেটে রেখে পা দুটোকে টেনে টেনে ফাটকের বাইরে এল।

সামনেই বড় নিমগাছের নিচে ট্যাক্সি ষ্ট্যাণ্ড। এগিয়ে-আসা গাড়িটার শিখ ড্রাইভারকে প্রশ্ন করল: দিল্লীর বাইরে যাবে?

কোথায়?

ভীমগড়ে। গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের ওপর।

ওয়াপিস আসবেন তো!

হ্যাঁ।

কত রাত হবে?

জানি নে।

একা যাবেন?

একা যাব, একা আসব।

ড্রাইভার একটা বড টাকার অঙ্ক হাঁকল। পিটার হিপ-পকেট থেকে মণিব্যাগ বার করে চোখ বুলাল। তারপর গাড়ির কবাট খুলে ভেতরে ঢুকল। বলল, চল।

ভীমগড গ্রামের পশ্চিম প্রান্তে পার্বতীর কুটীর। খড়ের ছাউনি, মাটির দেয়াল! ছোট্ট ঘরখানি। দেয়ালে চুণের প্রলেপ। চারদিকে কাঁটা তারের বেড়ায় জয়ন্তীর আচ্ছাদন। প্রবেশপথ কাঁচা রাস্তার ওপর, চওড়া ঢালা রাস্তা। ফাটকের ওপর বাঁশের অর্ধবৃত্তে এম্লান মালতিলতায় ফুল ফুটেছে। ঘরে লণ্ঠন জেলে পার্বতী ছুটি ফুটফুটে কিশোরী মেয়েকে পডাচ্ছিল। এরা কম্যুনিটি প্রজেক্টে নিযুক্ত দুটি ভদ্রলোকের মেয়ে, গ্রামের স্কুলে ভর্তি হয় নি, অথচ শহর অনেক দূর। তাই পার্বতী এদের পড়ানোর ভার নিয়েছে। পার্বতী ইতিহাস পড়াতে গিয়ে শিবাজীর কাহিনী বলছিল, এমন সময় ট্যাক্সি এসে গৃহদ্বারে থামল।

চকিত পার্বতী দরজা খুলে বাইরে এসে দেখতে পেল পিটার নেমেছে গাড়ি থেকে, গেটের সামনে দাঁড়িয়ে আছে চুপ করে। গাড়িটা সরে গিয়ে রাস্তার অপর প্রান্তে দাঁড়াল।

খোলা দরজায় নেমে এল পার্বতী। পিটার! অস্ফুট গলায় প্রশ্ন করল।

পিটার জবাব দিল না। শুধু তাকিয়ে রইল পার্বতীর মুখে।

মেয়ে দুটিও বেরিয়ে এসেছিল। পার্বতী বলল, রাজ, কুসুম, আজ তোমরা যাও। আমার একটু কাজ আছে। আবার কাল এস।

পিটারকে ভীমগড়ের সবাই চেনে। মেয়ে দুটি বইপত্র নিয়ে নিঃশব্দে প্রস্থান করল।

পার্বতী পিটারের সামনে এসে বলল, ঘরে এস।

নিস্তব্ধ যন্ত্রচালিত পিটার পার্বতীর ঘরে ঢুকে বেতের চেয়ারটায় বসে পড়ল। এ ঘর তার পরিচিত। অনেকবার এখানে সে পার্বতীর সঙ্গে গল্প করেছে।

পার্বতী বলল, খবর এসেছে?

পিটার ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল। বোবা, প্রাণহীন সে চোখ।

কি খবর এল?

তার নীরবতা দেখে অস্থির উত্তেজনায় পার্বতী প্রশ্ন করল: বল! কি খবর এল?

ওয়াচিরা আর নেই। সে মরে গেছে—দাঁতে দাঁত চেপে জানাল পিটার।

পিটারের অনেক কাছে এসে দাঁড়াল পার্বতী। তার দুখানা হাত চেপে ধরল পিটার। কান্নায় পড়ল ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে। পার্বতী আরও কাছে এসে তার পিঠে হাত রাখল। পিটার ভেঙে পড়ল পার্বতীর বুকে। পার্বতী মুহূর্তের জন্যে সঙ্কুচিত হল, বাধা দিল না। তার বুকের ওপর পিটারের মাথা বার বার কেঁপে উঠতে লাগল। নিঃশ্বাস চেপে রইল পার্বতী, নিঃশ্বাস নিল আস্তে, সন্তর্পণে। চোখ ভরে এল জলে। ডান হাত পিটারের পিঠে, বাঁ হাত পিটারের মাথায়। যে নারীকে সে কোনদিন দেখে নি, যার সঙ্গে যুগযুগান্তরের সমস্ত পৃথিবীর ব্যবধান, সে যেন হঠাৎ পার্বতীর চোখের সামনে এসে দাঁড়াল। তার চোখে কৃতজ্ঞ অশ্রু। পার্বতী যেন তাকে জিজ্ঞেস করল, ঠিক করেছি? সে যেন মাথা নেড়ে জানাল, ঠিকই করেছ।

এক সময় পিটার টের পেল পার্বতীর বুকে মুখ গুঁজে অনেকক্ষণ সে কাঁদছে, তার চোখের জলে পার্বতীর শাড়ি ভিজেছে, নরম বুক গরম হয়ে গেছে। টের পেল পার্বতী তাকে বাধা দেয় নি, বাঁ হাতখানি মাথার ওপর রেখে আশ্বস্ত করেছে। টের পেল পার্বতী বহুক্ষণ একবিন্দু নড়ে নি, পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে রয়েছে।

সন্তর্পণে মাথা তুলল পিটার। জামার আস্তিন দিয়ে চোখ মুছল। উঠে বারান্দায় গিয়ে বালতি থেকে জল নিয়ে মুখ ধুল। পকেট থেকে রুমাল বার

করে মুছল। ফিরে এসে সলজ্জভাবে বলল, নিজের দুঃখের তোমাকেও ভাগী করলাম, পার্বতী।

পার্বতী পিটারের কাঁধে হাত রেখে বলল, এখন একটু স্থির হয়েছ?

হ্যাঁ। হঠাৎ চিঠিটা পেয়ে কেমন যেন হয়ে গেলাম। আমি মনে মনে জানতে পেরেছিলাম ওয়াচিরা নেই। মন আমার বার বার বলছিল, পিটার, আঘাতের জন্যে প্রস্তুত হও। ওয়াচিরা নেই বুঝতে পেরেই আমি আফ্রিকায় ফিরে যাবার জন্যে এত অস্থির হয়ে উঠেছিলাম। চিঠি দেখেই বুঝেছিলাম চরম দুঃসংবাদ এসেছে। একবার পড়ে দেহমন অবশ হয়ে গেল, একবিন্দু সাহস রইল না। মনে হল, একা আমি এ ভার বইতে পারব না। হঠাৎ তোমাকে মনে পড়ল। তক্ষুনি ট্যাক্সিতে চেপে বসলাম। কোন কিছু ভেবে দেখলাম না।

ভালো করেছ। আজ আর তোমার ফিরে কাজ নেই। রাতটা এখানেই থাক।

এখানেই? তোমার কাছে?

যতক্ষণ ইচ্ছে আমার কাছে থাক। তারপর অন্য ব্যবস্থা করব। তোমার ঘরটা খালি আছে।

আমায় মাপ কর। আমার কথাবার্তার ঠিক নেই। ট্যাক্সিওয়ালা বারটা পর্যন্ত অপেক্ষা করবে। আমি চলেই যাব।

দরকার নেই। ভীমগড়ের লোক তোমায় ভালোবাসে। দিল্লীতে তুমি একা, নিঃসঙ্গ। এখানে দু'-একদিন থেকে যাও। তোমার ভালো লাগবে। গ্রামের লোক তোমার দুঃখে সমব্যথী হবে। সে সমব্যথায় কোন ফাঁকি নেই পিটার।

তা কি আমি জানি না পার্বতী?

তাহলে গাড়িটাকে বিদায় করে দাও।

কিছুক্ষণ তোমার কাছে আমায় থাকতে দেবে তো পর্বতী?

বললাম তো, যতক্ষণ ইচ্ছে থেকো।

তোমার ভয় নেই?

তোমার কাছে আমার কিসের ভয় পিটার?

অপবাদের ভয়?

তোমার জন্যে এটুকু অপবাদ আমার সইবে। যাও, ট্যাক্সিটাকে বিদায় করে দিয়ে এস।

পনের

পাঁচ বছর আগে এপ্রিলের এক দীর্ঘায়িত দিনান্তে পিটার কাবাকু নামে একটি আফ্রিকান নিগ্রো কম্পিত বুকে, কম্পিত পদে দিল্লীর রেলওয়ে স্টেশনে এসে নেমেছিল। বহু-আশার একান্ত অপরিচিত ভারতবর্ষ তার অন্তরে সেদিন ছিল বিরাট প্রশ্নের একটা ধারাল কাস্তের মতো। মদন কাপুর নামে একটি সুদর্শন ভারতীয় যুবক ও ললিতা ভাটিয়া নামে সুশ্রী একটি মেয়ে সেদিন তাকে ভারতবর্ষের হয়ে স্বাগত করতে এসেছিল। মেয়েটির অসতর্ক ঈষৎ নাসিকা-কুঞ্চন পিটার কাবাকুর আত্মবিশ্বাসকে আঘাত করেছিল। তবু সে সাহসে বুক বেঁধে দীর্ঘ পদক্ষেপে ভারতের মাটিতে ঘোষণা করেছিল নিজের আগমন।

পাঁচ বছর পরে সেই পিটার কাবাকু দিল্লী থেকে বিদায় নিচ্ছে, সমাপ্ত করছে তার ভারত-প্রবাসে। আজও এপ্রিলের দীর্ঘায়িত সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে রজনীর প্রথম প্রহর। দিল্লী স্টেশনে পিটার কাবাকুকে বিদায় দিতে আজ বহুলোক উপস্থিত। দিল্লী-প্রবাসী আফ্রিকান প্রায় সবাই এসেছে। আর এসেছে বেশ কয়েকজন ভারতীয়। তারা পিটারের বন্ধু। পাঁচ বছর ভারতবর্ষে কাটিয়ে, পিটার ভাবছে, আমি অনেক পেলাম। এরা সবাই এসেছে আমায় বিদায়-সম্ভাষণ জানাতে। এদের কারুর মুখে কোনরকমের কুঞ্চন নেই। এরা আমায় মনে রেখেছে। আমায় ভালোবেসেছে।

এসেছে বিবেক সোম সুরমাকে নিয়ে। এনেছে একগুচ্ছ রবীন্দ্রনাথের বই—ইংরেজি অনুবাদ। বিবেক-সুরমাকে দেখে পিটারের চোখ ছলছল করে উঠেছে। ছুটে এসে বিবেককে জড়িয়ে ধরেছে সে।

তুমিও এসেছ সোম? আপনিও, মিসেস সোম?

বল কি কাবাকু? আমরা আসব না? তাহলে কে আসবে শুনি?

সত্যিই তাই। তোমাকে আমি কোনদিন ভুলব না, সোম। তুমি আমায় টাগোরের বাণী শুনিয়েছ। ভারতবর্ষকে দেখবার একটা বড় দৃষ্টি তোমার কাছে আমি পেয়েছি।

আমার কাছে নয়। টাগোরের কাছে।

তোমার মাধ্যমে।

তোমার জন্যে কয়েকখানা বই এনেছি। তাঁর বই-এর ইংরেজি অনুবাদ। বেশি এখানে পাওয়া গেল না। যা পেলাম নিয়ে এলাম।

দুহাত পেতে গ্রহণ করল পিটার কাবাকু। অমূল্য উপহার দিলে তুমি আমায়। আশীর্বাদ কর, যেন আমি এ বাণী গ্রহণ করতে পারি, বুঝতে পারি।

সুরমাকে হাতজোড় করে নমস্কার জানাল পিটার কাবাকু। অনেক উপদ্রব করেছি আপনার উপর মিসেস সোম। আপনার আতিথেয়তার সুযোগ নিয়েছি অনেক। আমার সব দোষ-ত্রুটী ভুলে যাবেন দয়া করে। শুধু মনে রাখবেন পিটার কাবাকুকে—এ্যান আফ্রিকান হু লভ্‌স্ ইণ্ডিয়া।

সুরমার সরম দেখে বিবেক বলল, তুমি যে বক্তা তাতো জানা ছিল না।

বক্তা আমি নই। কিন্তু তোমাদের শাস্ত্রে তো পাথরও উপযুক্ত মুহূর্তে মুখর হয়ে ওঠে। তোমাদের দুজনকে একথাটা বলতে চাই, সোম। দিল্লী প্রবাসের একটা বিশেষ শুষ্ক সময়ে, মন আমার যখন অত্যন্ত তেতো, তোমাদের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। তোমাদের কাছে প্রথম পরিচয়ে যে সরল, সহজ বন্ধুত্বপূর্ণ ব্যবহার পেয়েছি সে যে আমার কাছে কতোখানি, আমিই জানি।

বেশ, বেশ। এবার অন্য কথা বল। যাচ্ছ কোথায়? গোল্ড কোষ্টে?

প্রথম ওখানেই। ওখান থেকে কিনিয়া।

আর কোন খবর পেয়েছ?

না। আর খবরে দরকার কি?

তোমার অনেক কাজ সামনে পড়ে আছে। অনেক বিপদ, অনেক বাধা, হয়তো আরও অনেক দুঃখ। ভগবান তোমাকে সব দুঃখ সইবার শক্তি দিন। তুমি যেন মানুষের মতো বাঁচতে পার।

পিটারের গাল বেয়ে অশ্রু নামল।—না সোম। আমি যেন মানুষের মতো মরতে পারি।

হন্তদন্ত হয়ে চতুর্দিকে সন্ধানী চোখ হানতে হানতে হাজির হল জন মিলার। পিটার কাবাকুর সঙ্গে উৎসাহে করমর্দন করে বলল, যাত্রা তোমার শুভ হোক, কাবাকু। বড় আটকে গিয়েছিলাম একটা কাজে, তাই দেরী হল।

ধন্যবাদ, ধন্যবাদ, পিটার হেসে বলল।—তুমি যে আসতে পেরেছ এই তো আমার কাছে অনেকখানি।

তোমার স্ত্রীর মৃত্যু সংবাদ সোমের কাছে শুনেছি। বড় দুঃখ পেয়েছিলাম শুনে। কয়েকবার টেলিফোন করে তোমাকে পাই নি।

আমি দিন-তিনেক ছিলাম না।

তোমাদের স্বাধীনতা-প্রচেষ্টায় আমার পূর্ণ সহানুভূতি আছে, কাবাকু। কিন্তু এই 'মাউ মাউ' পথে তোমরা সফলতা পাবে না। এ পথ বদলে অন্যপথে তোমাদের কিনিয়ার মুক্তি-আন্দোলন করতে হবে।

আমি সামান্য মানুষ। তবু, আমার বিশ্বাস এ পথের শেষ হতে দেরী নেই। এ পথ কিনিয়াকে অন্ধকারের মাঝখানে এনে পৌঁছাবে। তারপর অন্যপথে করব আমরা আলোর সন্ধান। হয়তো পাঁচ বছর পরেই শুনবে কিনিয়া অহিংস অসহযোগ শুরু করেছে। আফ্রিকার হাতে ঐ হচ্ছে দধিচির বজ্র, আফ্রিকা যেদিন ঐ অস্ত্র বিনিয়োগে পারদর্শী হবে, সেদিন কালো-মানুষের-দেহের-ঘামে-গড়া শাদা মানুষের এই প্রতিপত্তির সৌধ ধুলোয় গড়িয়ে পড়বে।

তোমাদের নতুন সংগ্রামের দিনে আশা করি আমি উপস্থিত থাকব কোন আমেরিকান কাগজের সংবাদদাতা হয়ে। এখন ক্রমেই আফ্রিকা সম্বন্ধে আমেরিকা অধিকতর মনোযোগী হয়ে উঠছে।

রাশিয়াও। বলল বিবেক সোম।

এবং সেইজন্যই আমেরিকা, যোগ করল পিটার কাবাকু।

পিটারের আফ্রিকান বন্ধুরা অনেক ফুলের মালা, ফুলের তোড়া নিয়ে এসেছিল। মালায় মালায় পিটারের বুকে রং-এর পাহাড জমে উঠল। পিটার সবাইকে গভীর আলিঙ্গন করল। সবাইকে আলাদা করে শেষ কথাটি বলল। একপাশে এসে দাঁডিয়েছিল সলোমন কুচিরো। আলিঙ্গন করতে সে কেঁদে ফেলল।

কাঁদছ কেন সলোমন? পিটার সান্ত্বনা দিল। তুমি তো আর অসুখী নও?

কিন্তু তুমি যে দারুণ অসুখী পিটার!

আমি? আমি অসুখী? কেমন হতবুদ্ধি হয়ে গেল পিটার—আমি তো সুখ চাই নে···আমাদের সুখের দিন অনেক দূরে। এখনো আরও অনেক দুঃখ আমাদের প্রত্যেকের ভাগ্যে সাজান রয়েছে।···হ্যাঁ, শোন সলোমন। দুদিন হল লণ্ডন থেকে আমি ডাক্তার হেষ্টিংস বান্দার চিঠি পেয়েছি। উনি ন্যায়াসাল্যাণ্ডে ফিরে গিয়ে স্বাধীনতা-সংগ্রামের নেতৃত্ব নেবার কথা ভাবছেন।

তোমার কথা ওঁকে লিখেছিলাম। জানিয়েছেন, এখানকার পড়াশোনা শেষ করে তুমি লণ্ডন স্কুল অব্ ইকনমিক্স্-এ ভর্তি হতে পার। সে ব্যবস্থা উনি করে দেবেন। সুতরাং তোমার আইন পরীক্ষাটা শেষ হলে লণ্ডনে যাবার উদ্যোগ কর।

আমি কি ডাঃ বান্দার সঙ্গে সরাসরি পত্রালাপ করব ?

নিশ্চয় করবে। আর একটা কথা তোমায় বলে যাই। কখনো ভুলে যেও না, আমাদের প্রত্যেকের কর্মক্ষেত্র, জীবনক্ষেত্র আফ্রিকা। পৃথিবীর অন্য কোথাও আমাদের সম্মান নেই। সম্মান হবে, যখন আফ্রিকা জাগবে, বিশ্ব-সমাজে অধিকার করবে নিজের মর্যাদা, যখন আমরা গড়তে পারব আমাদের সভ্যতা, আমাদের সম্পদ, শক্তি। আর একটা কথা মনে রাখবে। যাই কর, যেখানেই থাক, যার সঙ্গে যে সম্পর্ক তৈরি কর, কখনো ছোট হয়ো না, ছোট কাজ করো না। কেন বলছি জান ? আমরা ছোট হলে সমস্ত আফ্রিকা আরও ছোট হয়ে যাবে।

সবুজ আলো জ্বলেছে গাড়ির যাত্রাপথে। এবার সে চলবে। যাত্রীদের চাঞ্চল্য শিখরে উঠেছে। শেষ মুহূর্তের যাত্রী অস্থির ব্যাকুলতায় স্থান খুঁজছে। ফেরিওয়ালাদের গতি বেড়েছে, কণ্ঠস্বর উঠেছে শেষ পর্দায়। লাউড-স্পীকারে ঘোষিত হচ্ছে গাড়ির আসন্ন যাত্রারম্ভ। গার্ড হুইসিল বাজিয়ে সবুজ আলো দেখাচ্ছে। বিদায় দেবার জন্যে যারা এসেছে তারা গাড়ি থেকে নেমে পড়ছে। পিটার সবাইকে শেষবারের মতো সম্ভাষণ করে তৃতীয় শ্রেণীর একখানি কামরায় তার নির্দিষ্ট আসন অধিকারের জন্য তৈরি হল।

গাড়িতে উঠে একবার ডাকল বিবেক সোমকে।

সোম !

বিবেক এগিয়ে গেল। আমায় ডাকছ ?

একটা কথা আছে। শেষ কথা। সেটা তোমায় বলি।

বল।

আমি চললাম। হয়তো আর কখনো আসব না। কিন্তু আমার আত্মার এক অংশ রেখে গেলাম ভারতবর্ষে। রেখে গেলাম আমার শ্রদ্ধা, আমার প্রীতি, আমার ভালোবাসা।

ষোল

ভারতদ্বার দিয়ে প্রবেশের সময় যা পিটারের চোখে পড়ে নি, প্রস্থানের সময় তা পড়ল। দেখল ইংরেজ রাজপুরুষের প্রস্তরমূর্তির নিচে নিঃস্ব মায়ের কোলে অনাহারে মৃত শিশুর শবদেহ। পাথরে গড়া এই করুণ বেদনার সঙ্গে ভারতবর্ষে প্রথম পদসঞ্চারে বিদেশীকে পরিচয় করিয়ে দেবার বিশেষ কি তাৎপর্য, পিটার বুঝল না। শুধু মনে হল, ভারতবর্ষকে মাতৃরূপে দেখতে এদেশের লোকে অভ্যস্ত, আর মায়ের এই শোকাতুরা রূপটিই হয়তো এদের মনে সহজে দাগ কাটে। ভারতদ্বারে স্বাধীন ভারতের নেতারা নতুন কোন প্রতীক তৈরি করেন নি, গর্বিত বিদেশী শাসকের প্রস্তরমূর্তিকেই রেখে দিয়েছেন। ভারতজননীর চিরন্তন ব্যথাতুরা রূপটিরও পরিবর্তন করেন নি।

বিদায়ের বেদনাঘন মুহূর্তে মূর্তিটি পিটারের বড় ভালো লাগল। মনে হল, আমার আফ্রিকারও তো এই রূপ। সেও ব্যথাতুরা। ভারতের মতো তারও কোলে অনাহারে মৃত সন্তানের শবদেহ। বার বার পাথরের মুখখানার দিকে চেয়ে পিটারের বুকটা মোচড় দিয়ে উঠল।

পকেট থেকে বার করে পার্বতীর চিঠিখানা আর একবার সে পড়ল। বোম্বে এসে পেয়েছে সে চিঠি, পড়েছে কয়েকবার। আবার পড়ল।

বন্ধু পিটার,

তুমি যাচ্ছ। তোমার যাত্রা জয়যুক্ত হোক? যে-কোন কঠিন পরীক্ষার সামনে তুমি পড় না কেন, ভগবান তোমাকে উত্তীর্ণ হবার শক্তি দিন। জীবনে তুমি স্নাতকোত্তর হও।

একটা কথা তোমাকে বলার আছে। হয়তো আগেও বলেছি, আবার বলি। আমার কাছে তোমার দাম তোমার আদর্শের জন্যে। মানুষের মধ্যে দেবতার ছটা আসে আদর্শ থেকে। বড়-র, মহানের স্পর্শ লেগে ছোট মানুষও বড় হয়ে যায়। তুমি এখন তাই।

একদিন তোমার মতো আমরা অনেকে ছিলাম। মহান আদর্শের আগুন ক্ষুদ্রত্বকে ভস্ম করে যেটুকু সোনা আছে আমাদের মধ্যে, তাকে জ্বালিয়ে উজ্জ্বল করেছিল। আমরা ত্যাগে, দুঃখে, নির্যাতনে বড় হয়েছিলাম। ভয় আমাদের ছিল না। ক্ষুদ্র স্বার্থ আমরা ভুলেছিলাম। বিস্মৃত হয়েছিলাম আমাদের সহস্র দুর্বলতা।

সে আমরা আর নেই। যে মহান ভাবপ্লাবন আমাদের মহৎ করেছিল তা ফুরিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে আমরা আবার ক্ষুদ্র হয়ে গেছি। আমাদের আদর্শ যেতে বসেছে, লোভ ও ভোগবাসনা, স্বার্থ ও ক্ষমতাপ্রিয়তা আমাদের পুনরাধিকার করেছে। এমিল জোলার 'নানা' বই-এর শেষভাগের একটা কথা আমার প্রায়ই মনে হয়: Venus is decomposing—ভিনাস পচছে। পিটার, আমরাও ভিনাস ছিলাম। আমরা পচছি।

তুমি জিজ্ঞেস করেছিলে নতুন পিটার কাবাকুকে আমি স্বীকার করি কি না। সেদিন জবাব দিই নি। আজ দিচ্ছি। তোমার মধ্যে যে সংগ্রামের আলো জ্বলছে, তাকে আমি স্বীকার করি। স্বীকার করি তোমার মধ্যেকার আগুন—যে আগুন অহরহ তোমার অন্তরের সোনাকে পুড়ে উজ্জ্বল করছে। এ আগুন থেকে পেয়েছ তুমি, পাবে তুমি, পথ ও পাথেয়। এ আগুন তোমাকে টেনে এনেছে গভীর বিপদের পথে, যে-পথে তুমি তোমার স্ত্রীকে হারিয়েছ, হয়তো আরও অনেক কিছু হারাবে। আমি স্বীকার করি তোমার নির্ভীক আত্মবিশ্বাস, যার জোরে তুমি নিজেকে ছোট কর নি; সব লাঞ্ছনা, অপমান নীরবে সহেছ; দিতে চেয়েও দাও নি, পাবার সুযোগ পেয়েও নাও নি। যে লৌহশলাকা তোমার আত্মাকে বিদ্ধ করে আছে, তাকে আমি গ্রহণ করি।

ভারতবর্ষের মুক্তি-সংগ্রাম আমার মনকে এখনো আচ্ছন্ন করে রেখেছে। আমরা মাতৃভূমিকে একদিন বড় মহানরূপে দেখেছিলাম। ভারতবর্ষের দুঃখ আমাদের চোখে জল আনত। আজ তোমরা আফ্রিকাকে তেমনি মহানরূপে দেখেছ। আফ্রিকার আহ্বান তোমার কাছে অনন্তের অমোঘ আহ্বান। তোমার মধ্যে পেয়েছিলাম আমার অতীতের ছবি, আমার ও আমাদের। তাই তুমি আমার প্রিয়বন্ধু।

একদিন আফ্রিকা স্বাধীন হবে। হয়তো সেদিনের দেরী নেই। হয়তো তোমাদের স্বাধীনতা আসবে বন্যার মতো। অপ্রস্তুত তোমাদের ভাসিয়ে নিয়ে যাবে। মুক্তি পাবার জন্যে যে ত্যাগ, দুঃখ, শ্রম দরকার, যে দাম দিয়ে

মুক্তি কিনতে হয়, তা না দিয়েই হয়তো আফ্রিকার অনেক দেশ স্বাধীনতা পাবে।

পিটার, তোমার দেশ স্বাধীন হবার পরে তুমি কেমন হবে, কী হবে তোমার পরিণতি? তুমি কি নেতা হয়ে শাসন করবে, না তুমি কিনিয়ার সেবক থাকবে? তোমার মন কি তখনো কিনিয়ার জন্যে কাঁদবে? অত্যাচার দেখে তুমি অস্থির হবে, অনাহার দেখে ব্যথাতুর হবে তোমার মন? উলঙ্গ শিশুকে রাস্তায় দেখলে কোলে তুলে নেবে? একটি ক্ষুধার্ত পরিবারকে অভুক্ত রেখে নিজে আহার করবে না? অন্যায় করবে না, অন্যায় সইবে না? কোন সঙ্ঘ-বদ্ধ স্বার্থের প্রভাব পড়বে না তোমার মনে, তোমার মননে? প্রতিবেশীর সন্তান বেকার থাকতে নিজের সন্তানকে চাকরি দেবে না?

নাকি তুমি বদলে যাবে? তুমি আত্মতুষ্ট হবে, আত্মতুষ্টি করবে। তোমার পুলিস গুলী চালাবে তোমার দেশবাসীদের লক্ষ্য করে—তুমি তার সাফাই গাইবে? অসন্তুষ্ট জনতার সামনে গিয়ে দাঁড়াবার সাহস তোমার আর থাকবে না? তুমি নতুন কিনিয়া নির্মাণে এতই মগ্ন থাকবে যে পুরাতন কিনিয়ায় খাদ্যাভাবে মৃত্যু তোমার চোখে পড়বে না? প্রাসাদে বাস করবে, বিদেশী গাড়ি চড়বে, স্তাবকরা সর্বদা তোমায় থাকবে ঘিরে—দেশটাকে দেখবে তোমার সরকারি কর্মচারীদের ফাইলের মধ্যে, আর ইচ্ছা-নির্মিত কাচের মাধ্যমে?

তোমার আগুন নিভে যাবে? কোন লৌহশলাকা তোমার আত্মাকে বিদ্ধ করবে না? রাজপথে চলতে গিয়ে জনপথ থেকে কি তুমি বিচ্ছিন্ন হবে?

পিটার, যেদিন তোমার জীবনে পথ-নির্বাচনের এ সন্ধিক্ষণ আসবে, সেদিন একবার আমার কথা ভেব। যদি সেদিন আমাকে তোমার মনে থাকে।

তোমার অজানা চলার-পথ আমার দৃষ্টিকে টানবে। মন চাইবে তোমার খবর, তোমার জয়-পরাজয়ের বার্তা। যদি আবার কোনদিন কোন দুঃখকে একা বইবার সাহস না পাও, মনে করো পার্বতীকে। প্রার্থনা করি, তার প্রয়োজন যেন না হয়। ইতি—

পার্বতী

অনেকদিন পর পার্বতী পেল পিটারের পত্র। পড়ল লণ্ঠনের ম্লান আলোয় কুটীরের দাওয়ায় বসে। পড়বার সঙ্গে সঙ্গে আফ্রিকা নামক অজানা

অচেনা রহস্যের মধ্যে মন তার ডুবে গেল। ঘোর অন্ধকার সে রহস্য; পার্বতী ঘুরে বেড়াল আফ্রিকার অন্ধকারে। মনে হল, তার বহু আগে চলছে অনেক মানুষের মিছিল, অন্ধকারের মতোই থমথমে কালো, চলছে আলোর সন্ধানে। সে মিছিলের মধ্যে খুঁজল পার্বতী একদা-নিকট এক বন্ধুকে। বার বার দৃষ্টিপথে চকিত দেখা দিয়ে সে মিলিয়ে গেল জমাট মানুষের অন্ধকারে। ইতিহাসের এক বিচিত্র যাত্রাপথ ভেসে উঠল পার্বতীর চোখে। এ পথের শুরু কোথায় সে জানে না, শেষও তার অচেনা। পার্বতী দেখল এ পথের দুধারে বহু পুরাতন সভ্যতার অস্থি-কংকাল, অনেক সাম্রাজ্যের ধ্বংসাবশেষ। অগণিত মানুষের পদচিহ্ন। পার্বতী দেখল, ভবিষ্যত বর্তমানের রাস্তা ধরে এ পথে চিরদিন অতীত হয়েছে, অতীত হয়েছে মানুষের গর্ব, দর্প, বিজয়; অতীত তার কীর্তি, সৃষ্টি। তবু মানুষ চলছে। অন্ধকার হতে আলোয়, অজ্ঞান হতে জ্ঞানে, বন্ধন হতে মুক্তিতে। সে পথের পথিক ছিল পার্বতী একদিন নিজে, পথিক ছিল তারই মতো ভারতের লক্ষ লক্ষ লোক, হয়তো পথিক তারা আজও। সে পথের পথিক কিনিয়ার পিটার কাবাকু, আফ্রিকার সংখ্যাহীন কালো, কুরূপ মানুষ। অতীত চুপি চুপি পার্বতীর কানে বলে গেল, ইতিহাসের পথ অন্তহীন, এ পথ মানুষকে করেছে মহান, তার সৃজনী আকাঙ্ক্ষাকে নিয়ে গেছে দেবতার স্বর্গে। যে চলছে, সেই জীয়ন্ত। যে অচল, সে মৃত।

সাগর পাড়ি দিয়ে পিটার কাবাকু একদিন আফ্রিকার পশ্চিম উপকূলে গোল্ড কোষ্টে নামল। "সমুদ্র থেকে ভারতবর্ষের দিকে তাকিয়ে মন ভরে গেল, পার্বতী; মনে হল, ভারতবর্ষ আমায় বিদায়ের হাতছানি দিচ্ছে। ভারতকে আমি কতটুকু চিনেছি জানি না, শুধু এটুকু জানি ইতিহাসের যাত্রা-পথে আফ্রিকাকে বার বার ভারতের কাছে আসতে হবে। ভারতবর্ষ আমার সঙ্গে আগাগোড়া ভালো ব্যবহার করে নি, অনেক সময় অন্তর আমার তিক্ত, বিস্বাদ হয়ে গেছে; কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে সব পুষিয়ে দিয়েছে, আজ আর আমার কোন নালিশ নেই, পরিপূর্ণ অন্তরে ভারতের কাছে আমি বিদায় নিয়েছি।"

গোল্ড কোষ্ট আফ্রিকার পশ্চিম উপকূলে, কিনিয়া পূবে; পথ আফ্রিকা অতিক্রম করে, দুর্গম, দীর্ঘ, অনিশ্চিত পথ। এ পথে পিটার চলেছে।

"বিচিত্র মহাদেশ আফ্রিকা। গোল্ড কোষ্ট থেকে আমি যাব কিনিয়ায়,

যাব আফ্রিকার এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে, যাব য়ুরোপের তিন-চারটি দেশ পেরিয়ে। কেন জান? গোল্ড কোষ্ট ইংরেজের, এর চেহারা আলাদা, এখানে শাদা-কালো সমস্যা নেই, ইংরেজ এদেশে বসতি করে নি, শুধু সাম্রাজ্য করেছে। একদিন, হয়তো সেদিনের বেশি দেরী নেই, সে বিদায় নেবে। কিনিয়াও ইংরেজের, কিন্তু যেখানে শাদা-কালো সমস্যা ভীষণ জটিল, ইংরেজ সেখানে বসতি করেছে, বিদায় নেবার কথা ভাবতে নারাজ। এক ইংরেজ কলোনী থেকে অন্য ইংরেজ কলোনীতে যেতে আমাকে পার হতে হবে ফরাসী আফ্রিকা, বেলজিয়ান আফ্রিকা, পর্তুগীজ আফ্রিকা। শুধু ইংরেজের চোখে ধুলো দিতে পারলেই আমি নিরাপদ নই, আমাকে এড়াতে হবে ফরাসী, বেলজিয়ান, পর্তুগীজ শাসকদের শ্যেনদৃষ্টি। যেখানে ধরা পড়ব, সেখানেই আমার পথের শেষ।"

পিটার কাবাকুর সুদীর্ঘ বন্ধুর যাত্রাপথ পার্বতীর কাছে রসস্তময় মনে হল। অজ্ঞাত আফ্রিকার কিছুই তার জানা নেই। সে শুধু দেখল, পিটারের পথ ইতিহাসের পথ। দেশের পর দেশ, অরণ্যের পর অরণ্য, মরুভূমির পর মরুভূমি, দুর্দম প্রকৃতি ও নিষ্ঠুর মানুষের অজস্র বাধা অতিক্রম করে বন্ধু পিটার কাবাকু চলেছে ইতিহাসের পথে। "গোল্ড কোষ্ট থেকে আমি এসেছি নাইজিরিয়ায়। কেমন করে এলাম তার কাহিনী বর্ণনা করলে একখানা কিতাব হবে। কেমন করে জানি না, এখান থেকে যাব ক্যামেরুনস, তারপর ফরাসী আফ্রিকার মরু পেরিয়ে, কঙ্গো। সেখান থেকে ট্যাঙ্গানাইকা, বড সুন্দর দেশ, মরুর পরে মরূদ্যান। তার পাশেই আমার কিনিয়া? আমার কিনিয়া? আমার স্বদেশ, আমার জন্মভূমি। তার উদ্দেশে আমি চলেছি, হাজার হাজার মাইল অতিক্রমের অভিযানে।"

কোনদিন কি পিটার কাবাকু পৌঁছবে জন্মভূমির পবিত্র মাটিতে? পার্বতী জানে না, জানবার প্রয়োজনও নেই। জানে না পথিক পিটার কাবাকু। "যদি কোনদিন কিনিয়ায় পৌঁছি, তবু তো বিশ্রাম নেই। কিনিয়ায় এখন দাবানল, ওখানে প্রবেশ মানে অগ্নি-আলিঙ্গন। অন্তরে আমার এত জ্বালা, পার্বতী, সে দাবানলের স্পর্শ না পেলে তার নির্বাণ নেই। কিনিয়া রিক্তবক্ষে আমায় কি কোনদিন গ্রহণ করবে? সে তো আমায় আজ কিছুই দেবে না, দাহন ছাড়া! ওয়াচিরা নেই, নেই আমার শান্তির নীড়, শান্ত কুটীর। কিন্তু কোথাও, কোন এককোণে, আমার ছেলেমেয়ে বোধকরি

এখনো বেঁচে আছে। যে অসম্মান, গ্লানি ও অন্তর্দাহ আমার পাথেয় হল, ওদের যেন তা না হয়। ওরা যেন স্বাধীন দেশের মানুষ বলে গর্বিত বোধ করতে পারে। আফ্রিকার নিগ্রো বলে ওদের যেন পৃথিবীর কোথাও মাথা হেঁট করতে না হয়। মানুষের পূর্ণ মর্যাদা যেন ওরা পায়। এ আশায় আমি আগুনে ঝাঁপ দেব, পার্বতী। পুড়ে মরতে আমার কোন কষ্ট হবে না।"

পার্বতী শুধু জানে পিটার চলেছে। চলতে চলতে যদি সে মুখ থুবড়ে পড়ে যায়, পার্বতীর চোখ ভিজবে, মন কাঁদবে, তবু পিটারের কথা ভেবে গর্ব হবে মনে। পিটার লিখেছে, "যদি কিনিয়া পৌঁছবার আগেই আমি নিঃশেষ হয়ে যাই, তবু খেদ থাকবে না। জানব, চলতে চলতে অচল হয়েছি. এগিয়ে গিয়ে গেছি ফুরিয়ে। তুমি হয়তো খবরটা পর্যন্ত পাবে না। তাতেও কোন ক্ষতি নেই পার্বতী। তোমার আমার বন্ধুত্বের খাতায় খরচের হিসেব নেই। ওটা পুরোপুরি লাভ। এগিয়ে-যাওয়া ভারতের সঙ্গে এগিয়ে-আসা আফ্রিকার বন্ধুত্ব। এই বিরাট মহামানবের মিছিলে পিটার কাবাকু বা পার্বতী দত্ত বলে দুটি আলাদা নরনারীর পরিচয় নেই। আমরা বহুর মধ্যে নিজেকে হারিয়ে সার্থক, ধন্য। ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্যে প্রতিষ্ঠিত হবার সুযোগ নাই-বা পেলাম। সে সুযোগ পাবে ভবিষ্যতের মানুষ। পাক আমার ছেলেমেয়ে। আমাদের সবাকার ছেলেমেয়ে।"

পার্বতী জানে পিটার আর আসবে না। জানে পিটারও। "তোমার সঙ্গে হয়তো আমার আর দেখা হবে না, পার্বতী। যদি কোন গভীর দুঃখ একা বইতে না পারি, তোমায় নিশ্চয় স্মরণ করব, কিন্তু তোমার দ্বারপ্রান্তে আর গিয়ে দাঁড়াবার অবকাশ হবে না। তাতেও দুঃখ নেই। আমরা পথ তৈরি করে যাব, সে পথে চলবে অনাগত দিনের মানুষ। হয়তো কোনদিন এনগাথা, আমার ছেলে, যাবে ভারতবর্ষে, নতুন পরিবেশে, নতুন আত্মবিশ্বাস নিয়ে। তুমি যদি কোনদিন মা হও, পার্বতী, আর তোমার সন্তান যদি কন্যা হয়, তাহলে তার সঙ্গে এনগাথা কাবাকুর একদিন হয়তো নতুন বন্ধন হবে।"

পিটার পার্বতীকে অনুরোধ করেছে সে যেন পূর্ণ করে বাঁচে। "তোমার মধ্যে যে আশ্চর্য জীবনশক্তি আছে তা ব্যর্থ হতে দিয়ো না। পূর্ণ করে বাঁচ, পার্বতী, অপরাধীর মতো জীবন থেকে পালিয়ো না। একদিন তুমি অসামান্য বীরত্ব ও সাহস, আদর্শ ও কর্তব্যনিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছিলে। তোমার মন ঝরণার জলের মতো স্বচ্ছ। তুমি ধীর, শান্ত, বেদনার ব্যঞ্জনায় তোমার ব্যক্তিত্ব

গম্ভীর হয়েও কোমল। তোমার আত্মজিজ্ঞাসা আছে, আত্মসমীক্ষা আছে। পথপ্রান্তে তুমি হিসেব মেলাতে শুরু কর নি। জীবনের কাছ থেকে তোমার অনেক পাবার আছে, মানুষকে তোমার অনেক দেবার আছে। বহুদূর অচেনা বিদেশ থেকে আগত একটি আফ্রিকান নিগ্রোকে তুমি যদি অনেকখানি পূর্ণতা দিয়ে থাকতে পার, তোমার নিজের দেশের কোন ভাগ্যবান পুরুষকে তুমি পরিপূর্ণ করতে পারবে। তোমার সন্তান যদি মায়ের মতো হয়, ভারতবর্ষের ভবিষ্যতে তারা কাজে লাগবে। আমার এ কল্পনা-বিলাস ভালো লাগছে, পার্বতী, যে একদিন তোমার ও আমার ছেলেমেয়েরা একত্র হবে, আর তখন আজকে আমাদের মধ্যে যে দুস্তর ব্যবধান, ভূগোলের, কৃষ্টির, ভাবনা ও মননের, অতীত ও বর্তমানের, তাদের মধ্যে সে ব্যবধান থাকবে না।"

শেষ করার আগে পিটার লিখেছে, "তুমি রাজপথ জনপথের যে প্রশ্ন তুলেছ তার জবাব আজ দেব না। আমি জনপথের পথিক। আমার পথ রাজপথে শেষ হবে, বিশ্বাস নেই। যদি হয়, তখন তোমার প্রশ্ন মনে করব। আমি যদি রাজপথে পৌঁছে জনপথ বিস্মৃত হই, আমিই ফুরিয়ে যাব, জনপথ ফুরবে না। হ্যাঁ, সঙ্ঘর্ষ হবে, সঙ্ঘাত। আমি হারবো, জনপথ জিতবে। ইতিহাসে চিরদিন তাই হয়ে এসেছে, চিরদিন তাই হবে। আজ আমার পথ চলাতেই তৃপ্তি, আনন্দ। আমি চলছি, যেন চিরদিন চলতে পারি। পৃথিবীর বহু মানুষের সঙ্গে পা ফেলে। দেবতার কাছে আমার জন্যে এটুকু প্রার্থনা করো, পার্বতী।"

শেষ হলে চোখ বুজে এল পার্বতীর, অন্ধকারে নয়, দিগন্ত-পরিব্যাপ্ত আলোর প্রবাহে। চোখ বুজে সে আলো নিঃশ্বাসে পার্বতী গ্রহণ করল বুকে, অন্তরে, প্রাণে।

চোখ খুলে দেখল, রাজ ও কুসুম। ফুটফুটে হাসি তাদের মুখে। হাতে বই। দু'টুকরো জীবন্ত আশা।

পার্বতী দুহাত বাড়িয়ে তাদের বুকে টেনে নিল।
